ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

উমাইর লুৎফর রহমান
অনূদিত

অনুবাদক পরিচিতি

উমাইর লুৎফর রহমান

মেধাবী, কর্মতৎপর ও চিন্তাশীল এক যুবক। মাত্র ১০ বছর বয়সেই কুরআনুল কারিম হিফয শেষ করে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মেধাতালিকায় জায়গা করে নেন। এরপর উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা আতহার আলী রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিশোরগঞ্জস্থ জামিয়া ইমদাদিয়ায় দ্বীনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সর্বোন্নত ফলাফলের অধিকারী হয়ে ইলমি মহলে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এরপর ইসলামি দাওয়াহ ও আরবি ভাষা সাহিত্যের যোগ্যতা অর্জন করেন। লেখালেখির অভ্যাস তার ছাত্রজীবন থেকেই। অনুবাদ ও সম্পাদনা মিলিয়ে একাধিক বই তার সমাদৃত হয়েছে। সরল ও সাবলীল অনুবাদে পাঠকমহলে ইতিমধ্যেই তিনি সুপরিচিতি লাভ করেছেন। মহান আল্লাহ তার মেহনতকে কবুল করুন এবং তার প্রয়াসসমূহকে পরকালে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

তৃতীয় খণ্ড

উমাইর লুৎফর রহমান
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (৩য় খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২/ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-64-2
Web : maktabatulhasan.com
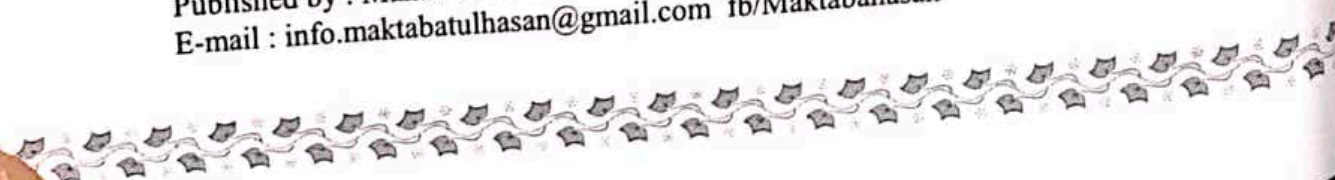
মূল্য : ২৯০০/- টাকা মাত্র [চার খণ্ড একত্রে]

MuslimJati Bisshoke ki Diyece(3rd Part)
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

* * *

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। তাদের অন্তরে যা ছিল আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।[১]

* * *

---

১. সুরা ফাতহ : ১৮।

সূচিপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতায় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান

প্রথম পরিচ্ছেদ

খিলাফত ও নেতৃত্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণালয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভাগ ও কার্যালয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বিচারবিভাগ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা বিভাগ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চিত্র সূচি

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতায় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান

কোনো জাতির উন্নতি ও সংস্কৃতিমান হওয়ার ধারণা পাওয়া যায় সে জাতির সংগঠন ও সংস্থার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। এসব সংগঠনই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের জীবনাচার ও কার্যাবলিতে বিন্যাস ঘটায়। মর্যাদাশীল মানবজীবন প্রদানের লক্ষ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল ও সহযোগী জাতির জীবনচরিত সংরক্ষণ করে। আর এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যত বেশি সামাজিক জীব মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়, তত বেশি তাদের কল্যাণে নিবেদিত হয়, অকল্যাণ থেকে তাদের রক্ষা করে। জীবনযাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনে যত বেশি উন্নয়ন ঘটায়, তত বেশি তারা মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে, তাদের কর্মতৎপরতার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং অন্য সব জাতি ও সভ্যতাকে ছাপিয়ে নিজেদের তারা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

আর এ অধ্যায়ে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে মানবিকতাপূর্ণ সভ্যতায় মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় দিক উপস্থাপন করব। নিচের পরিচ্ছেদগুলোতে তার সংক্ষিপ্তরূপ :

প্রথম পরিচ্ছেদ

খিলাফত ও নেতৃত্ব

এ ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। মানব সভ্যতার উন্নয়নে যার অসামান্য অবদান রয়েছে। আমাদের শাশ্বত ইসলামি সংস্কৃতি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, তা হলো সাংগঠনিক ব্যবস্থা, যা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ স্বার্থের কোনো ব্যক্তি বা দলের সাথে শর্তযুক্ত নয়। কারণ এসব সংগঠন কিতাবুল্লাহ আর সুন্নাতে রাসুলের আলোকে গঠিত ইসলামি বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। যা সমাজের প্রতিটি মানুষকে তাদের সক্ষমতা ও প্রতিভা প্রদর্শন করার সুযোগ দেয়। ফলে তা যুগ-পরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠানে নতুনত্ব আনতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রতিটি স্থান-কালের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। বৈশ্বিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ভান্ডার ও নানা দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করা এবং সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে-সকল নিয়মনীতি প্রয়োগ হয়ে আসছে সেসবে অবদান রাখা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোর মধ্য থেকে ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠন হলো অন্যতম। এই শ্রেষ্ঠ সংগঠনটি তার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের ধারাবাহিকতায় প্রতিটি স্তরে উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে মানবজাতির জন্য অনুসৃত আদর্শ হিসেবে গণ্য।

ইসলাম এবং তার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণাকারী মাত্রই এই মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ করে থাকবেন, যা একমাত্র এই আসমানি ধর্মই প্রবর্তন করতে পেরেছে। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট। কারণ ইসলাম সবার আগে মানুষের নিজ সত্তাকে পরিবর্তন করতে পেরেছে। যুগ যুগ ধরে বংশীয় ও পৈত্রিক সূত্রে চলে আসা চারিত্রিক, নৈতিক, বিশ্বাসগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পালটে দিতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম বরং হাজার বছর ধরে মানুষের মনে গেঁথে থাকা রোমান ও পারসিক রাজনীতি ও বিশ্বাসকে নির্মূল করেছে। কারণ মানুষের মাঝে শাসননীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ইসলামি বিধানাবলির সাথে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যার মাধ্যমে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা, জনগণের কল্যাণ বিধান

করা, তাদের ধর্ম ও কর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জাতি হিসেবে তাদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা, অন্যসব জনগোষ্ঠীর সামনে তাদের লাঞ্ছিত না করা ইত্যাদি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে অন্যসব ধর্ম ও জীবনবিধান ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

খিলাফত ও আধুনিক প্রত্যাশিত নেতৃত্ব বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামি অভিধানবেত্তা, দার্শনিক, চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে 'খিলাফত' শব্দের পরিচয় জেনে নেব। কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে 'খিলাফত' শব্দের সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শাসনতান্ত্রিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন।

ইবনে মনজুর মিসরির মতে খিলাফত শব্দের আভিধানিক পরিচয় হলো,

خَلَفَهُ يَخْلُفُهُ صَارَ خَلْفَهُ، وَالْخَلِيْفَةُ الَّذِيْ يُسْتَخْلَفُ مِمَّنْ قَبْلَهُ، وَالْخِلَافَةُ الْإِمَارَةُ

> অর্থাৎ খালাফা শব্দের অর্থ একজন আরেকজনের পেছনে হওয়া। খলিফা হলো যে ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হয়। আর খিলাফত অর্থ হলো নেতৃত্ব বা শাসন।[২]

অপরদিকে ইবনুল আসির থেকে যুবাইদি বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'খালাফ' (خلف) শব্দের লামের ওপর যবর বা সাকিন দিয়ে পড়লে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে যে একজন চলে যাওয়ার পরে তার স্থানে আসে। তবে পার্থক্য এতটুকুই, যবর দিয়ে পড়লে ভালো প্রতিনিধি বোঝায় আর সাকিন দিয়ে পড়লে মন্দ।[৩]

কুরআনুল কারিমে অধিকাংশ স্থানে الخليفة। শব্দটির 'বহুবচন' ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন দল বা জনগোষ্ঠী বোঝানোর জন্য, এর দ্বারা কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বোঝানো হয়নি। আর দুটি স্থানে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এক স্থানে তা দিয়ে আমাদের আদি পিতা আদম আ.-কে বোঝানো হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

---

২. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, خلف মূলধাতু, খ. ৯, পৃ. ৮২।

৩. যুবাইদি, *তাজুল আরুস*, অধ্যায় : فاء, পরিচ্ছেদ : الخاء مع اللام, খ. ২৩, পৃ. ২৪৭।

আর স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি...।[৪]

অপর স্থানে নবী দাউদ আ.-কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾

হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি...।[৫]

আয়াতদুটিতে 'খলিফা' শব্দের আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসিরগ্রন্থ একমত।[৬] আর আবু বকর সিদ্দিক রা. প্রথম ব্যক্তি যাকে খলিফা উপাধি দেওয়া হয়। কারণ উম্মতের নেতৃত্বে তিনিই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হয়েছিলেন।[৭]

অপরদিকে পৃথিবীজুড়ে ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তৃত ও প্রদেশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পর ইমারাত হয়ে ওঠে একটি সম্ভ্রান্ত পদ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। অধিকৃত কোনো দেশ বা প্রদেশের গভর্নর মনোনয়ন ও নিয়োগের একমাত্র ক্ষমতা ছিল খলিফার। খলিফার ইচ্ছাতেই গভর্নর নিয়োগ হতো। নির্দিষ্ট দেশের বা রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় খলিফার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে বলা হতো আমির বা ওয়ালি।[৮]

'ইমারাত'-কে ফুকাহায়ে কেরাম দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. সাধারণ ইমারাত (إمارة عامة)। দুই. বিশেষ ইমারাত (إمارة خاصة)।

অনুরূপভাবে সাধারণ ইমারাতের আবার দুটি শাখা। এক. ইমারাতুল ইস্তিকফা (إمارة الاستكفاء)। অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের স্বতঃস্ফূর্ত মনোনয়নে একজনকে নির্দিষ্ট রাজ্যের গভর্নর নিয়োগ করে তাকে রাজ্যবাসীর শাসনকার্য পরিচালনার এবং তাদের উন্নয়নে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া। দুই. ইমারাতুল ইস্তিলা (إمارة الاستيلاء) । অর্থাৎ কোনো একজন লোক বা নির্দিষ্ট দল কর্তৃক জোর করে ক্ষমতা দখল করে নেওয়া। তাকে বা সেই

---

৪. সুরা বাকারা : ৩০।

৫. সুরা সদ : ২৬।

৬. তাবারি, *জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ৪৪৯।

৭. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৬, পৃ. ৩৩৩।

৮. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৩।

দলকে ক্ষমতা প্রদান না করার কারণে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য বা গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করলে রাষ্ট্রপ্রধান তার বা সেই দলের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেন। এ ধরনের ঘটনা শুধু রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে।

গভর্নরের জন্য বিশেষ বিশেষ যেসব সেক্টরে ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ থাকে, তাকে বলা হয় ইমারাতুল খাসসা। যেমন সেনাবাহিনী পরিচালনা ও পুনর্গঠন, রাজনীতির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে মানুষকে বারণ... ইত্যাদি। তবে ইমারাতুল খাসসার অধিকারী গভর্নর বিচারব্যবস্থা এবং ট্যাক্স-সদকা উত্তোলনে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, ইসলামের সূচনালগ্নে সাধারণত 'ইমামত' বা সাধারণ নেতৃত্বের প্রচলন ছিল। এরপর রাষ্ট্রের পরিধি বাড়ার সঙ্গে তা ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ পৃথকীকরণ হয়। শেষ পর্যন্ত আমিরের ক্ষমতা কেবল সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং নামাযের ইমামতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।[১]

যাইহোক, খিলাফত ও নেতৃত্বের বিষয়ে মুসলিমদের অবদানগুলো আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করছি :

প্রথম অনুচ্ছেদ : খিলাফতের শর্তসমূহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : খলিফা বা আমির নির্বাচন পদ্ধতি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাইআত (তথা খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার)

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : পরবর্তী খলিফা নির্বাচন

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

সপ্তম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক

অষ্টম অনুচ্ছেদ : সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক যত গোলযোগ

নবম অনুচ্ছেদ : শুরা (পরামর্শসভা)

---

১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৩০; ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৮-৭১।

প্রথম অনুচ্ছেদ

খিলাফতের শর্তসমূহ

খিলাফতের শর্ত বলতে, শরিয়ত এ বিষয়ে যেসব শর্ত আরোপ করেছে এবং প্রশাসনে বা খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে শাসকের মধ্যে যেসব শর্তের উপস্থিতিকে আবশ্যক বলে সকল শরিয়তজ্ঞ এবং জনসাধারণ একমত হয়েছেন, তা উদ্দেশ্য।

আর আপনি যদি শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এসব শর্ত ও মানদণ্ডকে তৎকালীন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত আইনকানুনের সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে রাজনৈতিক ইতিহাসে ইসলামি সভ্যতা কত উন্নত ও উচ্চ আসন গ্রহণ করেছিল, তা খুব সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

ইসলামের আগমনই ঘটেছিল কেবল মানুষের অধিকার রক্ষা এবং তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও সমুন্নত রাখার জন্য, প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর জমিনে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তা ছাড়াও শরিয়ত নানা অবকাঠামো এবং উদার নিয়মের প্রচলন ঘটিয়ে ইসলামের একতা সুরক্ষায় জোর তাগিদ দিয়েছে। ফলে ইসলামি বিচারব্যবস্থা অন্যান্য সকল ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে অনন্য ও সুউচ্চ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের সকল প্রশাসনিক অবকাঠামোতে হারিয়ে যাওয়া ন্যায়, সুবিচার ও সাম্যের মতো সামাজিক বিষয়গুলো পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করতে শতভাগ সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই সাম্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রণীত বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সকল অধিকার সুরক্ষা করা। মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য শরিয়ত অনুমোদিত সকল বৈধ উপাদান সরবরাহ ও সহজলভ্য করা। আর এই ন্যায়, ইনসাফ ও সমতা বিধানের নজির আমরা কেবল ইসলামি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমুজ্জ্বলরূপে দেখতে পাই।

যেহেতু খলিফা, আমিরুল মুমিনিন বা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি মানুষের দ্বীন-ধর্ম সুরক্ষা ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, তাই ইসলামি স্কলার ও শরিয়তব্যবস্থায় বিজ্ঞ আলেমগণ এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। ইমাম মাওয়ারদি রহ.-এর মনোনীত সাতটি শর্ত আমরা এখানে উল্লেখ করছি। সেগুলো হলো :

১। ন্যায়পরায়ণ হওয়া। প্রয়োজনীয় সকল শর্তসহ।

২। কুরআন-হাদিসের আলোকে ইজতেহাদের যোগ্যতা পর্যন্ত পৌঁছায় এমন ইলমের ধারকবাহক হওয়া।

৩। দৈহিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া। তথা দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাক্শক্তি পুরোমাত্রায় সুস্থ ও ত্রুটিমুক্ত হওয়া।

৪। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াতে প্রতিবন্ধক হয় এমন সব রোগ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া।

৫। দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

৬। শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতে এবং মুসলিমদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সাহসিকতা ও বীরত্বের অধিকারী হওয়া।

৭। কুরাইশ বংশীয় হওয়া। কারণ এর সপক্ষে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইজমা (উম্মতের ঐক্য) সাব্যস্ত হয়েছে।[১০]

কোনো সন্দেহ নেই, ইসলামের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো সবসময় এই শর্তগুলোকে সামনে রেখেই তার পথ চলা অব্যাহত রেখেছে। মুসলিম জনসাধারণও তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে এসব শর্তের উপস্থিতিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। ফকিহদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এসব শর্ত আমরা অধিকাংশ মুসলিম খলিফার মাঝে পুরোপুরিভাবে দেখতে পাই। *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু* গ্রন্থে ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি রহ. মুসলিম খলিফার মাঝে কী কী শর্ত থাকা জরুরি সে বিষয়ে আলোচনার সূচনালগ্নে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকামের (মৃ. ৮৬ হি.) বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, নিশ্চয় আবদুল মালিক ইবনে

১০. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৫।

মারওয়ান মানুষের কাছে ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসুল প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানান। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন বিখ্যাত এবং জ্ঞানগরিমায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তার ধর্মানুরাগের ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তার আল্লাহভীতিতে কারও কোনো প্রশ্ন নেই। সকলেই এক বাক্যে তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। কুরাইশের কেউই তার খলিফা হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেনি এবং শামের কোনো অধিবাসীও এ ব্যাপারে বিরোধিতা করেনি।[১১]

ইবনে কুতাইবার বর্ণনা করা ওইসব শর্তের উপস্থিতিতে মুসলিম জনসাধারণ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে এক বাক্যে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। ইসলামের ফকিহগণ খলিফার পদে সমাসীন ব্যক্তির মাঝে এসব শর্তের উপস্থিতিকে আবশ্যক হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার, কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে ফকিহগণ খলিফার ব্যাপারে যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, তা নিছক সমাজবহির্ভূত ব্যক্তিগত মতামত নয়, বরং শরিয়ত কর্তৃক প্রণীত বিধান এবং ইসলামি ভূখণ্ডে তা বাস্তবায়নের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক জড়িত। 'খিলাফত' বা ইমামতে কুবরার ব্যাপারে এর সঠিক বাস্তবায়নই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

আমাদের বোঝার বাকি নেই যে, ইসলামি সংস্কৃতিতে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আর খলিফা তো ভিন্ন গ্রহের কেউ নন, সাধারণ একজন মানুষ। কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে তিনি এই পদের উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছেন। যাই হোক, তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের কাছে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নন। রোম ও পারস্যের সম্রাটদের মতো স্বৈরাচারী ভাবাপন্ন হবেন না। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি এমন পদ যা মানবিক কল্যাণের জন্য নিবেদিত। জনসাধারণের সকল অধিকার রক্ষা করা, তাদের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। রোম ও পারস্যের সম্রাটগণ যা গুরুত্বের সঙ্গে নেননি।

---

[১১]. ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি, *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু*, খ. ৩, পৃ. ১৯৩।

পারসিক সভ্যতায় পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি খসরুকে প্রভু হিসেবে মানা হতো। পারসিক জনগণের সঙ্গে সম্রাটদের আচার-ব্যবহারের দ্বারা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি অধিকাংশ সম্রাট ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করে নিতেন। জনগণকে দাস বানিয়ে রাখতেন। সম্রাট দ্বিতীয় খসরুই এর সব থেকে বড় উদাহরণ। নিজেই নিজের উপাধি নির্ধারণ করেছেন এই বলে, সকল প্রভুর মাঝে চির অম্লান পুরুষ। সকল সম্রাটের মাঝে সবচেয়ে বড় অধিপতি। মহা ক্ষমতার অধিকারী। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেগে ওঠেন। বিখ্যাত নীলনদের জন্য তিনি তার দু-নয়ন উজাড় করে দিয়েছেন।[১২]

ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন গ্রন্থে আর্থার ক্রিস্টেনসেন খসরুর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, নিজের ধনভান্ডার পূর্ণ করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি অবিচার করেন। সাম্রাজ্যের জ্ঞানী ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের তিনি আদৌ মর্যাদা দিতেন না। তিনি ছিলেন চরম হিংসুটে, সন্দেহপ্রবণ। তার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে সন্দেহ করতেন তাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতেন সবসময়।[১৩]

তা ছাড়া পারস্যসম্রাট মনোনীত হতো বংশপরম্পরা অনুসারে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কোনো বিধিমালার আলোকে মনোনীত হতো না। আর তাই পারসিক সমাজে জনগণের ন্যূনতম কোনো অধিকার ও মূল্য অবশিষ্ট ছিল না। শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সামাজিকভাবে পারস্য সাম্রাজ্য চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল : এক. ধার্মিক শ্রেণি। দুই. যোদ্ধা ও সৈনিক শ্রেণি। তিন. বিধিমালা প্রণয়নে লেখক শ্রেণি। চার. সাধারণ জনগণ শ্রেণি (কৃষক, দিনমজুর ইত্যাদি)। আর এই চারটি স্তরের সবগুলোই ছিল (সাসানীয়) রাজপরিবার থেকে নিম্নস্তরের। রাজপরিবার ছিল এসব শ্রেণিবিন্যাসের অনেক উর্ধ্বে।[১৪]

রোমসম্রাটের অবস্থাও ছিল তাই। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হতো। তিনি স্বেচ্ছাচারমূলক রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষমতা

---

[১২]. আর্থার ক্রিস্টেনসেন, *ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন*, পৃ. ৪৩২।

[১৩]. প্রাগুক্ত, ৪৩৩।

[১৪]. প্রাগুক্ত, ৮৫।

রাখতেন। চরম স্বৈরাচারী হলেও তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার বা সামান্য প্রতিবাদ করার সুযোগ ছিল না কারও।[১৫]

পরবর্তীকালে সম্রাট মনোনয়নের ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে চলে যাওয়ায় তা প্রহসনে রূপ নেয়। এরপর থেকে সেনা অফিসারগণই রোমান সম্রাট হতে থাকেন। এসব ক্ষমতালোভী সেনাপতিগণ রাষ্ট্রপ্রধানের পদ পেয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পাদরি, ধর্মযাজক, জ্ঞানী-গুণী কেউই তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেত না। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট উরিলিয়ন[১৬] যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হন, তখন তাকে প্রভু বা ঈশ্বর বলে উপাধি দেওয়া হয়। সম্রাট দাক্লাদিয়ানুসের শাসনামলে তা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। তার আমলেই রোমান সাম্রাজ্য অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, অবক্ষয়ের চরম সীমায় উপনীত হয়। পাপের সাম্রাজ্য উপাধি পায় রোম।[১৭]

মোটকথা, ধর্মীয় ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব মূলনীতি ফকিহগণ নির্ধারণ করেছেন, মুসলিম খলিফাদের মাঝে এর সবগুলোই বিদ্যমান ছিল। তাই তো আমরা দেখতে পাই খলিফা হারুনুর রশিদ রহ. আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা চাওয়ার কারণে ওই ব্যক্তিকে মাফ করে দেন যে তার সম্মানে আঘাত করেছিল।[১৮] পারস্য ও রোমসম্রাটদের ইতিহাসে এরকম কোনো নজির নেই। আর এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা নিছক মুসলিম খলিফাদের গুণাগুণ ও ন্যায়-ইনসাফের প্রদর্শনী নয়, বরং শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত মুসলিম শাসকদের বাস্তব চরিত্রের প্রতিফলন।

---

১৫. মাহমুদ ইবরাহিম সাদানি, *মাআলিমু তারিখি রুমা আল-কাদিম*, পৃ. ৬৩।

১৬. বিখ্যাত রোমান সম্রাট (২১৫-২৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)। তার সেনাশাসনের দ্বারা নিজ সাম্রাজ্যে একনায়কতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন। আশপাশের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোকে সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তার আমলে প্রণীত মুদ্রার ওপর তার উপাধি লেখা ছিল 'পৃথিবীর সংস্কারক'। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তীরঘেঁষা ইলিরিকম এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অবশেষে সেনাবাহিনীর হাতেই তিনি নিহত হন।

১৭. মাহমুদ মুহাম্মাদ আল-হুয়াইরি, *রু'য়াতুন ফি সুকুতিল ইমবারাতুরিয়্যা আর-রুমানিয়্যা*, পৃ. ২৫, ২৬।

১৮. তারতুশি, *সিরাজুল মুলুক*, পৃ. ৭১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আমির বা খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি

খলিফা বা আমির মনোনয়নে শরিয়ত সবচেয়ে উত্তম ও ন্যায়সংগত পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি সংস্কৃতি অন্যান্য সকল সভ্যতাকে ছাপিয়ে এক অনন্য আসন গ্রহণ করেছে, এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। চিরসুন্দর এই ইসলামি সভ্যতা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, তা হলো শুরা (শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সর্বসম্মত পরামর্শক্রমে গঠন) পদ্ধতি। এই শুরা পদ্ধতি যে নিরেট ইসলামি সভ্যতার সৃষ্টি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। ইসলাম ও মানবসভ্যতায় শুরার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এর জন্য আমরা স্বতন্ত্র একটি অনুচ্ছেদ গঠন করেছি।

আর চলমান অনুচ্ছেদে শুধু খলিফা নির্বাচনে মুসলিমগণ যেসব আধুনিক ও যুগোপযোগী পন্থা আবিষ্কার করেছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। কোনো সন্দেহ নেই ইসলামের একেবারে সূচনালগ্নে খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচনপ্রক্রিয়া সংঘটিত হয় চারটি ধাপে। সব খলিফার ক্ষেত্রে হুবহু এক রকম না হলেও মৌলিকভাবে প্রক্রিয়াগুলো অভিন্ন। ইসলামি সভ্যতা মুসলিম জনসাধারণের সামনে চারটি শরিয়তসম্মত পথ ও পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছে, যেগুলোর নিরিখে মুসলিমদের ইমাম ও খলিফা নির্বাচন সম্ভব। নেতা নির্বাচনের বিষয়ে এটি গোটা বিশ্বমানবতার জন্য ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য অবদান।

সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ ও শ্রেষ্ঠ নমুনা আমরা দেখতে পাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি নির্বাচনের বেলায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর তার খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে সাকিফায়ে বনি সাদে আনসার সম্প্রদায় বৈঠকে বসে। তাদের মাঝে কেবল তিনজন ছিলেন মুহাজির: আবু বকর রা., উমর

ইবনুল খাত্তাব রা. এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.। বৈঠকে সিংহভাগ সদস্য আনসার হওয়া সত্ত্বেও তারা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। খলিফা নির্বাচনে মুহাজির সদস্যকে প্রাধান্য দেন। আবু বকর রা.-এর হাতে তারা বাইআত গ্রহণ করেন। বিশেষ করে আবু বকর রা. কুরাইশ গোত্রের 'তিম' নামক এক দুর্বল শাখার সদস্য এ কথা জানার পরও আনসারদের এ সিদ্ধান্ত বিশ্ব-ইতিহাসে নজিরবিহীন। অপরদিকে আনসারগণ সব দিক থেকেই ছিলেন এগিয়ে। দেশ তাদের। ভূখণ্ড তাদের। এরপরও তারা আবু বকরকে নেতা হিসেবে এগিয়ে দেন। কারণ তিনিই ছিলেন ধর্মীয় ও আদর্শগত দিক থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। এই পদ্ধতিকে আমরা 'সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচন পদ্ধতি' হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।[১৯]

ঠিক তেমনই আবু বকর রা. যেভাবে উমর রা.-কে তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন সেটিও ইতিহাসের পাতায় রাজনৈতিক সভ্যতার দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ হয়ে আছে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ তাবারি রহ. লেখেন, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবু বকর রা. জনসম্মুখে আগমন করেন। তাদের উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, আমি যদি কাউকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করে যাই, তাহলে আপনারা সন্তুষ্ট থাকবেন?! আল্লাহর শপথ, আমি এ বিষয়টি ভাবতে কোনো ত্রুটি করিনি এবং কোনো আত্মীয়স্বজনকেও আমি প্রস্তাব করছি না। বরং উমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার প্রতিনিধি নির্বাচন করছি। আপনারা সবাই তার কথা শুনবেন। তার আনুগত্য করবেন। এরপর সকলে সমস্বরে বলল, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং নির্দ্বিধায় মেনে নিলাম।[২০]

প্রস্তাবটি ছিল আবু বকর রা.-এর পক্ষ থেকে জনগণের উদ্দেশে। খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি আবু বকর রা.-এর একান্ত কর্তব্য ছিল না। জনগণও ছিলেন এ ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু আবু বকর রা.-এর প্রস্তাবকে তারা প্রত্যাখ্যান করেননি। কারণ জনগণের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এবং দেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের সামনে তিনি এ প্রস্তাব পেশ করেন। আবু বকর রা.-ও বিষয়টি মুখ ফসকে আচমকা বলে

---

১৯. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৪৩-২৪৫।

২০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

দেননি, বরং এর আগে এ বিষয়ে তিনি বড় বড় সাহাবির মতামত গ্রহণ করেন। তাবারি রহ. লেখেন, মৃত্যুশয্যায় আবু বকর রা. আবদুর রহমান ইবনে আওফকে ডেকে বললেন, উমর সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আল্লাহর শপথ! তিনি অন্য সবার চেয়ে উত্তম। তবে তার মধ্যে কিছু কঠোরতা আছে। তখন আবু বকর রা. বললেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ এ কথা এজন্য বলেছে, যেহেতু সে আমাকে নরম দেখেছে। তবে খিলাফতের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপলে তিনি অনেক বিষয়ে কঠোরতা বর্জন করবেন। হে আবু মুহাম্মাদ, আমি তাকে খুব যাচাই করেছি। দেখেছি, আমি কোনো বিষয়ে কারও ওপর রেগে গেলে তিনি আমাকে তা মেনে নিতে বলেন। কারও প্রতি আমি নরম হলে সে ক্ষেত্রে তিনি কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেন। হে আবু মুহাম্মাদ, আপনাকে যা বললাম তা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। উত্তরে তিনি বললেন, জি আচ্ছা। এরপর উসমান ইবনে আফফান রা.-কে ডেকে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ, উমর সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। উত্তরে উসমান রা. বললেন, তার সম্পর্কে আপনিই বরং বেশি অবগত। তখন আবু বকর রা. বললেন, হ্যাঁ, তার সম্পর্কে আমার ভালো জানা আছে। উসমান রা. বললেন, তবে আল্লাহর শপথ, যতদূর জানি বাহ্যিক রূপের চেয়ে তার ভেতরের রূপটা আরও বেশি উত্তম। আমাদের মাঝে তার কোনো জুড়ি নেই। তা শুনে আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন হে আবু আবদুল্লাহ। আমি যা বলেছি তা কারও সামনে প্রকাশ করবেন না। তিনি বললেন, আপনার যেমন ইচ্ছা।[২১] এভাবেই উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খলিফা হওয়ার প্রক্রিয়াটি পূর্ববর্তী খলিফার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে ইসলামি সভ্যতার অনন্য কীর্তির উদাহরণ আমরা তৃতীয় খলিফা নির্বাচনের বেলায়ও দেখতে পাই। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছয়জন বড় বড় সাহাবিকে মনোনয়ন করেন পরামর্শের জন্য। এই ছয়জনের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে মদিনার বাইরের এবং ভেতরের কারও কোনো দ্বিমত ছিল না। মুসলিম নেতা নির্বাচনে তাদের থেকেই যে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ মতামত পাওয়া যাবে এ

---

২১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫২।

বিশ্বাস সবার ছিল। বাস্তবতা হলো উমর রা. তাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই মনোনীত করেছিলেন। কারণ তারা আশারায়ে মুবাশশারা তথা পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করা দশজনের তালিকাভুক্ত ছিলেন। মূলত নির্বাচিত এ দলটি ছয়জনের নয়, ছিল সাতজনের। তারা হলেন উসমান ইবনে আফফান রা., আলি ইবনে আবু তালিব রা., আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা., সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা., যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা., তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.। আর সপ্তমজন ছিলেন সাইদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রা.; কিন্তু নিকটাত্মীয়তা থাকায় তাকে তিনি এ কমিটির বাইরে রাখেন। উমরের বংশের আর কেউ এ পদে আসুক, তা তিনি চাননি। তিনি বলতেন, উমরের বংশের কেবল একজনই হোক, আর কাউকে যেন এ পদের জন্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে না হয়।[২২]

কোনো সন্দেহ নেই উমর রা.-এর এই মনোনয়নকমিটি গঠন মুসলিমদের সাধারণ-বিশেষ সকল শ্রেণির কাছে ছিল সমাদৃত, বরং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তৎকালীন বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে যে কৌশল অবলম্বন এবং যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, উমর রা.-এর এই মনোনয়ন পদ্ধতি ছিল তার সঙ্গে পুরোমাত্রায় সংগতিপূর্ণ। এরকম নতুন পরিস্থিতিতে উমর রা. একা খলিফা নির্বাচন করে যাবেন তা যুক্তিযুক্ত ছিল না। এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকায় এর সঙ্গে খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি জড়িয়ে গেলে বড় রকম কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। যাই হোক, উমর রা.-এর কমিটি গঠন ছিল পুরোপুরি শরয়ি নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই উমর রা.-এর আহলে শুরা বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই পরামর্শের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। উসমান ইবনে আফফান রা.-কে তৃতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচনের ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেন। আর এভাবেই উমর রা.-এর মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শরিয়াভিত্তিক সুষ্ঠু নেতা নির্বাচনব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।

---

২২. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৮৫০।

চতুর্থ পদ্ধতিটি আলি ইবনে আবু তালিব রা.-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচনের বেলায় আমরা দেখতে পাই। এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং কঠিন ফেতনার সময়।[২৩] সে কারণে সঠিক ও যোগ্য মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণ তখন জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ ফেতনার উদ্ভবই ঘটেছিল পূর্ববর্তী খলিফাকে হত্যার মধ্য দিয়ে। তাই এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ফেতনা বড় আকার ধারণ করার আগেই তা মূলোৎপাটন করা জরুরি ছিল। আলি ইবনে আবু তালিব রা. ছাড়া অন্য কারও হাতে মুসলিমগণ বাইআত গ্রহণ করবেন সেই পরিস্থিতি তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনিই খলিফা হন এবং মসজিদে নববিতে বাইআত গ্রহণ করার শর্ত জুড়ে দেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মতো অনেক সাহাবি এরকম জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে মসজিদে বাইআত গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন; কিন্তু মুহাজির ও আনসার সকল সাহাবি শেষ পর্যন্ত মসজিদে নববিতেই আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।[২৪] এ ধরনের জটিল ও উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে নেতা নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া মুসলিমগণ উপহার দেন, সেখান থেকে আমরা সঠিক সময়ে যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করি।

উপর্যুক্ত চারটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে চার পদ্ধতিতে সফলভাবে নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া বিশ্ব রাজনীতির সামনে ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য অবদান। পরিস্থিতি কখনো ছিল শান্তিপূর্ণ আর কখনো ছিল যুদ্ধ ও ফেতনা কবলিত। তবে যাই হোক, সবগুলো পদ্ধতির মূলে ছিল শুরা এবং বাইআত গ্রহণ প্রক্রিয়া। এ দুটি বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। পাশাপাশি উত্তরাধিকারীকে বা নিকটস্থ কাউকে খলিফা নির্বাচনের বিধান নিয়েও আমরা আলোকপাত করব।

প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, চার খলিফা এবং তাদের পরবর্তী সময়ে মুসলিমগণ নেতা নির্বাচনে যেসব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যে আদর্শ পৃথিবীবাসীর সামনে রেখে গেছেন, তা মূলত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ইসলামি শরিয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। যা বিচিত্র পরিস্থিতিতে

---

২৩. আলি রা.-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া এবং তৎকালীন মদিনার পরিস্থিতি নিয়ে ফেতনার অধ্যায়ে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করব।

২৪. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৬৯৬।

নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার এবং ফেতনা নিয়ন্ত্রণে ইসলামি সভ্যতার সামর্থ্য ও সক্ষমতার প্রমাণ দেয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইসলামি সভ্যতা এ ধরনের শান্তিপূর্ণ ও সফল নির্বাচন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে অন্য সব সভ্যতাকে ছাপিয়ে গেছে।

আর ইসলামের ইতিহাসে গভর্নর বা আমির নির্বাচনের প্রক্রিয়া ছিল আরও সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়। আমির পদপ্রার্থীদের জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আদর্শ উপদেশ বা অনন্য মূলনীতি রেখে গেছেন। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা, কখনো তুমি নেতৃত্ব প্রার্থনা করো না। কারণ প্রার্থনা করে নেতৃত্ব লাভ করলে এর যাবতীয় দায়ভার তোমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে (আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতার সুযোগ থাকবে না)। আর বিনা প্রার্থনায় পেলে তোমাকে সহযোগিতা করা হবে।[২৫]

আর তাই দায়িত্ব প্রদানের সময় বা নেতা নির্বাচনের বেলায় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় এই মূলনীতিকে সামনে রাখতেন। আবু যর রা. বলেন, একবার আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে গভর্নর নিযুক্ত করুন। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধে হাত চাপড়ে বলেন, হে আবু যর, তুমি দুর্বল। আর নেতৃত্ব একটি আমানত। কেয়ামতের দিন তা অপমান আর লাঞ্ছনার কারণ হবে। তবে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে প্রত্যেকের হক আদায় করে থাকলে সেই অপমান আর লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি মিলবে।[২৬]

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন গোটা মুসলিম জাতির নেতা। নেতৃত্বের এই গুরুভার কে যথাযথভাবে পালন করতে পারবে আর কে পারবে না এ সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি অবগত। এ কথা পুরোপুরি জেনেই তিনি আবু যর রা.-কে এই দায়িত্বের অনুপযোগী বলেছিলেন। নেতৃত্ব পেলে যথাযথভাবে হয়তো হক আদায় করতে পারবে

---

২৫. *বুখারি*, কিতাবুল আইমান ওয়ান-নুযুর, ৬২৪৮; *মুসলিম*, কিতাবুল আইমান, ১৬৫২।
২৬. *মুসলিম*, কিতাবুল ইমারা, ১৮২৫।

না এ আশঙ্কায় আবু যর রা.-কে তিনি নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই এটিই হলো যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নববি পদ্ধতি ও ইসলামি সভ্যতার মূলনীতি। স্বজন বা বন্ধু হলেও অযোগ্যদের নির্বাচন না করে যোগ্য ও উপযুক্ত নেতা নির্বাচনে ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য অবদান এই 'নির্বাচনপ্রক্রিয়া'।

আর সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক দেখে তিনি নেতা বা গভর্নর নির্বাচন করতেন। আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তুলনামূলক এ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ না হওয়ায় অনেককে তিনি এ পদের জন্য মনোনীত করেননি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বাহরাম জুরের পুত্র বাযান ইবনে সাসান রা.-কে মনোনীত করা। *যাদুল মাআদ* গ্রন্থে ইবনুল কাইয়িম রহ. লেখেন, 'বাযান ইবনে সাসান রা.-কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। ইসলামের ইতিহাসে ইয়ামেনের প্রথম গভর্নর এবং অনারব রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রথম ইসলামগ্রহণকারী তিনিই। বাযান রা.-এর মৃত্যুর পর তারই পুত্র শাহর ইবনে বাযান রা.-কে 'সানা'র প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। শাহর রা. নিহত হলে সাইদ ইবনুল আসের পুত্র খালেদ রা.-কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। আর কিন্দা ও সাদাফে নিয়োগ করেন মুহাজির ইবনে উমাইয়া মাখযুমি রা.-কে।[২৭]

বিশ্বনবীর যুগ থেকে বহুকাল অবধি ইসলামি সভ্যতায় দক্ষ, যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকেই শুধু নেতৃত্বের পদগুলোতে নিয়োগ করা হতো। ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর বিবরণে এ কথারই প্রমাণ মেলে। কারণ সে সময় মক্কা ও মদিনার জন্য ইয়ামেন ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশ। সদকা, উশর ও ভূমিকরের প্রচুর অর্থ আসত ইয়ামেন থেকে। সেই বিবেচনায় এই ভূখণ্ডে নিযুক্ত গভর্নরকে অবশ্যই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শুল্ক উত্তোলন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নেতৃত্বপ্রার্থী বা মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে বেশ কিছু গুণ থাকা আবশ্যক বলেছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তার ভাষায়,

---

২৭. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মাআদ*, খ. ১, পৃ. ১২৫।

'নেতৃত্বের জন্য চারটি গুণ অবশ্যই লাগবে। এর একটিতে যদি সামান্য ঘাটতি থাকে, তবে সে নেতৃত্বের যোগ্য নয়। শর্তগুলো হলো : ন্যায়সংগত পন্থায় অর্থ উসুলের সামর্থ্য, যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয়, স্বেচ্ছাচারিতা না করে কড়াকড়ি আরোপ এবং লজ্জায় না ফেলে এমন নম্রতা অবলম্বন।'[২৮]

তা ছাড়া উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এমনি হুট করে নেতা বা গভর্নর নির্বাচন করতেন না, বরং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাকে বারবার যাচাই করতেন। নিবিড়ভাবে তার কার্যক্রম ও গতিবিধি লক্ষ করতেন। তার সম্পর্কে নিকটস্থদের জিজ্ঞেস করতেন। তার যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তবেই তাকে এ পদের জন্য মনোনীত করতেন। শর্ত জুড়ে দিতেন, মানুষের প্রয়োজন যতদিন পূরণ না হয়, ততদিন যেন তার দরজা উন্মুক্ত থাকে। যারা এ পদের প্রার্থী হতে চায়, সবসময় তিনি তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দিতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি পদ প্রার্থনা করবে, তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করা হবে না। এ কথার প্রবক্তা তিনিই প্রথম নন, বরং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি এ পদের প্রার্থনা করলে বিশ্বনবী স্পষ্ট বলে দেন, 'যে ব্যক্তি এ পদ প্রার্থনা করবে, তার দ্বারা আমরা এ কাজে সহায়তা নেব না।'[২৯]

এ পদের যোগ্য ব্যক্তিদের মাঝে দয়া ও নম্রতার গুণ থাকা জরুরি মনে করতেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। এসব গুণ না থাকলে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিতেন। একবার বহু যাচাইবাছাই করে এক ব্যক্তিকে তিনি কোনো এক এলাকার প্রশাসক হিসেবে মনোনীত করতে চাইলেন। সভায় নিয়োগপত্র লেখা হচ্ছিল। এমন সময় এক শিশু এসে উমর রা.-এর কোলে উঠে বসল। উমর রা. শিশুটিকে আদর করলেন। তা দেখে লোকটি বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, এর মতো আমার দশজন পুত্র রয়েছে। কেউ কখনো আমার কোলে উঠার সাহস করেনি। তখন উমর রা. বললেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া বিলুপ্ত করে দেন, এতে আমার কী করার আছে! যারা দয়া করে, আল্লাহ তাদের

---

২৮. তারতুশি, *সিরাজুল মুলুক*, পৃ. ৫০।

২৯. *নাসায়ি*, ৪, *ইবনে হিব্বান*, ১০৭১।

প্রতিও দয়া করেন। এরপর কাতেবকে নিয়োগপত্র ছিঁড়ে ফেলার আদেশ দিয়ে বলেন, 'যে লোক নিজের পুত্রদের দয়া দেখাতে পারে না সে জনগণের ওপর কী দয়া দেখাবে?!'[৩০]

আমরা দেখতে পাই, নেতা নির্বাচনে এরকম সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণেই তখনকার গভর্নর ও শাসকগণ ছিলেন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বহুমাত্রিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। যার মধ্যে অন্যতম হলেন আমর ইবনুল আস রা.। মিশরের গভর্নর হিসেবে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিয়োগ করা বিশিষ্ট এই সাহাবি মাত্র তিন হাজার পাঁচশ যোদ্ধা নিয়ে মিশর অভিযানে যান।[৩১] বিজয়ের পর মিশরবাসীর জন্য তিনি বহুমুখী উন্নয়নপ্রকল্প হাতে নেন। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ কারণেই তার শাসনামলে মিশরে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জোয়ার ছিল। তিনি জনগণকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তার আমলে মানুষ ন্যায্য ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করে। এ সময় 'ফুসতাত' শহরকে তিনি উন্নত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৩২] সমুদ্রপথে হেজায পর্যন্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আনা-নেওয়া সহজ করতে উপসাগরকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খননের প্রকল্প গ্রহণ করেন।[৩৩] সেখানে তিনি একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেন, তার নামেই এর নামকরণ করা হয়। এখনো পর্যন্ত মিশরের বুকে আমর ইবনুল আস নামের সেই মসজিদটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিযও প্রশাসক নির্বাচনে এমনই যাচাইপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। পরীক্ষা করতেন। মনের অবস্থা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বারবার বিভিন্নভাবে তাদের পরখ করতেন। উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. খলিফা হওয়ার পর বেলাল ইবনে আবি বুরদা[৩৪] এসে তাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যে-ই খলিফা হয়েছে সে-ই

---

৩০. ইবনুল জাওযি, *তারিখু উমার*, পৃ. ১০৪-১০৫।

৩১. ইবনে আবদুল হাকাম, *ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ৬৫।

৩২. প্রাগুক্ত, ১০৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১৭৯।

৩৪. বেলাল ইবনে আবি বুরদা আমের ইবনে আবু মুসা আল আশআরি। তিনি বসরার আমির ও কাযি ছিলেন। মর্যাদাবান লোক ছিলেন। দেখুন, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৬।

সম্মানিত হয়েছে। আপনিও এ পদকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর বেলাল মসজিদবান্ধব হয়ে পড়েন। দিনরাত সেখানে পড়ে থেকে তিনি তেলাওয়াতে মশগুল থাকেন। তা দেখে উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. তাকে ইরাকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগের ইচ্ছা পোষণ করে বলেন, এই লোকটি খুব ভালো এবং এ পদের জন্য সে উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য। এরপর নিজের একজন বিশ্বস্ত লোককে তার কাছে পাঠালেন। সে তাকে বলল, তোমাকে ইরাকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করলে আমাকে তুমি কী দেবে? এ প্রস্তাব পেয়ে বেলাল তাকে প্রচুর অর্থ দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এ কথা উমরের কানে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এবং তাকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে বলেন, হে ইরাকবাসী, তোমাদের এ সঙ্গী কথা বলতে পারে ভালো, তবে তার জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট অভাব। তার ভাষার পাণ্ডিত্য প্রচুর, তবে তার নিষ্ঠায় ঘাটতি অনেক।[৩৫]

জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাদের মাঝে ন্যায়-ইনসাফের শাসন কায়েম করতে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পাদনের সময় অধিকাংশ খলিফা গভর্নরদের উপদেশ দিতেন। খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার ভাই আবদুল আযিযকে মিশরের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর সময় উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

> সুখ ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দাও। সহযোগীদের প্রতি নম্র হও। সকল কাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখো। কারণ সৌহার্দ্যের মাধ্যমেই লক্ষ্য অর্জিত হয়। তোমার সহযোগীরা যেন হয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। কারণ তারাই তোমার অবয়ব ও বাহ্যিক রূপ। তোমার দরবারে আগতদের তুমি ভালো করে দেখে নিয়ো। যেন তুমি নিজেই তাকে নিয়োগ বা বিয়োগ করতে পারো। মজলিস শেষ করে সবাইকে সালাম দিয়ো, তাহলে তারা তোমার প্রতি সদয় হবে এবং তাদের অন্তরে তোমার প্রতি আস্থা ও ভালোবাসার জায়গা তৈরি হবে। কোনো সমস্যা বা জটিলতা তৈরি হলে তাদের সঙ্গে পরামর্শে বসো। কারণ পরামর্শের মাধ্যমে জটিল ও কঠিন

---

[৩৫]. ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ১০, পৃ. ৫১০।

বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়। কারও ওপর অসন্তুষ্ট হলে একটু বিলম্বে শাস্তি দিয়ো। কারণ হুট করে দণ্ড বাস্তবায়ন করে ফেললে কোনো কারণে সিদ্ধান্ত মুলতবি হলে তখন আর কিছুই করার থাকবে না।[৩৬]

এই ছিল মিশরের জন্য নবনিযুক্ত গভর্নরের উদ্দেশে খলিফা আবদুল মালিকের উপদেশবাণী। এতে যেকোনো গভর্নরের জন্য প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনের প্রধান প্রধান মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত আছে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, গভর্নর ও প্রশাসক নিবাচনে ইসলামি সভ্যতা এরকম হাজারও সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। পূর্ববর্তীকালের মুসলিম শাসকদের স্থাপন করা এসব উদাহরণ বিশ্বমানবতার কল্যাণে ইসলামি সভ্যতার অনন্য অবদানের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

৩৬. ইবনুত তিকতাকি, *আল-ফাখরিয়্যু ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যা ওয়াদ-দুওয়ালিল ইসলামিয়্যা*, ১২৬।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বাইআত (তথা খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার)

বিশ্বমানবতার কল্যাণে কাজ করা সকল সভ্যতার মধ্যে ইসলামি সভ্যতা এক অনন্য আসন তৈরি করেছে। সকল ধর্মের জন্য ইসলামি সভ্যতার চমৎকার ও উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর একটি হচ্ছে বাইআত (খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার) ব্যবস্থা। লক্ষণীয় বিষয়, এর আগে কোনো সভ্যতায় বাইআত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। বাইআতের অর্থ যদি হয় আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার, অপর দিকে এর অর্থ হলো, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যদিও ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর পরিমাণ খুব সামান্যই দেখা যায়। তারপরও এটি ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য।

'বাইআত' মানে প্রশাসকের বিধিনিষেধ মানা এবং তার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারনামা। সেই কার্যক্রমের মূল হলো আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী দ্বীন ও দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা। পাঠক জেনে অবাক হবেন, বাইআতের বেলায় ইসলাম নারী-পুরুষ বা বড়-ছোটর মাঝে কোনো তারতম্য করেনি। এটিই জনগণের মধ্যে সাম্য ও ভারসাম্য তৈরি করার অন্যতম উপাদান। কারণ, দেশ ও সমাজের উন্নয়নে সকল শ্রেণির অবাধ অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম।

ইসলামি সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই আলো ছড়িয়েছে বাইআত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সাহাবিগণ একাধিকবার বাইআত গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার বাইআত, বাইআতুর রিদওয়ান, বিশ্বনবীর হাতে তায়েফবাসীর বাইআত গ্রহণ ইত্যাদি। এ ছাড়াও ছোট-বড় বহু দল তার কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিল। আল্লাহর রাসুলের হাতে বাইআত গ্রহণ করা পুরুষদের সংখ্যা অগণিত। তেমনই মহিলাদের মধ্যেও বিরাট সংখ্যক আল্লাহর রাসুলের

হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত। ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. রাসুলের হাতে বাইআত গ্রহণকারী নারীর সংখ্যা ৪৫৭ উল্লেখ করেছেন। তবে তারা সবাই মুসাফাহার মাধ্যমে নয়, মৌখিকভাবে বাইআত গ্রহণ করেন। এমনকি আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের পর্যন্ত বাইআত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বাইআত গ্রহণকালে তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর।[৩৭]

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইসলামি সভ্যতা এক পরিপূর্ণ ও সফল সভ্যতা। এক জীবন্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। যা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে। আশপাশে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনায় তার সুষ্ঠু অংশগ্রহণে জোর তাগিদ দেয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাজনৈতিক আদর্শ থেকেও এর প্রমাণ মেলে। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই তিনি বাইআতের রীতি প্রচলন করেন। কুরআনুল কারিমের একাধিক স্থানেও আমরা বাইআতের উল্লেখ পাই। এখান থেকেই ইসলামি সভ্যতায় বাইআতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সুরা ফাতহ-এ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো মূলত আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত।[৩৮]

একই সুরায় অন্যত্র বলেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। তাদের অন্তরে যা ছিল আল্লাহ সে

---

৩৭. কাত্তানি, *আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ২২২।

৩৮. সুরা ফাতহ : ১০।

সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।[৩৯]

ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণে নারীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব বোঝাতে আল-কুরআনে নারীদের প্রতিও বাইআত গ্রহণের নির্দেশ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ﴾

তাদের (নারীদের) বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[৪০]

বিশ্বনবীর পরিপূর্ণ অনুকরণ নিশ্চিত করতে মুসলিমগণ পরবর্তীকালে বাইআতকে রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নেতা নির্বাচনে জনগণের সুষ্ঠু অংশগ্রহণের অন্যতম উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেন।

সম্মিলিত পরামর্শ ছাড়া একজনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। হজের সময় একবার এ বিষয়টি তার কানে গেলে মুসলিমবিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত হাজিদের উদ্দেশে খলিফা নির্বাচনের শর্ত এবং বাইআত ও শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত একটি ভাষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। তখন কেউ কেউ বললেন, হজের মৌসুমে তো বিভিন্ন ধরনের মানুষের সমাগম হয়। তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা আরবি ভাষা ঠিকমতো বোঝে না। ফলে তারা বিষয়টি ভালোভাবে না বুঝেই তাদের দেশে ফিরে যাবে এবং এতে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। তারচেয়ে ভালো হবে আপনি বিষয়টি মুলতবি রেখে মদিনায় ফেরার পর জ্ঞানী-গুনী ও বুদ্ধিমানদের সামনে এ নিয়ে কথা বললে। উমর রা. তাই করলেন। আল্লাহর রাসুলের মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আপনাদের মাঝে অনেকে বলেন, আল্লাহর শপথ, উমরের ইনতেকাল হয়ে গেলে আমি অমুকের হাতে বাইআত গ্রহণ করব। ভালো করে শুনে রাখো, আবু বকরের বাইআত গ্রহণটি ছিল একটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ত্বরিত শপথ গ্রহণ মাত্র—এ কথা বলে কেউ যেন

---

[৩৯]. সুরা ফাতহ : ১৮।

[৪০]. সুরা মুমতাহিনা : ১২।

প্রতারিত না হয়। হ্যাঁ, সেটি এরকমই ছিল। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আবু বকরের মতো গুরুজন এমন কেউ নেই এখন, যার দিকে মানুষ ঘাড় উঁচু করে দেখে। মুসলিমদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছাড়া যার হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে, বাইআতগ্রহীতা ও বাইআতকারী উভয়েই হত্যার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।[৪১] এরপর তিনি আবু বকর রা.-এর শপথ গ্রহণের বিষয়টি টেনে তখনকার পরিস্থিতির কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ত্বরিত বাইআত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কার বিষয়টি তিনি মানুষের কাছে পরিষ্কার করেন। আর আবু বকর রা.-এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কোনো মুসলিমের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। পক্ষান্তরে উমর রা.-এর বাইআত গ্রহণের বিষয়টিও ছিল বড় মাপের একদল সাহাবির সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ফসল। পরবর্তীকালে তা ইজমায়ে উম্মত হিসেবে গণ্য হয়। এ থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার যে, বাইআত বা শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়া অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হবে। মনোনীত ও বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও আলেমদের পরামর্শের মাধ্যমেই নেতা নির্বাচন সম্পন্ন হবে।[৪২]

উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর মতো অনেক খলিফা বাইআতের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। যদিও তিনি চাচাতো ভাই সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক কর্তৃক পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নির্ধারিত চুক্তিপত্রের সিদ্ধান্তের ওপর সাধারণ মুসলিমগণ সুলাইমানের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তারপরও জনগণের পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণের ওপর তিনি জোর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন, জনগণ যদি সন্তুষ্টচিত্তে তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়, তবেই তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এমন সংবাদ শোনার পর উমর ইবনে আবদুল আযিযের দেওয়া প্রথম ভাষণেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। সেই ভাষণে তিনি বলেন, হে লোকসকল, এ পদের প্রতি সামান্য চাহিদা বা লোভ আমার ছিল না, তারপরও আমার ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিমদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছাড়াই। তাই আমার হাতে বাইআতের যে

---

৪১. ইবনে তাইমিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, খ. ৫, পৃ. ৩৩০-৩৩১।

৪২. মুহাম্মাদ রশিদ রেজা, *আল-খিলাফা*, পৃ. ২০-২১।

দায়িত্ব আপনাদের ঘাড়ে ছিল, তা থেকে আপনাদের মুক্ত ঘোষণা করছি। এখন আপনারাই আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী খলিফা নির্বাচন করুন। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, আমরা আপনাকেই নির্বাচন করেছি হে আমিরুল মুমিনিন। আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই আপনিও সন্তুষ্টচিত্তে কল্যাণের জন্য আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।[৪৩] এ ঘটনাটিতে উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ-এর দুনিয়াবিমুখতা প্রকাশের পাশাপাশি ইসলামি সভ্যতার ধারকবাহকদের চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং যোগ্য নেতা নির্বাচনে তাদের পরিপক্বতার বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে মুসলিম স্কলারগণ বাইআত গ্রহণের জন্য অপরিহার্য পাঁচটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। সেগুলো হলো:

১। যার হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে ইমামতের জন্য প্রযোজ্য সকল শর্তের উপস্থিতি থাকতে হবে। খিলাফত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

২। বাইআত ব্যবস্থাপক ব্যক্তিকে অবশ্যই বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলার বা নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের হতে হবে। যার কথা সবাই অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেবে।

৩। যার হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে, বাইআতের প্রতি তার ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে এবং বাইআত পরবর্তী দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে তাকে পুরো প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি সে বাইআত করতে অনীহা প্রকাশ করে তাহলে জোরপূর্বক তাকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

৪। বাইআত গ্রহণকারী একজন হলে সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হবে। তবে সংঘবদ্ধভাবে হলে সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

৫। যার হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে, তিনি হবেন একজন। একাধিক ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ করা যাবে না।[৪৪]

কোনো সন্দেহ নেই, মুসলিম স্কলারদের প্রণীত ও স্বীকৃত এসব শর্ত ইসলামি শাসনব্যবস্থার উন্নত নিদর্শন এবং ইসলামি সভ্যতার অনন্য

---

[৪৩]. আজুররি, *আখবারু আবি হাফস উমার ইবনে আবদুল আযিয*, পৃ. ৫৬; ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ৪৫, পৃ. ৩৫৭।

[৪৪]. আজুররি, *আখবারু আবি হাফস উমার ইবনে আবদুল আযিয*, পৃ. ৫৬; ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ৪৫, পৃ. ৩৫৭।

অবদান। কারণ এসব শর্ত ও বিধি প্রণয়নের একমাত্র লক্ষ্য একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কল্যাণের বিষয় সংযুক্ত করা।

বাইআত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খিলাফত গ্রহণের অন্যতম মৌলিক শর্ত হওয়ায় ইসলামি সভ্যতার পুরো ইতিহাসেই আমরা বাইআতের প্রতিফলন দেখতে পাই। এমনকি খিলাফতের পর্ব যখন একেবারে দুর্বল ও অন্তিম মুহূর্তে, তখনও ইসলামি খলিফাগণ এ বাইআতকে কতটুকু গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন সে ঘটনাগুলোও আমাদের জানা। সেলজুক শাসনামলেও মুসলিমগণ বাইআত গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি ৪৮৫ হিজরিতে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান দামিগানি নবনিযুক্ত খলিফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। বাইআতের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শুরুতেই খলিফা মুস্তারশিদ বিল্লাহ রাষ্ট্রের বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলারদের বাইআত গ্রহণে এবং তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে মনোযোগ দেন। তৎকালীন বাগদাদের বিজ্ঞ স্কলার এবং হাম্বলি মাযহাবের বিদগ্ধ আলেম আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল রহ. বলেন, মুস্তারশিদ বিল্লাহ খলিফা হওয়ার পর তিনজন সরকারি কর্মচারী আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন, আমিরুল মুমিনিন আপনাকে তলব করেছেন। এরপর রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি প্রধান বিচারপতি তার সামনে দাঁড়ানো। তিনি আমাকে বললেন, তিনিই আমিরুল মুমিনিন (তিনবার)। তখন আমি বললাম, তাহলে এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের ও জনগণের ওপর আল্লাহর পরম কৃপা। এরপর আমি হাত বাড়িয়ে দিই। তিনিও নিজ হাত প্রসারিত করে সাড়া দেন। আমি সালাম দিয়ে মুসাফাহা করি। এরপর বাইআত গ্রহণ করে বলি, আমি কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসুল এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের ওপর আমিরুল মুমিনিন মুস্তারশিদ বিল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম। আশা করছি, তিনি নিজ সাধ্যমতো কুরআন-সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকবেন। এ ব্যাপারে আমি তার আনুগত্য প্রকাশ করলাম।[৪৫]

নববি যুগ থেকে চলে আসা এ অনুপম রীতি ও সুমহান ঐতিহ্যের মাধ্যমে নতুন খলিফা নির্বাচনে প্রজা বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রমাণ

---

[৪৫]. কালকাশান্দি, *মাআসিরুল ইনাফা*, খ. ১, পৃ. ১৭৬।

পাওয়া যায়। কোনো সন্দেহ নেই, এসব ঘটনা ইসলামি সভ্যতার অনন্য কীর্তি ও অসামান্য অবদান, যা মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা দেয়। এভাবেই একজন খলিফা, বিচারক থেকে শুরু করে ইসলামি স্কলার, আলেম, ফকিহসহ সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে রাষ্ট্রপ্রধানের আসন অলংকৃত করেন।

ইসলামি সভ্যতায় সবসময় বাইআত ছিল একটি সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের মতো। নবনিযুক্ত প্রার্থী থেকে শুরু করে এমনকি পদত্যাগকারী সকলেই নিজেদের জন্য এবং তাদের যোগ্য পুত্র, ছোট-বড় সকলের জন্য জনগণের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু বাইআত গ্রহণে সমান গুরুত্বারোপ করতেন। এ অনুপম রীতি শুধু একটি ইসলামি রাষ্ট্রেই নয়, তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এমনকি স্পেনেও বিরাজমান ছিল। মরক্কোয় প্রতিষ্ঠিত ইদরিসীয় সাম্রাজ্যের আমির ইদরিস ইবনে ইদরিস ইবনে আবদুল্লাহ মাত্র এগারো বছর বয়সে জনগণের পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাস্তবেও তিনি ছিলেন দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য, স্পষ্টভাষী ও দুরন্ত সাহসী। মিম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, সকল বন্দনা আল্লাহর। তাঁরই প্রশংসা করছি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁরই ওপর ভরসা করছি। নিজের ও সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আমি তাঁরই আশ্রয় চাচ্ছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। জিন ও ইনসানের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে তিনি আগত। আল্লাহর ইচ্ছায় আল্লাহর দিকে তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। তিনি সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গের প্রতি রহম করুন। তাঁর পরিবারকে আল্লাহ সকল অনিষ্ট ও অপবাদ থেকে সুরক্ষা দান করেছেন এবং তাদের পূত-পবিত্র করেছেন। হে লোকসকল, এ পদে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর সকলেই জানেন, এ পদের কেউ ভালো কাজ করলে তার প্রতিদান সে বহুগুণ বেশি পাবে। তেমনই মন্দ কাজ করলে শাস্তিও তার দ্বিগুণ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এর জন্য সঠিক লক্ষ্যেই আছি। তাই অন্য কারও প্রতি আপনারা মনোনিবেশ করবেন না। কারণ ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন আপনারা লালন করেন, তা আমাদের মাঝেই পাবেন। এরপর তিনি মানুষকে বাইআতের আহ্বান

জানান। সকল স্তরের মানুষকে আনুগত্যের স্বীকৃতি দিতে উৎসাহ দেন। মানুষ তার স্পষ্টবাদিতা ও কৈশোরের এ অসামান্য দূরদর্শিতা দেখে অভিভূত হয়ে যায়। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এলে মানুষ তার হাতে বাইআত গ্রহণের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার হস্তচুম্বন করতে ভিড় করে। এরপর তিনি মরক্কোর যানাতা, আওরাবা, সানহাজা, গামারাসহ সকল বারবারীয় জাতি-গোষ্ঠীর বাইআত গ্রহণ করেন। এভাবেই তাঁর বাইআত প্রক্রিয়াটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।[৪৬]

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, ইসলামি সভ্যতায় বাইআত ছিল মানবতার প্রতি এক অসামান্য অবদান। যার ফলে সমাজের ছোট-বড়, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ সবার ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল এই মহান ব্যবস্থা। কোনো সন্দেহ নেই সাম্প্রতিক পশ্চিমা সভ্যতার চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে ছিল ইসলামি সভ্যতা। পাশ্চাত্যের অধুনা সভ্যতা শুধু ব্যক্তিবিশেষের শর্তসাপেক্ষে স্বাধীনতা দিয়েছে। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে (১২১৫ খ্রি.) কিং জন ব্রিটেনের সাম্রাজ্যাধিপতি হওয়ার পর 'অ্যারিস্টোক্রেসি' নামে মানবতার প্রতি মূল্যবোধ প্রদর্শনের যে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়,[৪৭] তা ছিল শুধুই নির্দিষ্ট কিছু লোক এবং একটি গোষ্ঠীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ, গোটা মানবতার নয়। অনেকে এই ঘটনাকে ব্রিটিশ প্রশাসনের দৃষ্টিতে গণস্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জনে একটি মাইলফলক হিসেবে মনে করেন। বরং কেউ কেউ খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে অবশেষে মানবতার মূল্যবোধের স্বীকৃতি প্রদান সম্ভব হয়েছে বলে গর্ববোধ করে এটিকে অভূতপূর্ব সাফল্য হিসেবে অভিহিত করেন। অথচ ইসলামি সভ্যতা কখনো মানুষের মাঝে বৈষম্য তৈরি করেনি। নেতা বা প্রশাসক নির্বাচনেও জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রচলন করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ধনী-গরিব সকলের সুষ্ঠু অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে ইসলামি সভ্যতা।

---

৪৬. আহমাদ ইবনে খালেদ আন-নাসিরি, *আল-ইসতিকসাউ লি-আখবারি দুওয়ালি মাগরিবিল আকসা*, খ. ১, পৃ. ২১৮।

৪৭. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৬, পৃ. ২৭৪-২৭৫।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

পরবর্তী খলিফা নির্বাচন

পরবর্তী খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়া ইসলামি রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। সূচনালগ্নে ইসলামি বিশ্ব যেরকম দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, একের পর এক দেশ বিজয়, নতুন নতুন সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ঘটছিল, নানা বর্ণের নানা জাতের নানা ভাষার মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল, তখন বাস্তবেই যোগ্য নেতৃত্ব গঠনের স্বার্থে এরকম নতুন ও আধুনিক ব্যবস্থা প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল।

'অলিয়ে আহদ' হলেন সেই ব্যক্তি, যাকে বর্তমান খলিফা বা শাসক তার মৃত্যুর পর শাসক হিসেবে নিযুক্ত করবেন। এরকম মনোনীত ব্যক্তি একজনও হতে পারেন, ক্রমান্বয়ে একাধিকও হতে পারেন। খলিফা কর্তৃক তার কোনো পুত্র অথবা পিতাকে পরবর্তী শাসক হিসেবে ঘোষণা করা অনেক ফিকহি মাযহাবেও স্বীকৃত। কারণ বর্তমান খলিফা হলেন আমিরুল মুমিনিন। তার আনুগত্য জনগণের ওপর ফরয। তিনি নিজে কাউকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করলে অন্য কারও এখানে দ্বিমত করার অবকাশ থাকবে না। তার রেখে যাওয়া আমানতের ব্যাপারে কোনোপ্রকার অপবাদের সুযোগ থাকবে না। বিরুদ্ধাচরণ করার উপায় থাকবে না।[৪৮]

ولاية العهد বা পরবর্তী খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক হলেন খলিফা মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. (মৃ. ৬০ হি.)। এটি ছিল তার 'ইজতিহাদি' উদ্ভাবন। এর পেছনে কারণও ছিল যথেষ্ট। কেননা পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত না করে গেলে রাষ্ট্রে গোলযোগ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ভয় ছিল যে, বিরোধিতার মুখে পড়তে পারে গোটা রাষ্ট্র, পরবর্তী সময়ে যা পুরো মুসলিমজাতির জন্য সর্বনাশ ডেকে

---

৪৮. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১৩।

আনতে পারে। কারণ তখন শামের অধিবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠীই ছিলেন রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড এবং তারা ছিলেন খলিফা মুআবিয়া এবং তার পুত্র ইয়াযিদের সমর্থক।[৪৯]

বাস্তবতা হলো, পুত্র ইয়াযিদের বাইআতের জন্য মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান সকল অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। শুধু তিনজন সাহাবি ও সাহাবিপুত্র এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৫০] তবে এ ব্যাপারে তিনি ইজমায়ে উম্মত (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) অর্জনে সক্ষম হন। এর পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল উম্মতকে বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা। আর এটাই ছিল তার কাছে সবকিছু থেকে অগ্রগণ্য।

যদিও মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর হাতে ولاية العهد বা পরবর্তী খলিফা নির্বাচনব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়, তবে সেখানেও নতুন শাসকের জন্য বাইআত ব্যবস্থা বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জনের প্রক্রিয়া স্বমহিমায় বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই মুআবিয়া থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল উমাইয়া খলিফা শাসনকর্তার জন্য উন্নত চরিত্র ও অপরিহার্য সকল গুণের উপস্থিতিকে তারা জরুরি মনে করতেন। যাদের মাঝে এসব গুণ ও শর্ত অনুপস্থিত থাকত, তাদেরকে এড়িয়ে যেতেন। গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদানে তাদের বারণ করতেন। তাদের কাছে বাইআত গ্রহণ করতে মানুষও অনীহা প্রকাশ করত। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, খলিফা বা শাসকের মাঝে কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক, সেগুলো মুআবিয়া রা. আগেই সবিস্তারে বর্ণনা করে গেছেন। যেমন সত্যবাদিতা, বদান্যতা, সহনশীলতা, নিষ্কলুষতা, বীরত্ব।[৫১] পাশাপাশি সহিষ্ণুতা ও দানশীলতার গুণ থাকাও অপরিহার্য বলে মনে করতেন। কারণ সহিষ্ণুতা বিরোধিতা থেকে রক্ষা করবে। ঐক্যের পথ সুগম করবে। এ কারণেই তিনি ইয়াযিদকে বলতেন; পুত্র আমার! সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলে কখনো অনুশোচনায় পড়তে হবে না তোমাকে।[৫২]

---

[৪৯]. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৪৪৫।

[৫০]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ২৪৮। তারা হলেন, হুসাইন ইবনে আলি, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা.।

[৫১]. নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব*, খ. ৬, পৃ. ৪।

[৫২]. ইবনুত তিকতাকি, *আল-ফাখারিয়্যু ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১০৫।

বড় পুত্রকেই পরবর্তী শাসক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে এমন কোনো লিখিত নিয়ম ছিল না। তবে খলিফাগণ পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকেই পরবর্তী খলিফার পদের জন্য মনোনীত করতেন। আবার কখনো রাজপরিবারের বাইরের লোককেও পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দিতেন।

যাই হোক, সকল খলিফাই ইসলামের মৌলিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল ছিলেন। ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়াই প্রথম তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনা করেন। যে অভিযানের ব্যাপারে স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন। সেই অভিযানে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের তিনি প্রশংসা করে বলেছেন,

«أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَهُمْ»

রোমসম্রাটের শহর অভিযানকারী আমার উম্মতের প্রথম সেনাবহর আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত।[৫৩]

এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একজন খলিফা হলেন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান। তিনি উমাইয়া খিলাফত সাম্রাজ্যে দীর্ঘ ৬৫ হি. থেকে ৮৬ হি. পর্যন্ত শাসন করেন। ইসলামি রাষ্ট্র তার আমলে বিশাল বিস্তৃতি লাভ করে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম। তার আমলে যথাক্রমে মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক[৫৪] চীন বিজয় করেন। কুতাইবা ইবনে মুসলিম আল-বাহেলি[৫৫] সমরকন্দ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো বিজয় করেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম হিন্দুস্তান বিজয় করেন। মুসা ইবনে নুসাইর[৫৬]

---

৫৩. *বুখারি* : কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : মা কি-লা ফি কিতালির রুম, ২৭৬৬।

৫৪. মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক (৬৬ হি.-১২০ হি./৬৮৫ খ্রি.-৭৩৮ খ্রি.)। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা দামেশকে। যুদ্ধবিষয়ক অনেক ঘটনা তার থেকে বর্ণিত রয়েছে। দেখুন, *তাহযিবুল কামাল*, খ. ২৭, পৃ. ৫২৩।

৫৫. কিংবদন্তি সেনানায়ক, সুমহান বীরপুরুষ তিনি। খাওয়ারিজম ও বুখারার মতো এলাকাগুলো তার হাতেই বিজিত হয়। এরপর ফারগানা ও তুর্কি দেশসমূহও মুসলিমদের করতলগত করেন তিনি। দেখুন, ইমাম যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪১০।

৫৬. ৯৭ হিজরিতে ইনতেকাল করা এ সেনানায়কের বেড়ে ওঠা দামেশকে। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ৮৮ হিজরিতে তাকে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর হিসেবে মনোনীত করেন। তারেক ইবনে যিয়াদের সঙ্গে মাত্র এক বছরের কম সময়ের মধ্যে তিনি স্পেন বিজয় সম্পন্ন

প্রথমে উত্তর আফ্রিকা ও পরে আন্দালুস বিজয় করেন। শুনে অবাক হতে হয়, উমাইয়া শাসনামলেই ইসলামের এত সব বিজয় সম্পন্ন হয়। ফলে এসব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দ্রুত ইসলামি সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।[৫৭]

৯৯ হিজরিতে ইনতেকাল করা খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর ইবনে আবদুল আযিযের (মৃ. ১০১ হি.) নাম ঘোষণা করেন। অথচ তখন পরবর্তী খলিফা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার ভাই হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের (মৃ. ১২৬ হি.)।[৫৮] এ থেকেই বোঝা যায়, পরবর্তী খলিফা নির্বাচন নিজ পরিবার বা আপনজন থেকেই করতে হবে এরকম কোনো লিখিত নিয়ম ছিল না।

সেরকমই আরেকটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই আবদুর রহমান ইবনে মুআবিয়া আদ-দাখিলের (মৃ. ১৭২ হি.) ঘটনা থেকে। তার দুই পুত্র হিশাম ও সুলাইমান উভয়েই ছিলেন খলিফা হওয়ার যোগ্য আর সুলাইমান ভাইদের মধ্যে বড় ছিল। তৃতীয় পুত্র ও তাদের আরেক ভাই আবদুল্লাহকে তাদের মধ্যে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণে সালিস নির্ধারণ করেন। খলিফা আবদুর রহমান ছিলেন তখন মৃত্যুশয্যায়। পুত্র হিশাম তখন মারদা[৫৯] অঞ্চলের গভর্নর। অপর পুত্র সুলাইমান টলেডো[৬০] অঞ্চলের প্রশাসক। অন্তিম মুহূর্তে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন, তোমার দুই ভাইয়ের মধ্যে যে তোমার কাছে আগে এসে পৌঁছবে, তার হাতেই তুমি আংটি (সিল) ও নেতৃত্ব তুলে দেবে। হিশাম যদি আগে আসে তবে সে ধার্মিকতা ও সচ্চরিত্রে অতুলনীয়। সকলেই তাকে একবাক্যে মেনে নেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যদি সুলাইমান আগে আসে, তবে বয়সের দিক থেকে পরিণত হওয়ায় এবং শামবাসীদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ায় সেও যথেষ্ট উপযুক্ত। এরপর সুলাইমানের আগে ছোট পুত্র হিশাম এসে কর্ডোভার নিকটবর্তী রাসাফায় অবতরণ করেন। ছোট ভাই আবদুল্লাহ কর্ডোভায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে

করেন। তার ইনতেকাল হয় মদিনায়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪৯৬; ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ৩১৮।

৫৭. ইউসুফ আল কারযাবি, *তারিখুনাল মুফতারা আলাইহি*, পৃ. ৮২।

৫৮. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৭৪।

৫৯. ফিলিস্তিনের একটি শহর।

৬০. স্পেনের একটি প্রাচীন শহর।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তার ব্যাপারে হিশাম যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলেন; কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবদুল্লাহ তার ভাই হিশামের কাছে ছুটে যান। পিতার ওসিয়তমতো হিশামের হাতে খিলাফত ও আংটি হস্তান্তর করে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন।[৬১]

এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, স্পেনের খলিফা আবদুর রহমান আদ-দাখিল তার পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি জানতেন, তার পুত্রদের মধ্যে পরবর্তী খলিফা হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে হিশাম। কারণ খোদাভীতি, দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে তার পারদর্শিতাসহ খলিফা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্তই তার মাঝে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তারপরও নিজ পুত্রদের মাঝে সংঘাত তৈরি হোক, খিলাফত নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হোক, এটা তিনি চাননি। কারণ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বড় ছেলে সুলাইমানই পরবর্তী পদের অধিকারী হওয়ার কথা; কিন্তু সেই সংঘাত এড়াতে সুকৌশলে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্ডোভায় যে আগে পৌঁছবে তার হাতেই খিলাফতের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে বলে পুত্র আবদুল্লাহকে ওসিয়ত করেন। এরপর আবদুর রহমান আদ-দাখিলের অনুমান সত্যি হয়। পুত্র হিশামই কর্ডোভায় আগে পৌঁছে যান। আর তিনিই ছিলেন পরবর্তী খলিফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।

কোনো সন্দেহ নেই, পরবর্তী খলিফা নির্বাচনব্যবস্থাটি ইসলামি সভ্যতায় একটি সুসংগঠিত ও বাস্তবিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামি ভূখণ্ড যতই বিস্তৃত হয়েছে, ততই সেটি আরও জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় সুফল ছিল উম্মত বা জাতি হিসেবে মুসলিমদের একতা সুরক্ষা, যা ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় খিলাফতের পতনের আগ পর্যন্ত গোটা মুসলিমবিশ্বে বিদ্যমান ছিল।

---

[৬১]. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, খ. ২, পৃ. ৬১।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

জনগণের সঙ্গে শাসকদের সম্পর্ক

ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি কারণ হলো তা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে পেরেছে যে, তাদের ও শাসক শ্রেণির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং শাসকবর্গ তাদের সেবক ও হিতৈষী। একজন শাসক সচ্ছলতা ও বিপদের মুহূর্তে জনগণের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক অটুট রাখবেন সেই মহান শিক্ষা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন। মদিনায় হিজরতের পর ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে 'মসজিদে নববি' নির্মাণের কাজে তিনি সাহাবিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। সেই ঘটনার জীবন্ত বর্ণনা উরওয়া রা.-এর বিবৃতিতে উঠে এসেছে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবিদের সঙ্গে ইট বহনের কাজে অংশ নেন। ইট বহনের সময় তিনি বলছিলেন,

«هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرَ، هٰذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ»

> আজকের এই ইট বহনের কাজটি খাইবার অঞ্চলের সাধারণ ইট বহনের মতো কোনো কাজ নয়। বরং এটি আমাদের মহান প্রতিপালকের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও পবিত্র একটি কাজ।

তিনি আরও বলছিলেন,

«اللّٰهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ، فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ»

> হে আল্লাহ, আখেরাতের পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ ও বড় পুরস্কার। তাই আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার দয়া অব্যাহত রাখুন।[৬২]

---

৬২. *বুখারি*, ৪১৮; *মুসলিম*, ৫২৪।

কঠিন বিপদের মুহূর্তেও সাথিদের সঙ্গে থেকে তিনি তাদের মনোবল বাড়ানোর কাজ করেন। তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন। খন্দক যুদ্ধে তিনি নিজে খননকাজে অংশ নেন। তখন তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল ইবনে রাওয়াহার রচিত বিখ্যাত কাব্যমালা। তিনি মাটি অপসারণের কাজ করছিলেন। এমনকি কাজের চাপে তার পেটের সাদা অংশ মাটিতে লেপটে যায়।[৬৩] এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও নিরহংকারী চরিত্রের প্রভাব পড়ে সাহাবিদের মাঝে। যা ওই যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে তাদের ভেতর টনিকের মতো কাজ করে। তাদের সাহস ও মনোবল বাড়াতে তা বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে শত্রুদের পৌছার আগেই তারা সবরকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন আদর্শ সেনাপতি, জনগণের বিপদের সময় যিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়ে তাদের সঙ্গে একই সারিতে কাজ করে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

বিশ্বনবীর পর তাঁর প্রতিনিধি হওয়া খুলাফায়ে রাশেদিনের মাঝেও আমরা সেই আদর্শ ও চরিত্রের প্রতিবিম্ব লক্ষ করি। বিশ্বনবীর তখন ইনতেকাল হয়ে গেছে। মুসলিমদের শাসক তখন আবু বকর রা.। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ভাষায়, মদিনার উপকণ্ঠে বাস করত এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, সেই অন্ধ বৃদ্ধার জন্য আমি পানির ব্যবস্থা করব। তার প্রয়োজন পূরণ করব। সেজন্য যখনই আমি তার কাছে আসতাম, দেখতাম আমার আগে কে যেন তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে চলে গেছেন। প্রতিদিন আমার আগে কে এসে এই বৃদ্ধার প্রয়োজন পূরণ করে দেন তা দেখার জন্য একদিন আমি আগেভাগে এসে পাশের এক জায়গায় আত্মগোপন করে রইলাম। দেখি আবু বকর এসে বৃদ্ধার প্রয়োজন পূরণ করছেন। আর আবু বকর তখন আমিরুল মুমিনিন। তা দেখে উমর বলে উঠলেন, খোদার কসম! আপনিই তাহলে সেই লোক।[৬৪]

জনগণের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তারা ছিলেন সদা তৎপর। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও সাধারণ মানুষের প্রতি যত্ন ও তাদের

---

৬৩. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৪৯৫। ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৩০৬; সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ২, পৃ. ৩৩৬।

৬৪. সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, খ. ১, পৃ. ৭৪।

কল্যাণের জন্য শাসকদের কী পরিমাণ মনোযোগ ছিল, নোমান ইবনে মুকরিন রা.-এর প্রতি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর লেখা চিঠি থেকে এর প্রমাণ মেলে। চিঠির ভাষা ছিল এমন :

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটি আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনিন উমরের পক্ষ থেকে নোমান ইবনে মুকরিনের প্রতি। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা শোনাচ্ছি। যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। পরকথা এই, নিহাওয়ান্দ শহরে বেশ কিছু অনারব জাতি-গোষ্ঠী আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমবেত হয়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি। আমার চিঠি পাওয়ামাত্রই আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবেন। আল্লাহর সাহায্য ও মদদ আপনার এবং আপনার সঙ্গে থাকা মুসলিমদের সাথে আছে। কোনো দুর্গম প্রান্তর বা গহিন অরণ্য দিয়ে যাবেন না। তাহলে সাধারণ মুসলিমদের কষ্ট হবে। তাদের অধিকার নষ্ট করবেন না, নয়তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাদের নিয়ে ঘন বৃক্ষলতায় ভরা জঙ্গলে প্রবেশ করবেন না। কারণ একজন মুসলিম আমার কাছে এক লক্ষ দিনারের চেয়েও বেশি মূল্যবান। আসসালামু আলাইকুম।[৬৫]

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর অন্য একটি ঘটনায় বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। ১৭ হিজরির শেষ দিকে মদিনায় খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে বছর বৃষ্টিবাদল কম হওয়ায় মদিনার সকল ফসলি জমি ও চাষাবাদের ভূমি শুকিয়ে ফেটে যায়। *তাবাকাতে ইবনে সাদ*-এ উল্লেখিত আছে, সে বছর একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে মাখন মেশানো রুটি আনা হলে তিনি একজন বেদুইনকে সঙ্গে নিয়ে খাবার খেতে বসেন। বেদুইন প্লেটের একপাশ থেকে বড় বড় লুকমায় দ্রুত রুটি খেতে থাকে। তা দেখে উমর রা. বললেন, তুমি দেখছি বড় বড় লুকমায় সব রুটি মুহূর্তেই সাবাড় করে ফেলছ! বেদুইন বলল, বহুদিন হলো তেল আর মাখন চোখে পড়ে না। অনেক দিন ধরে কাউকে এসব খাবার খেতে দেখি না। এ ঘটনার পর উমর রা. শপথ করেন, যতদিন না মানুষের এই দুর্দশার পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন কোনো মাখন বা মাংস তিনি স্পর্শ করবেন না।

৬৫. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৩৬৫।

উমর রা. ছিলেন একজন খাঁটি আরব। মাখন আর দুধই ছিল তার প্রথম পছন্দ। মানুষ দুর্ভিক্ষে পড়ায় এসব খাবার তিনি নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নেন। অনাহারে-অর্ধাহারে সে বছর তার গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিজের গায়ে সয়ে নিয়ে অন্যসব শাসকের জন্য শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থাপন করেন। সন্ধ্যায় শুধু তেল মাখানো রুটি দিয়েই খাবার সারতেন। একদিন একটি উট জবাই করে গোশত পাকিয়ে মানুষকে খাওয়ানো হয়। তার সামনে সেই উটের কুঁজ ও কলিজার সামান্য অংশ নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কীসের? সবাই বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আজ যে উট জবাই হয়েছে সেই উটের। তা শুনে তিনি বললেন, উঠিয়ে নাও, সরিয়ে নাও। আমি খাব নরম গোশত ও কলিজা আর মানুষ খাবে হাড্ডি, তা কখনো হবে না। এ খাবার সরিয়ে সাধারণ খাবার নিয়ে এসো আমার জন্য। এরপর রুটি আর তেল আনা হলে তিনি রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে তেলের সঙ্গে মাখিয়ে খেয়ে নেন। এরপর বললেন হে ইয়ারফা, এই খাবার তুমি 'ছামাগ'[৬৬] গ্রামে থাকা আমার পরিবারের লোকদের দিয়ে এসো। তিন দিন হলো তাদের জন্য আমি কোনো খাবার পাঠাতে পারিনি। মনে হয় তারা এবার পেট ভরে খেতে পারবে। এগুলো তাদের দিয়ে এসো।[৬৭]

জনগণের প্রতি মুসলিম শাসকদের দরদ কেমন ছিল তার আরেকটি উদাহরণ আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর (মৃ. ২২৭ হি.) অভিযান থেকে বোঝা যায়। রোমান সৈন্যবাহিনী একজন মুসলিম নারীকে বন্দি করলে সে চিৎকার করে সাহায্য চায়, হে মুতাসিম!! খলিফা মুতাসিমের কানে সে সংবাদ পৌঁছলে তিনি সিংহাসনে বসেই সেই আবেদনে সাড়া দেন, বলে ওঠেন, আমি প্রস্তুত, আমি প্রস্তুত। আর তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছেড়ে প্রাসাদে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, আন-নাফির, আন-নাফির। (যুদ্ধের ডাক এসেছে। বেরিয়ে পড়ো সবাই।) এরপর তিনি বাহনে উঠে জিজ্ঞেস করেন, রোমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য কেল্লা কোনটি? সবাই বলল, আম্মুরিয়ার দুর্গ। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত কেউ তাতে আক্রমণ করেনি। এটি খ্রিষ্টানদের মূল ভূমি। কনস্টান্টিনোপলের চেয়েও তাদের কাছে এটি বেশি পবিত্র। এরপর

---

৬৬. মদিনার নিকটবর্তী এক জায়গার নাম।

৬৭. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৩১২।

মুতাসিম যুদ্ধের জন্য এত বিপুল পরিমাণ সেনা, অস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়সামগ্রী, প্রয়োজনীয় আসবাব প্রস্তুত করলেন, যা ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধের জন্য কোনো খলিফা করেননি। এরপর অভিযান শুরু করে ৬ রমযান (২২৩ হিজরি) তিনি সেই স্থানে পৌছেন। ৫৫ দিন সেখানে অবস্থান করে সকল বন্দিকে মুক্ত করেন। এরপর তারাসুস অভিমুখে রওয়ানা হন।[৬৮]

এগুলো মুসলিম শাসকদের থেকে সংঘটিত কাকতালীয় কোনো ঘটনা নয়, বরং যে নীতি আদর্শের সংস্পর্শে এসে তারা এসব ঘটনার জন্ম দিয়েছেন, সেই আদর্শের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে ইসলামি সভ্যতা। পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনো জুড়ি নেই। খলিফা হিশামের সেনাপতি আল-হাজিব আল-মনসুর মাত্র তিনজন মুসলিম নারীকে উদ্ধার করতে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অভিযান চালান। এ তিন নারী স্পেনের বেক্কিউ রাজ্যে গির্জায় কারাবন্দি ছিল। একবার মনসুরের পক্ষ থেকে একজন রাজদূত সেই গির্জা পরিদর্শনে গেলে বহুদিনের কারাবন্দি এক নারীকে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। এরপর ওই নারী দূতকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, মনসুর কি শুধু নিজেই ভোগবিলাসে মত্ত থাকবে আর আমাদের দুঃখদুর্দশার কথা ভুলে যাবে? নিজে রাজকীয় পোশাক পরবে আর আমরা নোংরা পোশাকে অপবিত্র হয়ে দিনযাপন করব? আর কত বছর পর্যন্ত বিধর্মীদের এ কারাগারে আমাদের থাকতে হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে তার কাছে আবেদন করেন, যেন সে তার এই গ্লানির জীবনের অবসান ও কষ্ট-যন্ত্রণাকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করেন এবং এ মর্মে তার থেকে শক্ত শপথ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আশ্বস্ত হন। এরপর এই দূত মনসুরের কাছে গিয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় ও তথ্য তাকে অবহিত করেন। মনসুর তার কথা শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে শোনেন। মনসুর আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে অস্বস্তিকর ঠেকেছে এরকম কিছু দেখেছ সেখানে? নাকি তেমন কিছু তুমি সেখানে পাওনি! এরপর দূত মনসুরকে ওই নারীর ঘটনা ও তাকে দেওয়া অঙ্গীকার সম্পর্কে অবহিত করেন। বন্দি নারীর সকল অভিযোগ ও শপথবাক্য হুবহু মনসুরের সামনে উপস্থাপন করেন। তা শুনে মনসুর

---

৬৮. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ৪৫।

দূতকে তিরস্কার করে বলেন, এ কথা তুমি প্রথমেই বলোনি কেন?! এরপর মনসুর ওই নারীসহ সকল মুসলিম নারীকে উদ্ধার করতে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন।[৬৯]

ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে এমনই ছিল শাসকদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক। যে সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সহানুভূতি, দয়া, উপকার সাধন ও আন্তরিকভাবে জনগণের কল্যাণে নিবেদিত হওয়া। ক্ষমতার লোভ বা কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়।

---

৬৯. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ৪০৪।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

ইসলামি সভ্যতা যুগ যুগ ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গমন করলেও মুসলিম স্কলারগণ হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। আর তাই তাদের লেখা অসংখ্য বইপুস্তক আমরা দেখতে পাই যার মাধ্যমে তারা ইসলামি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়কে আরও সুসংহত ও সমৃদ্ধ করতে বিপুল অবদান রেখে গেছেন। এসব রচনাসম্ভার মূলত তাদের প্রশাসনিক অবস্থার বাস্তব বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরে। চোখে আঙুল দিয়ে শাসকদের নেতিবাচক দিকগুলো দেখিয়ে সংশোধনের পথ বাতলে দেয়।

এ কারণেই ইসলামি সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মুসলিম মনীষীগণ বইপুস্তক রচনার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ইসলামি রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গন এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা যাদের লেখনীতে উঠে এসেছে তাদের অন্যতম হলেন বিখ্যাত ফিকহ বিশারদ আবু ইউসুফ রহ.[৭০]। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর শিষ্য। الخراج। *আল-খারাজ* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি শাসক ও জনগণের মাঝে কীরকম সম্পর্ক থাকবে এ বিষয়ে সাধারণ ইজতিহাদের গণ্ডি পেরিয়ে বেশ কিছু গঠনমূলক নির্দেশনা প্রদান করেন। ইমামের পূর্ণ আনুগত্যের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বেশ কিছু হাদিস উল্লেখ করে তিনি তার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। এর মধ্যে একটি হাদিস হলো :

«إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا»

---

৭০. তিনি হলেন ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে হাবিব আল-আনসারি আল-বাগদাদি। (১১৩-১৮২ হি./৭৩১-৭৯৮ খ্রি.) ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ও সহচর। হানাফি মাযহাবের প্রথম প্রচারক হিসেবে বিখ্যাত এই মহাপুরুষ ছিলেন বিজ্ঞ ফকিহ, হাফিযুল হাদিস। কুফায় তার জন্ম। হাদিস ও রেওয়ায়েত বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। কাযিয়ুল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাকেই প্রথম সম্বোধন করা হয়। তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের অন্যতম হলো *আল-খারাজ*। দেখুন, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ২৯২-২৯৩; *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৯৩। *মুজামুল মাতবুআত*, খ. ১, পৃ. ৪৮৮।

> নাক/কান কাটা একজন হাবশিকেও যদি তোমাদের নেতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শোনো। তার আদেশ মেনে চলো।[৭১]

এরপর হাসান বসরি রহ.-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করে এ বিষয়টি আরও জোরালো করে তোলেন, তোমরা শাসকদের নিন্দা করো না। ভালো কাজ করলে তারা পুরস্কার পাবে, আর তোমরা তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবে। মন্দ কাজ করলে এর বোঝা তাকেই বহন করতে হবে, আর তোমরা শুধু ধৈর্য ধারণ করবে।[৭২]

আবু ইউসুফ রহ. আরও বলেন, একজন শাসকের উচিত জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। তাদের অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে উপদেশ দিতে এসে এক ব্যক্তি বলল, اتق الله—আল্লাহকে ভয় করুন। মজলিসে উপস্থিত একজন ব্যক্তিটির স্পর্ধা দেখে তাকে ধমক দিলে উমর রা. তাকে বললেন, জনগণ যদি আমাদের কিছু না বলতে আসে তাহলে এ ধরনের জনগণের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। আর আমরা যদি তাদের মতামত না শুনি, তাহলে আমাদের মাঝেও কোনো কল্যাণ নেই।[৭৩]

এর দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামি রাজনীতির বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান সূত্র হলো হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তবে যাই হোক, এটি হলো মতামত গ্রহণ ও উপদেশ প্রদানের আদলে রাজনৈতিক বিষয়ের একেবারে প্রাথমিক পদক্ষেপ।[৭৪]

এ কারণেই আমরা লক্ষ করি, হিজরি ৩য় শতকের গোড়া থেকেই লেখালেখি ও রচনা তৈরি রাজনীতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করার একমাত্র উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সে সময় ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু* রচনা

---

৭১. *ইবনে মাজাহ*, ২৮৬১; *তিরমিযি*, ১৭০৬; *আহমাদ*, ২৭৩০১।
৭২. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ১০।
৭৩. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ১২।
৭৪. আবদুল আযিয আদ-দুরি, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৮।

করেন। বইয়ের এই শিরোনামটিই সেই শতাব্দীতে নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক
ইস্যুতে মুসলিম মনীষীদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট
বলে আমরা মনে করি। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই রাজনীতিকে
মুসলিমগণ কেমন গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন এবং তারা কীরকম দক্ষ ও
অভিজ্ঞ রাজনীতিক উপহার দিয়েছিলেন এই বইয়ে তার বিস্তারিত বিবরণ
পাওয়া যায় এবং পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে ইসলাম শুধু ভ্রাতৃত্ব ও
উদারতার ধর্ম নয়, রাজনীতি ও নেতৃত্বেরও ধর্ম।

ইবনে কুতাইবা গ্রন্থের সূচনা করেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর
রা.-এর খিলাফত ইস্যু দিয়ে। আর ইতি টানেন খলিফা মামুনের বিবরণ
দিয়ে। প্রত্যেক খলিফার বৃত্তান্ত ও খলিফাকেন্দ্রিক বর্ণনাগুলো পৃথকভাবে
উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে বইয়ের বিন্যাস ঘটান। যেসব ইতিহাসগ্রন্থে
লেখকের কোনো সংযোজন ছাড়া শুধু রেওয়ায়েত বা বর্ণনাকারীদের
বিবৃতি সংকলন করা হয় এটি সেরকমই একটি বই। অনেকটা *তারিখে
তাবারি* এবং *সিরাতে ইবনে হিশাম*-এর মতো।

এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দুই শতকে লেখা রাজনীতিকেন্দ্রিক বই
বিশেষত খিলাফত ও খলিফাদের নিয়ে লেখা রচনাসমূহ আরও উন্নত ও
পরিপক্ব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছে। খিলাফত ও শাসনব্যবস্থা বিষয়ক
স্বনামধন্য লেখক ইমাম মাওয়ারদি রহ.-এর লেখা *আল-আহকামুস
সুলতানিয়্যা ওয়াল-বিলায়াতুদ দ্বীনিয়্যা* الأحكام السلطانية والولايات الدينية
বইটি সে কালের খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো। বইটি
বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবিক উভয় ক্ষেত্রেই সমান তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত
হয়। এ ছাড়াও ইমাম মাওয়ারদির সমকালীন আরও অনেকের লেখা এ
বিষয়ে আলো ছড়িয়েছে। যেমন হেলাল ইবনে মুহসিন আস-সাবির[৭৫]
লেখা *রুসুমুল খিলাফা*। তবে এ বইটি এত গভীরভাবে বিশ্লেষণে যেতে
পারেনি। আরও পরিষ্কার করে বললে একটি ইসলামি সমাজকে

---

৭৫. হিলাল আস-সাবি। তার পুরো নাম আবুল হুসাইন হেলাল ইবনে মুহসিন আস সাবি (৩৫৯-৪৪৮ হি./৯৭০-১০৫৬ খ্রি.)। তিনি একাধারে লেখক, চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ। বাগদাদ নিবাসী এ লেখক বহুদিন পর্যন্ত বাগদাদের রাজদরবারের রচনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে : *আখবারু বাগদাদ*, *রুসুমু দারিল খিলাফা*, *গুরারুল বালাগা*, *তুহফাতুল উমারায়ি ফি তারিখিল ওয়ারায়ি* উল্লেখযোগ্য। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ৯২।

সুনিপুণভাবে নেতৃত্ব দেওয়া এবং উন্নতি ও অগ্রগতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যেসব উপায়-উপকরণের বর্ণনা ইমাম মাওয়ারদির লেখায় পাওয়া যায়, সেরকমটি *রুসুমুল খিলাফাতে* পাওয়া যায়নি।

মোটকথা, স্বসময়ে প্রধান বিচারপতির পদে দায়িত্বরত মাওয়ারদি নামের এই মহান পুরুষ তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহর একান্ত কাছের লোক ছিলেন। খলিফা ও বুওয়াই সাম্রাজ্যের (Buyid Dynasty) মাঝে দূত হিসেবে কাজ করতেন। ফলে রাজনৈতিক পটভূমিতে বহু দিনের কাজের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিনি তার অনবদ্য *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা ওয়াল-বিলায়াতুদ দ্বীনিয়্যা* গ্রন্থটি রচনার ইচ্ছা করেন।

ومن لم تقع هزيمته الرجعة حتى انجلاء الحرب ثم طلق ولم يجز
ان حبس بعد ... للقى الحجاج اسرا من اصحاب قطري بن الفجاءة
لمعرفة كانت بينهما فعاله قطري عد الى قتال عدو الله الحجاج فقال
هيهات ... على يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها وانشا يقول

أأقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر بانها مولاته
اني اذن لاخو الدناءة والذي شهدت باقبح فعله غدراته
ماذا اقول اذا برزت ازاءه في الصف واحتجت له فعلاته
أأقول جار علي لا اني اذن لاحق من جارت عليه ولاته
وتحدث الاقوام ان صنائعا غرست لدي فحنظلت نخلاته

والخامس ان لا يغنم اموالهم ولا يسبي ذراريهم روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال منعت دار الاسلام ما فيها واباحت دار الشرك
ما فيها والسادس ان لا يستعين على قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي
وان جاز ان يستعين بهم على قتال اهل الحرب والردة والسابع ان لا
يهادنهم الى مدة ولا يوادعهم على مال فان هادنهم الى مدة لم يلزم فان ضعف
عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم وان وادعهم على مال بطلت الموادعة
ونظر في المال فان كان من فيئهم او من صدقاتهم لم يرده عليهم
وصرفت الصدقات في اهلها والفيء في مستحقيه وان كان
من خالص اموالهم لم يجز ان يملكه عليهم ووجب رده اليهم
لانهم بذلوه على ما قد منع والثامن ان لا ينصب عليهم العرادات

চিত্র নং-১

মাওয়ারদি রচিত 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা'

এ গ্রন্থে খিলাফত ও রাজনীতি সংক্রান্ত সকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ ও বিধি উল্লেখ করেন। নেতা নির্বাচন থেকে শুরু করে অপরাধ ও ফৌজদারি বিধির সকল আইনকানুন সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিয়োগ পাওয়া প্রতিটি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করেন। কারণ রাজনৈতিক এসব পদে কর্মরত মানুষগুলোই পুরো মুসলিমজাতির জন্য মেরুদণ্ডের মতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মারওয়ারদি বলেন, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা* মূলত নেতা, শাসক ও গভর্নরদের উদ্দেশ্যে লেখা। এ বইটি অধ্যয়ন করলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণকারী এ শ্রেণি অনেক রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বিশেষভাবে সেখানে উল্লেখ করেছি। যেন ইসলামি আইনবিদগণ এ বই থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং যে বিষয়গুলো আমি এতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি, সেগুলো রচনার কাজে হাত দিতে পারেন। এ বই লেখার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল শাসকশ্রেণি যেন বইটি পড়ে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন। ইনসাফ কায়েম বা সুচারুরূপে বিচারকার্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন।[৭৬]

তবে যাইহোক, মাওয়ারদি রহ. খিলাফত ও ইমামতকে একই অর্থে নিয়ে এর সংজ্ঞা করেছেন এভাবে,

«الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع»

ইমামত (ইসলামি শাসক নির্ধারণ প্রক্রিয়া) প্রতিষ্ঠা হয়েছে নবুয়তের প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীনের সুরক্ষা এবং ভূপৃষ্ঠের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে। আর এ মহান দায়িত্ব যে ব্যক্তি ভালোভাবে পালন করতে পারে তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেওয়ার লক্ষ্যে ইমাম বা খলিফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব।[৭৭]

উম্মতের মহান আইনবিদগণ খিলাফতের যেসব সংজ্ঞা ও শর্ত উল্লেখ করেছেন, তাদের সুরে সুর মিলিয়ে একজন নির্ভেজাল আইনজ্ঞের মতো

---

৭৬. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

তিনিও খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়কে ইজমায়ে উম্মতের (সকল মুসলিম স্কলারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের) ভিত্তিতে ওয়াজিব হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে এখানে তিনি পরিষ্কারভাবে খিলাফত শব্দের উল্লেখ করেননি। কারণ ওই সময় প্রকৃত অর্থে খিলাফতের পটভূমি অবশিষ্ট ছিল না। শুরা পদ্ধতির বদলে তখন প্রচলিত ছিল বাইআত ও বংশানুক্রমিক ইমাম নির্বাচন প্রক্রিয়া।

এখানে মাওয়ারদির বিশ্লেষণ কয়েকটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত। সবগুলোকে সমন্বয় করলে সারকথা এই দাঁড়ায় যে, ইমামত বা শাসক নির্বাচন শুধু যুক্তির নিরিখে নয়, বরং শরিয়তের ভিত্তিতে ওয়াজিব। আর সেটি হবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। শাসক নির্বাচনে প্রস্তাবিত ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই কুরাইশ বংশের হবেন। সামসময়িক সকল ধর্মীয় নেতা এবং ইজতিহাদের স্তরে উপনীত সকল আইনজ্ঞ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করবেন। মাওয়ারদির বক্তব্য থেকে আরও স্পষ্ট, তুলনামূলক কম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকেও ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা যাবে। তাই বলে একসঙ্গে দুজনকে শাসক বানানো যাবে না। পরবর্তী শাসনকর্তা হিসেবে মনোনীত ব্যক্তি বা যুবরাজ ইচ্ছা করলে যুবরাজ হিসেবে নির্ধারিত অন্য ব্যক্তিদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন। তবে এটি ছিল নিছক মাওয়ারদির ইজতেহাদপ্রসূত মত। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতও এরূপ বলে তিনি দাবি করেন।[৭৮]

ইসলামি রাজনৈতিক ইস্যুতে লেখা আরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো আবু বকর আত-তারতুশি[৭৯] রচিত *'সিরাজুল মুলুক'*। এই স্থূলকায় গ্রন্থে তিনি একাধারে আরব, পারস্য, রোম, হিন্দুস্তান, সিন্ধু এলাকা এবং হিন্দ-সিন্ধের সমন্বিত নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সৌন্দর্যের দিকগুলো নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। মূলত এ গ্রন্থটি তিনি লেখেন মিশরের নবনিযুক্ত উযির

৭৮. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২০।

৭৯. পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে খালাফ আল-কুরাশি আত-তারতুশি (৪৫১-৫২০ হি./১০৫৯-১১২৬ খ্রি.)। মালেকি মাযহাবের ফকিহ হিসেবে খ্যাত এ মনীষী ছিলেন পশ্চিম আন্দালুসের তারতুশ এলাকার অন্যতম সুসাহিত্যিক। তার ইনতেকাল হয় আলেকজান্দ্রিয়ায়। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২৬২-২৬৪।

মামুন বাতাইহির[৮০] উদ্দেশ্যে। এর পেছনে তার লক্ষ্য ছিল, হক প্রতিষ্ঠায় মামুনকে উদ্বুদ্ধ করা। শরিয়তের প্রতি তাকে অনুগতরূপে গড়ে তোলা। আহলে সুন্নাতের মাযহাবগুলোর প্রতি তাকে শ্রদ্ধাশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ এর আগে মামুন ছিলেন মিশরের শিয়া ফাতেমি সাম্রাজ্যের অন্যতম উযির।

সিরাজুল মুলুক গ্রন্থটি চৌষট্টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে বিবৃত হয়েছে রাজনীতি, শাসনবিধি, মানবাধিকার রক্ষা নীতি, একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য অপরিহার্য গুণাবলি, সুলতানের বৈশিষ্ট্য, রাজ্য সুরক্ষার কৌশল, রাষ্ট্রকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার সব নীতিমালা। স্থান পেয়েছে রাষ্ট্রনায়ক অবিচার ও স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হলে জনগণের করণীয়, সৈনিক ও যোদ্ধাদের সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কের সম্পর্ক ও তাদের সঙ্গে আচরণ, রাজস্ব উত্তোলন ও অর্থ ব্যয়সহ রাজনৈতিক নানা বিষয়। তা ছাড়াও এই গ্রন্থে তিনি মন্ত্রীদের সম্পর্কে বলেছেন। উযিরদের বৈশিষ্ট্য ও নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে পরামর্শ ও উপদেশদানের মতো উন্নত গুণাবলি ধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে একজন সুলতান কীভাবে এবং কতটুকু হস্তক্ষেপ করতে পারবেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। শহরে-নগরে নিয়োগকৃত সরকারি কার্যনির্বাহী ও কর্মচারীদের প্রতি সুলতান কীরূপ নীতি অবলম্বন করবেন সেই বিষয়গুলোও তিনি স্পষ্ট করেছেন। তা ছাড়া জিম্মির (ভিসা বা অনুমোদন নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম) প্রতি সরকারের আচরণ এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা তিনি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধবিষয়ক নিয়মনীতি ও কলাকৌশলের কথাও বিখ্যাত এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অপরদিকে ৫৮৯ হিজরিতে ইনতেকাল করা স্বনামধন্য আইনবিশারদ আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ শাইযারি রহ. *আল-মানহাজুল মাসলুক*

---

৮০. মামুন বাতাইহি (মৃ. ৫১৯ হি./১১২৫ খ্রি.) দরিদ্র অবস্থায় বেড়ে ওঠা এ মন্ত্রী শুরুতে কুলির কাজ করতেন। ফাতেমি সরকারের উঁচু স্তরের কর্মকর্তা আফজাল আল-উবাইদির কাছে তিনি মজদুরি করতেন। এরপর ধীরে ধীরে উন্নতি করতে করতে মিশরের মন্ত্রণালয়ে চাকরি পেয়ে যান। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী, মহৎ ও দানবীর। তবে রক্তপাতের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রনায়ককে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে তাকে শূলে চড়ানো হয়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৯, পৃ. ৫৫৩।

ফি সিয়াসাতিল মুলুক রচনা করেন। এ গ্রন্থ লেখার পেছনে তার লক্ষ্য ছিল, গল্প ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার ছলে সুলতান সালাহুদ্দিন ইবনে আইয়ুবকে রাজনৈতিক উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। পূর্ববর্তী শাসকদের অবস্থা বর্ণনা করে সেখান থেকে সারনির্যাস বের করে তাকে শিক্ষা গ্রহণের পথ বলে দেওয়া। এ কারণেই গ্রন্থের শুরুতে কিতাব লেখার নেপথ্য কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সালাহুদ্দিনের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে আমি এ গ্রন্থ রচনা করেছি। এতে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কথা, সাহিত্যের মণিমুক্তা, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার রক্ষার মূলনীতি লিপিবদ্ধ আছে। রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করা এবং জনগণের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কৌশলও এতে বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন এবং সৈনিকদের মাঝে এর সুষম বণ্টন পদ্ধতি, সেনাবাহিনীর ওপর জিহাদ সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সংযোজন করেছি। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভালো ও মন্দ চরিত্রের দিকগুলো উল্লেখ করেছি। রাষ্ট্র পরিচালনায় মাশওয়ারা বা পরামর্শের গুরুত্ব, মাশওয়ারায় উৎসাহ প্রদান, শত্রুদের মোকাবেলা, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলো সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। এর জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণ, ঘটনা, যুক্তি, প্রমাণ সবকিছু বর্ণনা করেছি।[৮১] কোনো সন্দেহ নেই, সালাহুদ্দিনের মতো একজন দূরদর্শী ও বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক সবসময় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন। এ কারণেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দীক্ষা নিয়ে এবং পূর্ববর্তী খলিফা ও শাসকদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি রচনা করেন একের পর এক বিজয়ের উপাখ্যান। রাষ্ট্রকে উন্নীত করেন সমকালীন সকল সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বে।

উক্ত গ্রন্থে স্বরাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ইস্যুকে ভূরাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য সুলতানমাত্রই জনগণের সঙ্গে বসার ও তাদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার ওপর জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থে লেখক বলেন, জেনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রনায়ককে সময় বের করে বসতে হবে। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বাদী-বিবাদীর মাঝে নিষ্পত্তি

---

৮১. শাইযারি, *আল-মানহাজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক*, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

বিধান করতে হবে। এগুলো ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তা না করলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে না। সুষম বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।[৮২] রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ স্পষ্ট করতে গিয়ে সালাহুদ্দিনের উদ্দেশ্যে বইতে তিনি লেখেন, তিন কারণে রাষ্ট্র ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে যায় : প্রথম কারণটি রাষ্ট্রনায়ককেন্দ্রিক। আর সেটি হলো, শাসকের মনোবৃত্তি যদি তার বুদ্ধি বিবেচনাকে ছাপিয়ে যায়। তাহলে ভোগের সুযোগ আসামাত্রই সে তা লুফে নেবে। খুঁজবে শুধু আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার সকল উপায়-উপকরণ। দ্বিতীয় কারণটি হলো মন্ত্রিপরিষদ-কেন্দ্রিক। আর তা হলো নিজের মতের বিরুদ্ধে হলেই প্রতিহিংসা-প্রবণতা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের মাঝে সবসময় মনোমালিন্য ঘটবে। ফলে তৈরি হবে বিভেদ। তৃতীয় কারণটি হলো, সেনাবাহিনী ও শাসকের একান্ত সহযোগীকেন্দ্রিক। আর তা হলো, জিহাদের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বরফের মতো জমে বসে থাকা। জিহাদের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ না করে অস্ত্রের প্রয়োগ ছাড়া শান্তির পথ তালাশ করা।[৮৩]

তকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া[৮৪] রহ. রচিত *আস-সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যা ফি ইসলাহির রায়ি ওয়ার-রায়িয়্যাহ* গ্রন্থটিও ইসলামি রাজনীতির বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া রহ. তার এ গ্রন্থে পরিষ্কার করে বলেছেন, বর্তমান সময়ে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া, তাদের রাষ্ট্রগুলো হাতছাড়া হওয়া এবং শত্রুদের হামলার কেন্দ্রস্থল হওয়ার একমাত্র কারণ শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা, নৈরাজ্য এবং আল্লাহর বিধান থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়া। যার ব্যাপ্তি মুসলিম জনসাধারণকেও গ্রাস করে ছেড়েছে। শাসনযন্ত্র ও শাসকশ্রেণির বিনষ্টতাকে কেন্দ্র করে মূলত প্রধান দুটি নির্দেশনা নিয়ে তার এ বইটি রচিত। এর মধ্যে একটি হলো, যথাযথভাবে অর্থব্যয় নিশ্চিত করা এবং আমানত ও দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে

---

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২-৫৬৩।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭।

৮৪. তার পুরো নাম আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম আল-হাররানি (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.)। তিনি একাধারে ইমাম, বড় আলেম, বিখ্যাত ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, শাইখুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত। হাররানে জন্মেছেন। দামেশকে ইনতেকাল করেছেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত* খ. ৭, পৃ. ১১।

আদায় করা। দ্বিতীয়টি হলো, সবকিছুতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং মানুষের সকল অধিকার রক্ষা করা। দ্বিতীয় ইস্যুর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একজন শাসকের চরিত্রের উত্তম দিকগুলো টেনে এনেছেন। শাসক ও শাসিত সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। যার ফলে নবীন ও প্রবীণ গবেষক মহলে বইটি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।[৮৫]

ইসলামি রাজনীতির বিষয়ে উন্নত লেখনী বেরিয়ে এসেছে ইবনে খালদুনের হাত থেকেও। বিখ্যাত *আল-মুকাদ্দিমায়* তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এবং সমাজের সকল শ্রেণি ও দলকে একটি সংঘে পরিণত করার পদ্ধতি ও কৌশলগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ গ্রন্থে তিনি সমাজের শুধু একটি শ্রেণির বিবরণ ও তাদের সমস্যার কথা বর্ণনা করেননি, বরং সমাজের শহুরে ও গ্রাম্য উভয় শ্রেণির স্বাতন্ত্র্য বর্ণনা করে উভয় শ্রেণির সমস্যার সমাধানের পথ বর্ণনা করেন। ইবনে খালদুনের মতো জগদ্‌বিখ্যাত লেখকের শুধু এ গ্রন্থেই নয়, বরং তার লেখা সব পুস্তকেই তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর চমৎকার একটি উদাহরণ হলো, খিলাফত ও ইমামতকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, খিলাফত হলো দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণার্থে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সকল কিছু বিধান করা। অর্থাৎ আখেরাতের ভালোমন্দ পরিণামের কথা বিবেচনা করে জাগতিক সকল সমস্যার সমাধান শরিয়তের মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে। আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে, এক কথায় শরিয়তের বিধিবিধানের ওপর ভিত্তি করে ধর্মের সুরক্ষা এবং ভূ-রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার নাম হচ্ছে খিলাফত।[৮৬]

তবে খিলাফত ও রাজত্বের মাঝে পার্থক্য করেছেন ইবনে খালদুন। তিনি বলেন, রাজত্বের মূল হলো কিছু রাজনৈতিক বিধিনিষেধ, যেগুলো জনসাধারণ একবাক্যে মেনে নেয় এবং পালন করতে বাধ্য থাকে। এবার এই বিধানগুলো যদি রাষ্ট্রের বিজ্ঞ আইনবিদ ও দূরদর্শী শ্রেণির দ্বারা স্বীকৃত হয়, তবে তা হবে বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতি। আর যদি আল্লাহর

---

৮৫. ইবনে তাইমিয়া, *আস-সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যা*, পৃ. ৪-৫।

৮৬. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ১৯১।

নাযিল করা কুরআন এবং রাসুলের রেখে যাওয়া সুন্নাহ কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তবে সেটি হবে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণবাহী ধর্মীয় রাজনীতি বা খিলাফত।[৮৭]

রাজনৈতিক বিষয়ে মুসলিম লেখকদের অবদান সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার আগে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি। সেটি হলো, এ সংক্রান্ত সকল গ্রন্থে লেখকগণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের দেখানো পথ অবলম্বন করেছেন। কুরআন-সুন্নাহ থেকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিছক শাসকশ্রেণির তোষামোদ পেতে এবং তাদের প্রিয়পাত্র হতে তাদের সঙ্গে দুর্নীতি ও অবিচারের পাল্লা ভারী না করে, বরং সবসময় কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের দিকে ফিরে আসার প্রতি তাদের আহ্বান জানিয়েছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগেই প্রায় সকল মুসলিম লেখক একই পথ অনুসরণ করেছেন। তবে তাদের বর্ণনা ও উপস্থাপনভঙ্গিতে বৈচিত্র্য ছিল। পরবর্তীকালের লেখকদের লেখনীতে অনেক নতুন নতুন বিষয়ের আলোচনা ও প্রস্তাবনা ছিল।

কারণ এ সংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থ লেখার পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং খ্যাতিমান এ আইন বিশারদদের যুগে ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণের পথ সুগম করা। রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে লেখা মুসলিম লেখকদের গ্রন্থগুলোর সঙ্গে পশ্চিমা লেখকদের বইগুলোর তুলনা করলেই তাদের ও মুসলিম লেখকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপের নবজাগরণের যুগে রাজনীতি বিষয়ে লেখা নিকোলা ম্যাকিয়াভেলির[৮৮] বিখ্যাত গ্রন্থ *দা প্রিন্স* সংকলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইতালির একটি শহরের জনৈক শাসকের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা। একজন শাসক কীভাবে তার সমকক্ষদের সামলাবেন তার বিবরণ তিনি এ গ্রন্থে দিয়েছেন। তার প্রধান রাজনৈতিক দর্শন ছিল 'লক্ষ্য ভালো হলে যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে দোষ নেই'। অর্থাৎ কোনো লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে বৈধ-অবৈধ যেকোনো পন্থা অবলম্বন করা

---

৮৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০। দেখুন, যাফির কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি*, খ. ১, পৃ. ১৯১।

৮৮. নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.)। ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বাস্তববাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা বলা হয়ে থাকে। তার লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ *দা প্রিন্স*।

যেতে পারে। লক্ষ্যটা যদি ভালো হয় তবে এতে দোষের কিছু নেই। সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা, ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের আশ্রয় নেওয়ার কথা বলেছেন ম্যাকিয়াভেলি। জনসাধারণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে হুমকি-ধমকি দিয়ে জোরপূর্বক স্বার্থ হাসিলের কথাও বলেছেন তিনি। তিনি আরও বলতেন, রাজনীতিতে নীতি-নৈতিকতা ও সাধুতা বলতে কিছু নেই।[৮৯]

কোনো সন্দেহ নেই, এই গ্রন্থকার এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট[৯০] ও অ্যাডল্ফ হিটলারসহ[৯১] তার অনুসারী সকল শাসকবর্গের যে পরিমাণ মানুষের মালামাল লুণ্ঠন করা ও শাসক শ্রেণির ভোগবিলাসের উপকরণ নিশ্চিত করা উদ্দেশ্য ছিল সে পরিমাণ জনগণের মাঝে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের জন্য সকল সামাজিক উপকরণ নিশ্চিত করা উদ্দেশ্য ছিল না। সেই তুলনায় মুসলিম লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসকদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া। নানাভাবে, বিচিত্র পন্থায় আল্লাহর জমিনে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

---

৮৯. আলি ইবনে নায়েফ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া আমালিল মুসতাকবিল*, পৃ. ২৯৪।

৯০. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.)। বিখ্যাত ইউরোপীয় সেনানায়ক। মিশরের বিরুদ্ধে ফরাসি আক্রমণের নেতৃত্ব দেন তিনি। ইউরোপেও বহু যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সবগুলোতেই তিনি ছিলেন অপরাজেয়। তবে বেলজিয়ামের ওয়াটারলুতে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এরপর তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

৯১. অ্যাডল্ফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রি.)। জার্মানির বিখ্যাত রাষ্ট্রপ্রধান। তার মিত্রদের বিরুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। শেষ পর্যন্ত জার্মানির পতন ঘটে এবং তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক

ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতির ওপর। রোমান ও পারস্যসম্রাটগণ প্রজাদের সঙ্গে যেখানে বলপ্রয়োগ ও স্বেচ্ছাচারমূলক নীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন, ইসলামি সভ্যতায় মুসলিম শাসকগণ সেরকমটা কখনোই করেননি।

ইসলামি সভ্যতায় জনগণ ও শাসক সকলেই যে জীবনব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল-কুরআন ও সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণের ওপর। এ কারণেই হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল মুসলিম শাসকই শরিয়তবান্ধব সেই শাসনব্যবস্থার ওপর অটল ছিলেন। শুধু তাই নয়, উম্মাহর বিদগ্ধ আলেম ও মহাপুরুষগণ শাসক ও সর্বস্তরের কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীকে সবসময় সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

উপদেশদানের মাধ্যমে অত্যাচারী শাসককে সুপথে আনার উদ্যোগকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠ জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন,

«إِنَّ أَعْظَمَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

> অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা উচ্চারণ করা শ্রেষ্ঠ জিহাদ।[৯২]

ভুল পথে যাওয়া শাসক ও খলিফাদের ত্রুটিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার সুমহান দায়িত্ব ইসলামের সূচনাকাল থেকেই উম্মতের

---

৯২. *তিরমিযি*, কিতাবুল ফিতান, বাব : أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر, ২১৭৩, হাদিসটি হাসান। *আবু দাউদ*, ৪৩৪৪; *নাসায়ি*, ৪২০৯; *ইবনে মাজাহ*, ৪০১১; *আহমাদ*, ১৮৮৫০।

বিদগ্ধ আলেমগণ সুচারুরূপে পালন করেছেন। বরং স্বয়ং খলিফাগণই জনগণকে এ কাজে উৎসাহিত করেছেন বলে আমরা দেখতে পাই। আমিরুল মুমিনিন হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর জনগণের উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে আবু বকর রা. বলেন,

«إِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِيْ»

> আমি ভুল পথে গেলে বা ভুল সিদ্ধান্ত নিলে আপনারাই আমাকে সোজা পথে নিয়ে আসবেন।[৯৩]

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় সঙ্গীদের নিয়ে পরামর্শে বসতেন। তাদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হলে একাত্মতা পোষণ করতেন। বদর যুদ্ধে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি প্রথমে বদর কূপের সন্নিকটে একটি জায়গায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তা বিশিষ্ট সাহাবি হাব্বাব ইবনুল মুনযির রা.-এর মনঃপূত হয়নি। তিনি গিয়ে মুসলিম সেনাপতি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আল্লাহর আদেশে এ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন, এখানে কিন্তু সামনে-পেছনে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই; নাকি রণকৌশল হিসাবে এই স্থানটি পছন্দ করেছেন? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা স্রেফ রণকৌশল। এ কথা শোনার পর হাব্বাব রা. বললেন, এই জায়গায় অবস্থান করাটা আমি সমীচীন মনে করছি না। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। কুরাইশ বাহিনীর অবস্থানের সবচেয়ে নিকটবর্তী কূপ আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য কূপের প্রতিও আমরা নজর রাখব। তাহলে ফল দাঁড়াবে এই, যুদ্ধ শুরু হলে আমরা পানি পান করতে পারব আর কুরাইশরা পানির অভাবে ছটফট করবে। হাব্বাবের এই সুপরামর্শ আল্লাহর রাসুলের পছন্দ হলো। তিনি খুশি হয়ে বললেন, তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ। এরপর তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। রাতের মাঝামাঝি সময়ে শত্রুদের অবস্থানের নিকটবর্তী কূপের কাছে

---

৯৩. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৩৮।

পৌঁছে তাঁবু খাটালেন। এরপর সাহাবিগণ হাউজ বানালেন এবং পানি ভরা হলে তাতে পাত্র ফেলে রাখলেন।[১৪]

সাধারণ একজন যোদ্ধার সঙ্গে একজন সেনানায়কের কীরকম সম্পর্ক ছিল এবং রাষ্ট্রনায়ক হয়ে সাধারণ মানুষের মতামত তিনি কী পরিমাণ গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন, তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট। এই মহৎ ও অনন্য ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক আন্তরিকতা, পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ ও সুপরামর্শ বিনিময়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হাব্বাবের এই ঘটনা থেকে বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তখন আমিরুল মুমিনিন। একবার এক বেদুইন এসে উমর রা.-কে কিছু রাখালিয়া জমি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। জমিগুলো তার অনুমতি ছাড়া কেউ যেন ব্যবহার না করে সেই ফরমান আগেই দিয়ে রেখেছিলেন উমর রা.। সেই বেদুইন বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, এটি আমাদের দেশ। জাহিলিয়াত যুগে এ দেশে আমরা যুদ্ধ করেছি। ইসলাম আসার পর এ ভূমিতেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাহলে কীসের ভিত্তিতে আপনি এ ভূমি সংরক্ষণ করে রাখবেন? বেদুইনের এ কথা শুনে উমর বিরক্ত হয়ে গোঁফে ফুঁ দিতে লাগলেন আর গোঁফ পাকাতে লাগলেন। কোনোকিছু নিয়ে বিরক্ত হলে তিনি এমনটি করতেন। বেদুইন উমরের হাবভাব দেখে তার কথাগুলো পুনর্ব্যক্ত করল। এক পর্যায়ে উমর রা. বললেন, সকল সম্পদ একমাত্র আল্লাহর। সব মানুষ আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর রাস্তায় যদি আমি তা ব্যবহার না করতাম, তাহলে এক বিঘত পরিমাণ জমিও আমি রক্ষা করতে পারতাম না।[১৫]

উমর ইবনুল খাত্তাবের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাদেশিক গভর্নরগণ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও নির্লোভ প্রকৃতির। এমনও পাওয়া গেছে, জনগণ ছিল ধনী আর শাসক ছিলেন চরম দরিদ্র। এরকমই একজন শাসক ছিলেন সাইদ ইবনে আমের আল-জুমাহি। *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক* গ্রন্থে ইবনে আসাকির লেখেন, একবার সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হিমস পরিদর্শনে এসে সেখানকার দরিদ্রদের একটি তালিকা করতে বলেন আমিরুল

---

১৪. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ২৬০; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৪০২; সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ৩, পৃ. ৬২; তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৯।

১৫. ইমাম নববি, *আল-মাজমু*, খ. ১৫, পৃ. ২৩৪।

মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তালিকাটি পূর্ণ করে আমিরুল মুমিনিনের কাছে হস্তান্তর করা হলে তাতে সাইদ ইবনে আমেরের নাম দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই সাইদ ইবনে আমের? সবাই বলল, আমাদের শাসক হে আমিরুল মুমিনিন। উমর রা. আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের শাসক দরিদ্র?! সবাই বলল, জি হ্যাঁ! উমর রা. অবাক হয়ে বললেন, কী করে তোমাদের শাসক দরিদ্র হতে পারেন? তার ভাতা কোথায় যায়? তার রিযিক কোথায় ব্যয় হয়? সবাই উত্তর দিলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, তিনি নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। এ কথা শুনে উমর রা. কেঁদে উঠলেন এবং এক হাজার দিনারের থলে প্রস্তুত করে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। দূতকে বলেন, তাকে গিয়ে আমার সালাম বলো। কিন্তু সেই শাসক উমরের পাঠানো অর্থ নিজের কাছে না রেখে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেন।[৯৬]

একবার খলিফাতুল মুসলিমিন এবং তৎকালীন বিশ্বের শক্তিধর শাসক মুআবিয়া রা. ভাষণের উদ্দেশ্যে মিম্বরে দাঁড়ালেন। এমন সময় বিশিষ্ট তাবেয়ি, আল্লাহর পথের নির্ভীক কণ্ঠস্বর আবু মুসলিম আল-খাওলানি রা. খলিফার সামনে গিয়ে বলতে লাগলেন, হে মুআবিয়া, আপনি তো একদিন লাশ হয়ে কবরে চলে যাবেন। পৃথিবীতে ভালো কিছু করে গেলে সেখানে সুখ পাবেন। অন্যথায় দুনিয়ার এই চাকচিক্য ও আড়ম্বরতা একদিন আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে মুআবিয়া, এমনটি কখনো ভাববেন না যে, খিলাফত শুধু রাজস্ব ও অর্থ উসুল করা এবং তা বিতরণ করার নাম। বরং খিলাফত হলো হকের উচ্চারণ ও ইনসাফের আচরণ এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে মনোনিবেশ করার অন্যতম পথ। হে মুআবিয়া, ঝরনার উৎসমুখ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে নদনদীর জল ঘোলা হলেও আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না। সাবধান, কখনো নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের পক্ষপাতিত্ব করবেন না। তাহলে আপনার নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।' এ কথাগুলো বলে তিনি বসে পড়লেন। মুআবিয়া রা. তার এ বলিষ্ঠ সতর্কবার্তা শুনে উত্তর দিলেন, তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক হে আবু মুসলিম।[৯৭]

---

৯৬. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ২১, পৃ. ১৪৮-১৪৯।
৯৭. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ২৯৭।

ইসলামি সভ্যতায় শাসক ও জনগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সবসময় বিরাজমান ছিল। খলিফাগণ সবসময় জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। বিখ্যাত আব্বাসীয় খলিফা মুতাযিদ বিল্লাহ (মৃ. ২৮৯ হি.) রাজ্যের কৃষক শ্রেণির সঙ্গে সদয় আচরণ করতেন। তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব উসুল না করে একমাস পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ করতেন। যেন ফসল বিক্রি করে তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। যার ফলে দেখা যায়, তার আমলে কৃষকদের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।[৯৮]

এমনকি আব্বাসীয় খিলাফতের অবস্থা যখন শোচনীয়, তখনও খলিফাগণ জনগণের উন্নতি, অগ্রগতি এবং তাদের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। বিশিষ্ট আব্বাসি খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ (মৃ. ৪২২ হি.) ছিলেন একজন ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান, ত্যাগী, নিয়মিত তাহাজ্জুদগুজার এবং খুব বেশি পরিমাণ দান ও সেবার কাজে নিবেদিত একজন ব্যক্তি। ইফতারের জন্য রাজদরবারে প্রস্তুত করা খাদ্যসামগ্রীর একতৃতীয়াংশ তিনি বড় দুটি মসজিদে বিতরণ করে দিতেন। খুব কাছ থেকে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অনেক সময় তিনি রাজপোশাক ছেড়ে একেবারে সাধারণ পোশাক পরে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতেন। জনশ্রুতি আছে, হাদিসের মূলনীতি বিষয়ক একটি বইও তিনি রচনা করেন, যা প্রতি শুক্রবার আল-মাহদি মসজিদে হাদিস বিশারদদের বৈঠকে পড়া হতো। আর মানুষ তা শোনার জন্য মসজিদে চলে আসত।[৯৯]

বিপদের সময় খলিফাগণ জনগণের পাশে থাকতেন। দুঃখদুর্দশা ভাগ করে নিতেন। তাদের চাহিদা পূরণে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন। আন্দালুসের বিশিষ্ট শাসক আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের (মৃ. ২৩৮ হি.) শাসনামলে মাটি থেকে সৃষ্ট হলুদ পঙ্গপালের আবির্ভাব এবং তা ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে স্পেনে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় খলিফা রাজকর্মচারীদের সঙ্গে মিশে নিজে দরিদ্র-মিসকিনদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।[১০০]

---

৯৮. ইউসুফ আল-উশ, *তারিখু আসরিল খিলাফাতিল আব্বাসিয়া*, পৃ. ১৬৭।

৯৯. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৭, পৃ. ১৬১।

১০০. ইবনে হাইয়ান আল-কুরতুবি, *আল-মুকতাবাসু মিন আনবায়িল উন্দুলুস*, পৃ. ২২৫।

ইসলামি সভ্যতায় খলিফা ও গভর্নরদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও যথাযথ মর্যাদাদানের সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। যার ফলে আমরা দেখি, খিলাফতের দুর্বল ও অন্তিম সময়গুলোতেও গভর্নর ও খলিফাদের পারস্পরিক এই সুসম্পর্কের বন্ধন অটুট ছিল। এক উম্মত হিসেবে পৃথিবীর সকল মুসলিম এবং সকল শাসকের মাঝে অভিন্ন আত্মার সম্পর্ক বজায় ছিল। তারা সকলেই খলিফার আদেশ-নিষেধকে সম্মান করতেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো আব্বাসীয় খিলাফতের সঙ্গে বিখ্যাত সেনাপতি বীর সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সম্পর্ক। বাস্তব প্রেক্ষাপটে তখন আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ ছিল সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে। তিনি ছিলেন তৎকালীন গোটা মুসলিম জাহানের আশার আলো। এই বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সকল ক্রুসেড শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করেন। ইসলামের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি সমুন্নত করেন। এই দুঃসাহসী বীরপুরুষের অবদান মুসলিমজাতি চিরকাল স্মরণ রাখবে। তিনি একাধারে সিরিয়া, মিশর, হেজায ও ইয়ামেনকে ইসলামি শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। এরকম মহান সেনাপতি হওয়ার পরও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে আমরা দেখতে পাই, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং আব্বাসীয় খলিফার মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। অথচ তখন বাগদাদ ও আশপাশের কিছু এলাকা ছাড়া মুসলিমবিশ্বে আব্বাসীয় খলিফার আধিপত্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এরপরও সে সময় সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং আব্বাসীয় খলিফার মাঝে বিনিময় হওয়া চিঠিগুলো থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আব্বাসীয় খলিফাকেই তিনি মুসলিমদের প্রকৃত আমির বলে মানতেন। এরই ধারাবাহিকতায় আব্বাসি খলিফা আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহর[১০১] প্রতি তিনি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান। শুধু শুভেচ্ছা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, সবসময় খলিফার পরামর্শ নিয়েই তিনি কাজ করতেন। খলিফার কল্যাণে অনেক বিজয়াভিযান সম্পন্ন করেন। ইবনে কাসির তার ইতিহাসগ্রন্থে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মসুল শহর অবরোধ করার পেছনে মূলত সালাহুদ্দিন আইয়ুবির উদ্দেশ্য ছিল শহরের অধিবাসীকে খলিফার আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করা।[১০২] এমনকি খলিফা ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মাঝে

---

[১০১]. মুহাম্মাদ ইবনে তকিউদ্দিন আইয়ুবি, *মিযমারুল হাকায়িকি ওয়া সিররিল খালায়িকি*, পৃ. ৫।
[১০২]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৭।

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এ পরিমাণ উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, ৫৭০ হিজরিতে খলিফা তাকে খিলাফতের সম্মানসূচক পোশাক ও অনেক মূল্যবান বস্তু উপহার পাঠান।[১০৩]

হিজরি পঞ্চম শতকে মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের[১০৪] (Almoravid dynasty) প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ ইবনে তাশফিন প্রথমে মরক্কো, এরপর মরক্কো ও স্পেন একসঙ্গে অধিকার করেন। সেই মহান সেনাপতি নিজেকে মহামান্য আব্বাসীয় খলিফার[১০৫] একজন নগণ্য সেবক মনে করতেন। অথচ মরক্কো এবং আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের মাঝে দূরত্ব ছিল প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার। আর মরক্কো তখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিতও হচ্ছিল, কিন্তু ইউসুফ ইবনে তাশফিন চাচ্ছিলেন খিলাফতের অধীনে থাকতে। সেই লক্ষ্যে খলিফা মুস্তাযহিরের কাছে পত্রযোগে খিলাফত সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানালে খলিফা তাকে ডেকে আনেন এবং মরক্কোকে খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করে ইউসুফ ইবনে তাশফিনকে সেখানকার শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে মুরাবিতিন সাম্রাজ্যে আব্বাসীয়দের আধিপত্য বিরাজমান ছিল। আর খলিফার মর্যাদা ও আদব রক্ষার্থে ইউসুফ ইবনে তাশফিন আমিরুল মুমিনিন নয়, আমিরুল মুসলিমিন উপাধি গ্রহণ করেন।[১০৬]

২০৫ হিজরি সন থেকে তাহের ইবনে হুসাইন[১০৭] কর্তৃক খোরাসান রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করার পর অনেক শাসক ও গভর্নর

---

[১০৩]. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ১৩২।

[১০৪]. হিজরি পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে উত্তর আফ্রিকায় মালেকি সুন্নি মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি সাম্রাজ্য, বর্তমানের মরক্কো, মৌরিতানিয়া, আলজেরিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, জিব্রাল্টার, সেনেগাল, মালি ও নাইজেরিয়া এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[১০৫]. দেখুন, ইমাম গাযালির প্রতি ইমাম আবু বকর ইবনে আরাবির লেখা চিঠি। আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুল মুরাবিতিন*, পৃ. ১২৩।

[১০৬]. আবুল আব্বাস আন-নাসিরি, *আল-ইসতিকসাউ ফি আখবারিল মাগরিব*, খ. ২, পৃ. ৫৮।

[১০৭]. পুরো নাম আবুত তাইয়িব তাহের ইবনুল হুসাইন ইবনে মুসআব আল খুযায়ি (১৫৯-২০৭ হি./৭৭৫-৮২২ খ্রি.)। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট উযির ও সেনাপতি। সাহিত্য, জ্ঞান ও বীরত্বে তিনি সুনাম অর্জন করেন। আব্বাসীয় খলিফা মামুনের রাজত্ব শক্তিশালী করতে তার বিশাল ভূমিকা ছিল। খলিফা মামুন প্রথমে তাকে বাগদাদের পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেন। এরপর পর্যায়ক্রমে মসুল, আলজেরিয়া, সিরিয়া এবং মরক্কোর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। এরপর তিনি খোরাসানের শাসক হিসেবে নিযুক্ত হন। খোরাসানে জুমআর খুতবায় খলিফা মামুনের জন্য দোয়া বর্জন করেন। অবশেষে তিনি বিষাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হত্যার নেপথ্যে ছিল তারই এক দাস। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ২২১।

স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রদেশ পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ২৫৯ হিজরি পর্যন্ত তাহেরের সন্তানগণ সেই সিংহাসন ধরে রাখতে সক্ষম হন। এরপরও তাহেরি রাজবংশ খিলাফত ও তার অনুষঙ্গ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করেননি। শুধু তাহের নয়, খোরাসানে তাহেরি সাম্রাজ্যের অন্যসব শাসকও খিলাফত থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে দাবি করেননি। অপরদিকে ২৫৪ হিজরি থেকে স্বাধীনভাবে মিশর শাসনকারী মুহাম্মাদ ইবনে তুলুন এবং পরবর্তীকালে তার সন্তানগণ খিলাফত থেকে বের হননি। তেমনই ৩২৩ হিজরি সন থেকে মিশরের কর্তৃত্ব গ্রহণকারী মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ আল-ইখশিদ[১০৮], আলেপ্পোর বনু হামদের নেতাবর্গ এবং মরক্কো ও স্পেনের অন্য শাসকগণও খিলাফত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে দাবি করেননি।

এরকম অনেক স্বাধীন শাসক খিলাফত ব্যবস্থাকে অসামান্য মর্যাদার চোখে দেখতেন, এটাই চিরসত্য ও সুপ্রমাণিত। নিজ নিজ ভূখণ্ড ও প্রজাদের স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার পরও অধিকাংশ সময় আব্বাসীয় খিলাফতের ছায়াতলেই থেকেছেন তারা।

হিজরি তৃতীয় শতক থেকে শাসনব্যবস্থার নানা অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত দিক থেকেও বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন শাসকগণ নিজ নিজ ভূখণ্ডকে উন্নত ও প্রগতিশীল করার এবং ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের চাহিদা পূরণ করার প্রতি মনোযোগী হন। এমনকি তাদের অনেকে সেনাশক্তি অর্জন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে খিলাফত সাম্রাজ্যকেও ছাড়িয়ে যান। যার ফলে আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাকফি বিল্লাহ (মৃ. ৩৩৮ হি.) মিশরের গভর্নর ও স্বাধীন শাসক মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশিদের কাছে মিশর, সিরিয়া, ইয়ামেন, মক্কা ও মদিনার সঙ্গে বাগদাদকেও তার শাসনাধীন করার প্রস্তাব করেন। স্বভাবতই ইখশিদের মতো এরকম যোগ্য ও ক্ষমতাবান শাসকের হাতের ছোঁয়ায় মিশর নানাভাবে অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তিনি নিজ অধিকারভুক্ত রাজ্যগুলোতে স্বতন্ত্র ইখশিদি

---

১০৮. তার পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইবনে জুফ ইবনে খাকান আল-ফারগানি আত-তুরকি (২৬৮-৩৩৪ হি./৮৮২-৯৪৬ খ্রি.)। তিনি ইখশিদি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। দামেশকে তার ইনতেকাল হয়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৫, পৃ. ৩৬৬।

মুদ্রা প্রচলন করেন। এরকম আধুনিক মুদ্রানীতির প্রচলন সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিচারব্যবস্থা ও নেতা নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে যে উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল ইসলামি সভ্যতা, তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও ফেতনার সময় শাসক ও জনগণ সকলেই সমাধানের জন্য কাযি, বিচারক বা নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তির দ্বারস্থ হতেন, যিনি এই সংকটময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা রাখেন। এরপর তুলনামূলক অধিক যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার স্থলে ওই ব্যক্তিকে এ পদে বসাতেন। বিশেষত মুসলিম শাসনামলে স্পেনে এ রীতির প্রচলন ছিল। আবু আবদিল মালিক নামে খ্যাত ভ্যালেন্সিয়ার বিচারক ও অধিবাসী মারওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ৫৩৮ হিজরি সনের যিলহজ মাসে নিজ শহরের বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ৫৩৯ হিজরি, আবার কেউ কেউ ৫৪০ হিজরি বলেছেন। এরপর লামতুনিয়া সাম্রাজ্য পতনের সময় রমযানের শেষে কিংবা শাওয়ালের শুরুতে তিনি ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত হন। ফলে ৫৪০ হিজরি সনের সফর মাসে তার হাতে মানুষ বাইআত গ্রহণ করে। অল্প কিছুদিন শাসকের দায়িত্ব পালন করার পর তার স্থলে আরেকজনকে শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[১০৯]

আন্দালুসের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিটি পাঠকের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট যে, মুসলিম স্পেনে খণ্ডকালীন শাসক নিয়োগের প্রচলন ছিল। মানুষের কাছেও বিষয়টি গ্রহণযোগ্য ছিল। ইবনুল আব্বারের বর্ণনা করা এই আপৎকালীন নিয়োগব্যবস্থা বর্তমান কালে প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মতো। সাধারণত বর্তমান শাসক মারা যাওয়ার পর নতুন শাসক নিয়োগ করা পর্যন্ত অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা ছাড়ার পর নতুন কারও হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সংসদীয় কমিটির নিয়োগ মোতাবেক অনেকটা অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনব্যবস্থা বলা যায় এটিকে। এরকম ব্যবস্থার সর্বশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন লিপিকার আখিল ইবনে ইদরিস আল-কাইসি। আবুল কাসেম নামে খ্যাত এ শাসক ছিলেন রান্দার অধিবাসী। জ্ঞান ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। বুদ্ধিমত্তা ও

---

১০৯. অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল কারনির রাবিয়িল হিজরিয়ি*, খ. ১, পৃ. ৫৩।

ভাষাগত শাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ছিলেন দানশীল, সহানুভূতিশীল, প্রখর মেধাসম্পন্ন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তিনি রান্দার শাসনভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তার স্থলে আরেকজনকে বসানো হয়। প্রথম জীবনে তিনি বিশিষ্ট কাযি আবু জাফর ইবনে হামদাইনের কেরানি ছিলেন। শেষজীবনে তিনি কর্ডোভা ও সেভিলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।[১১০]

ইসলামি সভ্যতার পুরোটা সময়জুড়ে মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গই ছিলেন এই উম্মতের কান্ডারি, আশার আলো। মুসলিমবিশ্বের কাঁধে যখনই কোনো অবিচার, অনাচারের খড়্গ পড়েছে তখনই তারা মাথা উঁচু করে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আওয়াজ তুলেছেন। এ সম্পর্কে মিশর ও সিরিয়ার সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স এবং ইমাম নববির মধ্যে সংঘটিত ঘটনাটি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাতারদের দখলদারি থেকে মুক্ত করার কারণে দামেশকের একটি এলাকা নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেন রুকনুদ্দিন বাইবার্স। প্রকৃত হকদারদের তা থেকে বঞ্চিত করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম নববি সুলতান রুকনুদ্দিনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। একের পর এক পত্র পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত রুকনুদ্দিন তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। একটি চিঠির ভাষা ছিল এরকম :

> এ ধরনের অধিকার চাপানোর ফলে মানুষ অবর্ণনীয় যাতনা ও সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছে। অন্যায়ভাবে সেখানকার অধিবাসীদের থেকে প্রমাণপত্র চাওয়া হচ্ছে। কোনো মুসলিম জ্ঞানীর কাছেই জনগণের ওপর এ ধরনের প্রক্রিয়া আরোপ বিধিসম্মত নয়। বরং যার অধিকারে যা আছে, সে তার মালিক। এ ব্যাপারে দ্বিমত করার এবং তার ওপর প্রমাণপত্র উপস্থিত করার দায় চাপানোর কোনো অবকাশ নেই। আমরা শুনেছি, সুলতান বাইবার্স শরিয়তের ওপর আমল করতে পছন্দ করেন। সরকারি কার্যনির্বাহী ও অধীনস্থদেরও শরিয়তমতে চলার কথা বলেন। ফলে আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারেও তিনি শরিয়তসমর্থিত বিধানই মেনে নেবেন।[১১১]

---

[১১০]. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৪।

[১১১]. আবদুর রাযযাক আল-কিলানি, *মিন মাওয়াকিফি উযামায়িল মুসলিমিন*, পৃ. ২৬২।

এরকম হাজারও ঘটনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জনসাধারণ সর্বযুগেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছেন। অবাধে নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকলেই এ স্বাধীনতা সমানভাবে উপভোগ করতেন। কোনো সন্দেহ নেই, এ বিষয়গুলো ইসলামি সভ্যতার মহত্ত্ব ও বড়ত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক যত গোলযোগ

ইসলামি সভ্যতা রাজনৈতিক ফেতনা ও গোলযোগসমূহকে বিচিত্র ও অভাবনীয় পদ্ধতিতে সমাধান করেছে, ইতিপূর্বে অন্য কোনো সভ্যতার ইতিহাসে যা দেখা যায়নি। সবগুলো রাজনৈতিক দাঙ্গা ও গোলযোগকে ক্ষমতার দাপটে বা অস্ত্রের বলে প্রতিহত করেনি, বরং ফেতনাবিশেষে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলো দমন করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি ফেতনার সময় ব্যক্তিপর্যায়ে করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কেও হাদিসে নববিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি বা অন্য কেউ ফেতনার কথা আলোচনা করলেন। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ»

যখন দেখবে, মানুষের প্রতিশ্রুতিগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানতগুলো গুরুত্বহীন হয়ে গেছে এবং তারা সকলেই এরকম হয়ে গেছে (এ কথা বলার সময় তিনি হাতের আঙুলগুলো গুটিয়ে একত্র করে দেখান)। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আমি উঠে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক! তখন আমি কী করব? তিনি বললেন, বেশিরভাগ সময় ঘরে অবস্থান করবে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ

করবে। যা ভালো মনে হয়, পালন করবে। যা মন্দ, তা বর্জন করবে। কেবল নিজের বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকবে। জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ফেতনার বিষয়ে একেবারেই মনোনিবেশ করবে না।[১১২]

এই হাদিসে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ফেতনার সময় যে মুসলিম ফেতনার ব্যাপারে কিছু করার ক্ষমতা রাখে না তার ভূমিকা কী হতে পারে। তার জন্য তিনি ফেতনায় মনোনিবেশ না করে ফেতনার উত্তাপ না ছড়িয়ে নিজ ঘরে অবস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

মুসলিমবিশ্বে ঘটিত সবগুলো গোলযোগে ইসলামি সভ্যতা বাস্তবসম্মত ও কল্যাণকর পদক্ষেপ উপহার দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ প্রথম যে ফেতনার মুখোমুখি হয়, তা ছিল আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর সঙ্গে শামের গভর্নর মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মাঝে সদ্যপ্রয়াত খলিফা উসমান রা.-এর হত্যাবিচার নিয়ে সৃষ্ট ফেতনা। আমিরুল মুমিনিন হিসেবে আলি রা. চাচ্ছিলেন মুআবিয়া রা.-কে শামের গভর্নর পদ থেকে অব্যাহতি দিতে। আর মুআবিয়া রা. চাচ্ছিলেন যে করেই হোক উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। এ নিয়ে দুপক্ষের মাঝে বিরোধ চরমে পৌঁছে। ফলে সংঘটিত হয় জামাল ও সিফফিনের মতো হৃদয়বিদারক যুদ্ধ। এরপর দেখা দেয় আরেক ফেতনা যা হলো আলি রা.-এর হত্যার ঘটনা। তখন পুরো মুসলিমবিশ্বের পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত ও অস্থিরতাপূর্ণ। এরকম জটিল ও কঠিন ফেতনাটি খলিফাতুল মুসলিমিন হাসান ইবনে আলি রা.-এর হাত ধরে খুব সুন্দর ও সঠিক সমাধানের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়। নিহত হওয়ার আগে আলি রা. পুত্র হাসান ও আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীকে এই বলে ওসিয়ত করে যান, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, এরপর আমি যেন আর তোমাদেরকে মুসলিমদের রক্ত নিয়ে খেলতে না দেখি। তোমরা বলতে পারো, আমিরুল মুমিনিন নিহত হয়েছেন। আমিরুল মুমিনিন নিহত হয়েছেন। সাবধান, এর বিচারে শুধু আমার হত্যাকারী ব্যক্তিকেই যেন হত্যা করা হয়। দেখো হাসান, আমি যদি এক আঘাতে নিহত হই, তাহলে তাকেও এক আঘাতে হত্যা করো। তার

---

১১২. *আবু দাউদ*, ৪৩৪৩; *ইবনে মাজাহ*, ৩৯৫৭; *আহমাদ*, ৬৯৮৭।

লাশ বিকৃত করো না।[১১৩] পুত্রের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা ছিল স্বয়ং নিহত হওয়া আলি রা.-এর। তার মৃত্যুর সময় যেমন অগণিত মুসলিমের রক্ত ঝরেছে, তার পর যেন আর কোনো মুসলিমের রক্ত না ঝরে, সে বিষয়ে তিনি হাসান ও গোটা আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীকে ওসিয়ত করে যান। এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা থেকে কঠোরভাবে তাদের নিষেধ করেন।

আমিরুল মুমিনিন আলি রা. নিহত হওয়ার পর ৪০ হিজরি সনে গোটা উম্মাহ তার সুযোগ্য পুত্র হাসানের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। আর আমিরুল মুমিনিন হিসেবে শপথ নেওয়ার পর হাসান রা. প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে তিনি প্রতিশোধের ইচ্ছা থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। তাকে এবং তার নিহত পিতাকে বিপৎকালে ধোঁকা দেওয়া ইরাকবাসীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর শান্তিচুক্তি করার জন্য মুআবিয়া রা.-এর কাছে দূত পাঠান। শেষ পর্যন্ত সফলভাবে তাদের মাঝে সেই চুক্তি সম্পাদিত হয়। মুসলিমদের পবিত্র রক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া ফেতনার দাবানল বন্ধ করতে মুআবিয়া রা.-এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন হাসান ইবনে আলি রা.।[১১৪]

মুসলিম জনসাধারণের রক্তের সুরক্ষা ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছায় হাসান ইবনে আলি রা.-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলামি সভ্যতা একজন মুসলিমের যথাযথ মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে, যা অন্যসব সভ্যতায় বিরল। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, রোমান সম্রাটগণ দাস ও হিংস্র প্রাণীর মাঝে লড়াইয়ের আয়োজন করত। এরপর হিংস্র প্রাণী যখন ভৃত্যকে পর্যুদস্ত করে তার বুক চিড়ে খেত, সম্রাট ও রাজকর্মচারীগণ খুব আনন্দের সঙ্গে সেই দৃশ্য উপভোগ করত। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। অপরদিকে ইসলামি সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, একজন

---

[১১৩]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১৫৮।
[১১৪]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১৬৭।

মুসলিমের রক্তপাত ঘটানো আল্লাহর কাছে পবিত্র কাবাঘর ধ্বংস করা থেকেও জঘন্য হারাম।[১১৫]

ফেতনা ও রাষ্ট্রীয় গোলযোগের সময় নমনীয়তা অবলম্বনের কথা বলেছে শরিয়ত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إن أُمِّرَ عليْكم عبدٌ حبشيٌّ مجدَّعٌ فاسمعوا لَهُ وأطيعوا»

> একজন হাবশি প্রতিবন্ধীকেও যদি তোমাদের নেতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শোনো। তার আদেশ মেনে চলো।[১১৬]

সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে যিনি নেতা হবেন, তাকেই একবাক্যে মেনে নিতে হবে এবং তার আদেশ সকলকে মেনে চলতে হবে, অধিকাংশ ফকিহ এমনটিই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য, জনগণের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, মুসলিমদের ঐক্য ও ভাবমূর্তি সুরক্ষা করতে এবং সর্বোপরি ফেতনার দরজা চিরতরে বন্ধ করতে উম্মাহকে একজন শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মাঝে খিলাফত নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে তুমুল রক্তপাত ঘটে। তখন ইরাক, হেজায ও মিশর নিয়ে স্বাধীন হয়ে যান আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.। আর আবদুল মালিকের নিয়ন্ত্রণে অবশিষ্ট ছিল কেবল শাম। সে সময় বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পুত্রগণ উম্মাহকে বিভক্তকারী এই ফেতনায় অংশগ্রহণ করা থেকে মানুষকে কঠিনভাবে বারণ করেন। যতক্ষণ তারা উভয়ে বিবদমান ও বিভক্ত থাকবেন, ততক্ষণ তাদের কোনো একজনের কাছে বাইআত করা থেকে মানুষকে নিষেধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের বিজয়ের মাধ্যমে এবং অধিকাংশ জনগণ তার সমর্থক হওয়ার কারণে ফেতনার পরিসমাপ্তি ঘটে। গোটা মুসলিম জাহান

---

১১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার কাবাঘর তাওয়াফ করতে দেখি। কাবার উদ্দেশে তখন তিনি বলছিলেন, কত পবিত্র তুমি, কত পবিত্র তোমার সৌরভ! কত মহান তুমি, কত মহান তোমার গৌরব! যার হাতে আমার প্রাণ সেই প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই একজন মুমিনের মর্যাদা, সম্পদ ও রক্ত আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। মুমিনের প্রতি সবসময় সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য। দেখুন, *ইবনে মাজাহ*, ৩৯৩২; *তিরমিযি*, ২০৩২।

১১৬. *ইবনে মাজাহ*, ২৮৬১; *তিরমিযি*, ১৭০৬; *আহমাদ*, ২৭৩০১।

আবার একজন শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। অনেক বিখ্যাত ও বড় বড় সাহাবিও তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তাদের অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে তিনি চিঠি লিখে পাঠান, আমি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের রীতি অনুযায়ী আমিরুল মুমিনিন হিসেবে মেনে নিচ্ছি। আমি যথাসম্ভব তাঁর কথা শুনব, তার আদেশ মেনে চলব। আমার গোত্রের সবাই তা মেনে নিয়েছে।[১১৭]

ইসলামি শরিয়তে সবসময় যথাসম্ভব ফেতনা থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল, সংঘাত ও রক্তপাত বন্ধ করা। ঐক্য, সমতা, আল্লাহর ধর্মের প্রচার ও ইবাদতের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। ইসলামি সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য আগেও যা ছিল এখনো তা-ই আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি শরিয়তের বিধি মোতাবেক সর্বজনস্বীকৃত খলিফার বর্তমানে দ্বিতীয় কেউ খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করা শুরু করলে তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

দুজন খলিফার বাইআত গ্রহণ করা হলে তাদের মধ্যে যার বাইআত পরে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে হত্যা করো।[১১৮]

এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, একজন খলিফা নির্বাচন হওয়ার পর এবং সকলেই একবাক্যে তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়ার পর দ্বিতীয় কেউ যদি বাইআত করা শুরু করে, তাহলে সে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে বিবেচিত হবে। তাকে এবং তার অনুসারী সকলকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। হাদিসে উল্লেখিত «فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» দ্বারা প্রথমেই হত্যা করা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তবে কোনো উপায় না থাকলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে।[১১৯]

---

১১৭. *বুখারি*, কিতাবুল আহকাম, বাব : কাইফা ইয়ুবায়িয়ুল ইমামুন নাসা, ৬৭৭৭।
১১৮. *মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, বাব : ইযা বুইয়া লি-খালিফাতাইন, ১৮৫৩।
১১৯. ইবনুল জাওযি, *কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সাহিহাইন*, খ. ১, পৃ. ৭৯৫।

ইসলামি সভ্যতা সবসময় মুসলিমদের ঐক্যকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। উদ্দেশ্য যদি হয় মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা, তাহলে বিজয়ী ব্যক্তিকেই নেতা হিসেবে মেনে নিতে হবে।[১২০] এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ইউসুফ ইবনে তাশফিন। স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করত স্থানীয় গোত্রীয় রাজা-মহারাজাগণ। সবসময় তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে থাকত। এক অঞ্চলের সাথে যুদ্ধের জন্য অন্য অঞ্চলের রাজাদের সহায়তা নিত। এরপর স্পেনে ইসলামের শত্রুদের নির্মূল করার পর এবং ৪৭৯ হিজরি সনে ঐতিহাসিক যাল্লাকা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর ইউসুফ ইবনে তাশফিন এসব বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। সেনাপতিদের নির্দেশ দেন এসব অঞ্চলে অভিযান চালাতে। তার এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেন তৎকালীন বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট সব ওলামায়ে কেরাম। তাদের একজন হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি রহ.। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইসলামি সভ্যতার দর্শন কী হতে পারে তা স্পষ্ট করেন বিখ্যাত এই মুসলিম মনীষী। তিনি বলেন, নেতৃত্ব ও বিজয়ের এই নিশানকে উঁচু করার জন্য ইউসুফ ইবনে তাশফিনের এই পদক্ষেপটি যথার্থ ছিল। মুসলিম অঞ্চল পুনরুদ্ধারে নামা প্রতিটি সেনাপতির কর্তব্যও তাই। এমনকি শাসকের পক্ষ থেকে তিনি স্পষ্ট কোনো নির্দেশ না পেলেও, অথবা কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে তার কাছে শাসকের বার্তা পৌঁছতে দেরি হলেও।[১২১]

ইসলামি সভ্যতা ফেতনা ও গোলযোগ নির্মূলে কার্যকর সমাধান দেখিয়েছে এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, যা অন্য কোনো সভ্যতা পারেনি। ইসলামি স্কলারগণও সবসময় উম্মাহর একতা রক্ষার স্বার্থে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও বিজয়ী খলিফার নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। এসবের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো উম্মাহকে একই পতাকাতলে সমবেত করা, উম্মাহর ঐক্য ও অভিন্নতা রক্ষা করা। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুসলিমদের হেফাজত করা। অন্যসব ধর্ম ও সভ্যতার সামনে ইসলামি সভ্যতার মর্যাদা ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা।

---

[১২০]. মুহাম্মাদ রশিদ রেজা, *আল-খিলাফা*, পৃ. ৪৪।

[১২১]. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুল মুরাবিতিন*, পৃ. ১২৩।

নবম অনুচ্ছেদ

শুরা (পরামর্শসভা)

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি সংগঠনের অবদানের কথা আলোচনা করতে গেলে এর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যগুলো আগে তুলে ধরতে হবে। জেনে রাখা দরকার, জনহিতকর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গটি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে ইসলাম। আর তা হলো শুরা (شورى) পদ্ধতি। মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে শুরা বা পরামর্শের গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে কুরআনুল কারিমের একটি পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম দেওয়া হয়েছে الشورى বলে।

শুরা পদ্ধতি কীভাবে এবং কতটুকু বাস্তবায়ন করতে হবে এ বিষয়ে ইসলামি আইনবিদগণ যদিও নানা মত প্রদান করেছেন, তবে মুসলিমদের মাঝে শুরা-রীতি প্রচলিত থাকা আবশ্যক, এ নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই।[১২২] কারণ মহান আল্লাহর নির্দেশ,

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।[১২৩]

শুরা হলো জনপ্রতিনিধি বা স্থলবর্তী নির্বাচনে অথবা জনগণের সার্বিক কল্যাণের ইস্যুতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা।[১২৪]

---

১২২. কুরতুবি, *আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ২৪৮-২৫২; ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ২, পৃ. ১৫০; কাসানি, *বাদায়িয়ুস সানায়ি*, খ. ৭, পৃ. ১২; কারাফি, *আয-যাখিরাহ*, খ. ১০, পৃ. ৭৫-৭৬; ইমাম শাফিয়ি, *আল-উম্ম*, খ. ৫, পৃ. ১৬৮; ইবনে কুদামা, *আশ-শারহুল কাবির*, খ. ১১, পৃ. ৩৯৯।

১২৩. সুরা আলে-ইমরান : ১৫৯।

১২৪. জাফর ইবনে আবদুস সালাম, *নিযামুদ দাওলাতি ফিল-ইসলামি ওয়া আলাকাতুহা বিদ-দুয়ালিল উখরা*, পৃ. ১৯৯।

এ আয়াতের ওপর ভিত্তি করে মুসলিমগণ 'শুরা পদ্ধতিকে' শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে যার মাঝে যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি লক্ষ করেন, তাকে নেতা হিসেবে প্রস্তাব করেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় লিখিতভাবে কাউকে প্রতিনিধি বা শাসক হিসেবে নির্বাচন করে যাননি, বরং বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে গেছেন শুরা পদ্ধতির ওপর। এ থেকেই শুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুভব করা যায়। আবু ওয়ায়েল রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার আলি ইবনে আবু তালিব রা.-কে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি আমাদের ওপর আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাবেন না? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল মৃত্যুর সময় কাউকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাননি, তাহলে আমি কীভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাব! তবে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ মঙ্গলের ইচ্ছা করলে অবশ্যই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাদের জন্য শাসক হিসেবে নির্বাচন করে দেবেন। ঠিক যেমন নবীর মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মুসলিমদের শাসক করে দিয়েছিলেন।[১২৫]

এ থেকেই ইসলামের রাজনৈতিক অবকাঠামোতে শুরাব্যবস্থা একটি মৌলিক অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়, বরং মুসলিমদের প্রতিটি কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে এ পরামর্শব্যবস্থা। এ মহান ব্যবস্থা প্রণয়ন করে অধুনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অনেক আগেই ছাপিয়ে গেছে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। শাসক নির্বাচনে জনগণের ভোট লাগবে, রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত লাগবে, এ প্রক্রিয়ার গণতন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে মাত্র কয়েক শতাব্দী হলো, কিন্তু সেই চৌদ্দ শতাব্দী আগেই ইসলাম এর থেকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীর সামনে এক আদর্শ ও সফল জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এখান থেকেই ইসলামে জনগণের মতামত ও চাহিদার মূল্য এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়।[১২৬]

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, কাদের নিয়ে এই শুরা বোর্ড গঠিত হবে? কারা করবে শাসক নির্বাচন? এ ব্যাপারে মুসলিম আইনবিদ ও ইতিহাসবিদগণ

---

১২৫. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা রা., বাব : আবু বকর সিদ্দিক রা., হাদিস নং ৪৪৬৩।

১২৬. ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৪-২৫।

যাদের কথা বলেছেন তারা কারা? কী তাদের পরিচয়? কারা আহলুল হাল্লি ওয়াল-আকদি?

মুসলিমদের নিয়ে একটি শুরা বোর্ড গঠিত হবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে আইনবিদগণ শুরা বোর্ডে সদস্যদের মধ্যে কিছু শর্ত পরিপূর্ণভাবে থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। শর্তগুলো হলো : পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা, যথেষ্ট জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এক কথায় বলা যায়, এ বোর্ডের সদস্যরা হবেন আলেম (জ্ঞানী), যোগ্য, নেতৃস্থানীয় এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।[১২৭]

শাসক ও বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারীদের জন্য শুরা পদ্ধতি অবলম্বন করাকে ফরয করেছে ইসলাম। আমরা বলতে পারি, শুরাব্যবস্থা মুসলিমদের আত্মস্থ করা এক সুমহান নির্বাচন পদ্ধতি, যা মুসলিম সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে প্রচলিত ছিল। বরং অন্যরাও এর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কারণ শুরাব্যবস্থা মূলত মানুষের মাঝে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন। কেননা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أُمَّتِيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ»

> আমার উম্মত কখনো কোনো ভুল সিদ্ধান্তের ওপর একতাবদ্ধ হবে না।[১২৮]

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। সেটা হলো, ইসলামি রাষ্ট্রে একজন খলিফা কখনো অধিকর্তা বা স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। সকল বিষয়ে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখেন না। নতুন কোনো শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের অধিকার রাখেন না। বরং শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের ওপর। তবে নতুন কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা না থাকলে তখন শাসক সমাজের শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ লোকদের ইজতিহাদ ও মতামতের

---

১২৭. ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ*, খ. ১২, পৃ. ৭৭।

১২৮. *ইবনে মাজাহ*, কিতাবুল ফিতান, বাব : আস-সাওয়াদুল আযম, ৩৫৯০; *তিরমিযি*, ২১৬৭; *আবু দাউদ*, ৪২৫৩; *আহমাদ*, ২৭২৬৭।

ভিত্তিতে এর ফয়সালা করবেন।[১২৯] আর শাসক বা খলিফা নির্বাচন করবেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দ।

বর্তমান পৃথিবীতে শাসক বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যতগুলো পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সকল পদ্ধতির চেয়ে মহান ও সুন্দর পদ্ধতি হলো ইসলামের এই শুরাব্যবস্থা, যার বাস্তব উদাহরণ আমরা খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে দেখতে পাই। যেমন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে যখন ছুরিকাঘাত করা হয়, তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, সাহাবিগণ তার কাছে পরবর্তী শাসক হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ছয়জন সাহাবির সমন্বয়ে একটি শুরা কমিটি গঠন করে দিলেন। এই ছয়জনের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকল মুসলিম ছিলেন একমত। এখান থেকেই উমর রা. শুরা পদ্ধতির প্রচলন করেন। তিনি ঘোষণা করেন,

> তোমরা এই ছয় সদস্যের ওপর আস্থা রাখো। এই ছয়জনের জন্য আল্লাহর রাসুল জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আর সাইদ ইবনে যায়দ রা.-ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন। তবে আমি তাকে এই শুরা বোর্ডে রাখছি না। সদস্য ছয়জন হলো : আবদে মানাফ বংশের আলি রা. ও উসমান রা.। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. (আল্লাহর রাসুলের মামা) ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.। আল্লাহর রাসুলের বিশিষ্ট সঙ্গী ও ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.। এই ছয়জন মিলে পরামর্শের ভিত্তিতে একজনকে শাসক হিসেবে নির্বাচন করবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তোমরা নবনির্বাচিত শাসককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে। যথাযথভাবে কর্তব্য পালনে তাকে সহায়তা করবে। তোমাদের কাউকে সে কোনো দায়িত্ব দিলে সুষ্ঠুভাবে সেই দায়িত্ব পালনের প্রয়াস করবে।[১৩০]

এরপর উমর রা. ইনতেকাল করেন। তার কাফন-দাফন সম্পন্ন করে ছয় সদস্যের শুরা বোর্ড বৈঠকে বসেন। তিন দিন পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের পর সুষ্ঠুভাবে শুরা কার্যক্রম শেষ হয়। উসমান ইবনে আফফান রা.-কে

---

১২৯. আবদুর রাযযাক সানহুরি, *ফিকহুল খিলাফা*, পৃ. ১২২-১২৩।

১৩০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ২৯৩।

পরবর্তী শাসক হিসেবে নির্বাচনের ব্যাপারে সকলেই একমত হন। পাঠক! জেনে আশ্চর্য হবেন যে উসমান রা.-এর হাতে প্রথম বাইআত গ্রহণকারী হলেন এ নির্বাচনে তার নিকটতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আলি ইবনে আবু তালিব রা.। ইসলামি শুরাব্যবস্থা যে সবচেয়ে উন্নত নির্বাচনব্যবস্থা তার অন্যতম প্রমাণ হলো উল্লিখিত ঘটনা। কারণ, শুরাব্যবস্থার মূলকথাই হলো নেতা নির্বাচনে জনগণের স্বাধীন মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। মদিনাবাসী উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিয়োগ করা এই ছয় সদস্যের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখেন। এ নির্বাচনব্যবস্থা উমরের পক্ষ থেকে জাতির ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া কোনো প্রক্রিয়া ছিল না। এরপর ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবিও উসমান ইবনে আফফান রা.-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্তে পৌঁছান। জাতির কল্যাণার্থে তাদেরই একজনকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করার ব্যাপারে তারা একমত হন। আর উসমান রা.-কে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে তারা শুধু নিজেদের ঐকমত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এমনটি নয়, বরং এ ব্যাপারে তারা মদিনায় বসবাস করা প্রত্যেক বিচারক, সেনাপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামতও গ্রহণ করেছিলেন।[১৩১] এ কারণেই আনসার ও মুহাজির নির্বিশেষে পুরো জাতি উসমান রা.-কে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে নিঃসংকোচে মেনে নেন এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ইসলামি শুরাব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে সাংঘর্ষিক। কেননা গণতন্ত্রের মূলকথা হলো জনগনের জন্য জনগনের শাসন (For the people by the people)। অর্থাৎ জাতিই নির্ধারণ করবে জাতির শাসননীতি, সংবিধান। আর সেই শাসননীতির আদলেই পরিচালিত হবে শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও তা বিধিবদ্ধ করার ক্ষমতা জনগণের ওপর ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রব্যাপী মতামত বা ভোটগ্রহণের মাধ্যমে কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয় যাদের হাতে থাকে ক্ষমতা ব্যবহারের অবাধ অধিকার। সবকিছু তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন। রাষ্ট্রীয় কোনো আইন মুছে ফেলা বা যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এই জনপ্রতিনিধিবৃন্দ। যেকোনো উর্ধ্বতন সরকারি

---

১৩১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪২২।

দায়িত্বশীলকে বরখাস্ত করার, কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এমনকি প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত জবাবদিহির সম্মুখীন করার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ইসলামি শুরাব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। শুরাব্যবস্থা এক সুমহান সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার সারমর্ম হলো, শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত বিধান অনুযায়ী, যা ওহির মাধ্যমে তিনি তাঁর রাসুলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। যা মেনে চলা ঈমানের অন্যতম মৌলিক দাবি। এই প্রক্রিয়ার নির্বাচক হবেন কেবল ইসলামি স্কলারগণ (বিজ্ঞ আলেম সম্প্রদায়)। তাদের নেতৃত্বেই গঠিত হবে শুরা বোর্ড। আল্লাহর প্রণীত কোনো বিধান পরিবর্তনের অধিকার কোনো আলেমের নেই। শুরা বোর্ডের একমাত্র কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। রাসুলের রাজনৈতিক জীবনকে সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করা খুব সহজ। যেমন, কোনো দল পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে একটি আইন প্রণয়ন করল। পরবর্তী সময় নতুন কোনো দল ক্ষমতায় বসে সেই আইনকে পুরোপুরি বিলুপ্ত ঘোষণা করে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী আইন পাস করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিলো। অপরদিকে শুরাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য আল্লাহর। আল্লাহর প্রণীত বিধানের ওপর চলবে মানুষের সকল আচার-অনুষ্ঠান। সকল নিয়মের ওপর প্রাধান্য পাবে আল্লাহর বিধান। শুরাব্যবস্থা শুধু এই সুমহান দায়িত্বটুকু এমন সব উপযুক্ত ব্যক্তির কাঁধে তুলে দেবে, যারা আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে জীবনযাপন করেন। নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহকে ভয় করেন।[১৩২]

আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, ইসলামি শাসনব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে এমন এক যুগে, যখন পারস্য, রোম, হিন্দুস্তান ও চীনসহ পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত ছিল চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও একনায়কতন্ত্র। এই শুরা পদ্ধতির সঙ্গে মানুষ পরিচিত ছিল না। এমনকি পৃথিবীতে গণতন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে ইসলাম আগমনের প্রায় বারোশ বছর পর ফ্রান্সে রাজতন্ত্র বিলুপ্তির পরবর্তী সময়ে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, শুরাব্যবস্থা ছিল

১৩২. আহমাদ আহমাদ গুলুশ, *আন-নিযামুস সিয়াসি ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৬১-৬৪।

বিশ্বমানবতার কল্যাণে মুসলিমদের রেখে যাওয়া অসামান্য অবদানগুলোর একটি।

যাই হোক, ইসলামি সভ্যতার সবগুলো অবদানের আলোচনা ও পূর্ণ বিশ্লেষণ এই ছোট্ট পরিসরে করা সম্ভব নয়। যেগুলো উল্লেখ করলাম, বিশ্বমানবতার কল্যাণে মুসলিমজাতির অসামান্য অবদানগুলো বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণালয়

وَزَارَةٌ (ওয়ারাহ–মন্ত্রণালয়) একটি মৌলিক আরবি শব্দ। এটি وَزَرَ ও آزَرَ থেকে এসেছে। *লিসানুল আরব* গ্রন্থে ইবনে মানযুর রহ. বলেন, উযির হলেন শাসকের সঙ্গী ও বিশেষ সহচর, তার কাজ হলো শাসকের জটিল ও কঠিন কাজগুলো সমাধা করা। সুপরামর্শ দিয়ে তাকে সহযোগিতা করা।[১৩৩]

اَلْوَزَارَةُ শব্দের উৎস নিয়ে তিন রকম মত পাওয়া যায়।

এক. এটি اَلْوِزْرُ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ভার, ওজন। শাসকের কার্যভার বহন করেন বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে উযির (মন্ত্রী)।

দুই. কেউ কেউ বলেন এটি الوَزَر শব্দ থেকে বেরিয়েছে, যার অর্থ আশ্রয়কেন্দ্র। কুরআনুল কারিমে জাহান্নামিদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾

না, কোথাও আশ্রয়ের জায়গা নেই।[১৩৪]

কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় শাসক মতামত গ্রহণের জন্য উযিরের আশ্রয় নিয়ে থাকেন বলে তাকে উযির বলা হয়। আবার,

তিন. কেউ বলেন এটি الأَزْر থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ পিঠ বা মেরুদণ্ড। দেহের জন্য পিঠ ও মেরুদণ্ডের ভূমিকা যেমন, একজন শাসকের জন্য উযিরের ভূমিকাও তেমন। সে হিসেবে

---

১৩৩. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, وزر মূল ধাতু, খ. ৫, পৃ. ২৮২।

১৩৪. সুরা কিয়ামা : ১১।

তাকে উযির বলা হয়।(১৩৫) কুরআনুল কারিমে নবী মুসা আ.-এর বিবরণ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ এ শব্দটি ব্যবহার করেন,

﴿وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾

(মুসা আ. আল্লাহর কাছে দোয়া করতে গিয়ে বলেন,) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী দিন। আমার ভাই হারুনের মাধ্যমে আমার কোমর (শক্তি) আরও মজবুত করে দিন। তাকে আমার কাজে অংশীদার করে দিন।(১৩৬)

আল-কুরআনের আরেকটি জায়গায় আমরা এ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই,

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾

আমি তো মুসাকে দিয়েছি কিতাব এবং তার ভাই হারুনকে বানিয়েছি তার একান্ত সহযোগী। এরপর আমি বলেছি, তোমরা ওই জাতির কাছে যাও যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এরপর আমি তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি।(১৩৭)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় রাষ্ট্রীয় ও জনকল্যাণকর কোনো কাজ করার আগে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা নিতেন আবু বকর রা. এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে। আবু সাইদ খুদরি রা. বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

১৩৫. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২৪।
১৩৬. সুরা তহা : ২৯-৩৩।
১৩৭. সুরা ফুরকান : ৩৫-৩৬।

আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে আমার উযির দুজন: জিবরাইল ও মিকাইল। আর জমিনবাসীর মাঝেও আমার দুজন উযির আছে: আবু বকর ও উমর।[১৩৮]

বনি সায়িদার আশ্রয়কেন্দ্রে আনসারদের উদ্দেশে আবু বকর রা. বলেছিলেন,

«نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ»

আমরা (মুহাজির) হলাম শাসকশ্রেণি আর আপনারা হলেন (আনসার) উযিরশ্রেণি।[১৩৯]

এই হাদিসের মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝা যায়, উযির শব্দ বলে সহযোগী অর্থ নেওয়া হয়েছে, শাসনভার গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন উযির জাতীয় শব্দের প্রচলন ঘটেছে আব্বাসীয় শাসন থেকে, এর আগে এ ধরনের পরিভাষা ও শব্দ অপরিচিত ছিল, তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য এ হাদিসটিই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।[১৪০]

ইসলামি সভ্যতায় ওযারাত বা মন্ত্রণালয়ের সীমাহীন গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে একে আমরা স্বতন্ত্র দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছি, তা হলো :

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয়ের মহত্ত্ব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

---

১৩৮. *তিরমিযি*, কিতাবুল মানাকিব, বাব : ফি মানাকিবি আবি বকর রা. ওয়া উমর রা., হাদিস নং ৩৬৮০। এই হাদিসটিকে তিনি হাসান গরিব বলেছেন। *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৩০৪৬; তিনি এই হাদিসটিকে সহিহুল ইসনাদ বলেছেন, তবে তাখরিজ করেননি। ইমাম যাহাবিও তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

১৩৯. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৪৩।

১৪০. আবদুল আযিয আদ-দুরি, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৪।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয়ের মহত্ত্ব

অনেক মুসলিম মনীষী ও ইতিহাসবিদ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে কথা বলেছেন। মাওয়ারদি বলেন, জনগণের সকল ইস্যু নিয়ে কাজ করা এবং সকল-কিছু সমাধা করা, এ জাতীয় কাজগুলো একা শাসকের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সেজন্য তার দরকার হয় সহযোগী ও সুপরামর্শদাতার। একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে বরং বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের মতামতের ভিত্তিতে কোনো কাজ সমাধা করলে তা সঠিক ও যথাযথ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। পদস্খলন বা ত্রুটিবিচ্যুতির আশঙ্কা অনেকাংশেই কমে যায়। অন্যের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করলে কাজে সফলতার নিশ্চয়তাও বেড়ে যায়।[১৪১] গুরুত্বপূর্ণ এ মন্ত্রণালয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনে খালদুন রহ. বলেন, মন্ত্রণালয় হলো রাজসভার প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগকারী পরিষদ। কারণ মন্ত্রণালয়ের আরবি وزارة (বিযারা) শব্দের মূল অর্থেই লুকিয়ে আছে সহযোগিতার মর্মকথা।[১৪২]

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর শাসনামলে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ছিলেন রাজ্যের প্রধান উপদেষ্টার ভূমিকায়। সকল কাজে তিনি খলিফা আবু বকর রা.-কে সহযোগিতা করতেন। সুপরামর্শ দিতেন। ওহির সম্মানিত লেখক সাহাবিদের কাছে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা কুরআনের সুরা ও আয়াতগুলো একত্র করার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শটিও উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর দেওয়া। কারণ ঐতিহাসিক ইয়ামামার যুদ্ধে অধিকাংশ হাফেয ও কারি[১৪৩] শহিদ হয়ে যাওয়ায় খলিফা আবু বকর রা.-এর কাছে তিনি কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। পবিত্র

---

১৪১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৩২।

১৪২. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২৩৬।

১৪৩. তারা শুধু কারি ও হাফেযই ছিলেন না, বরং উঁচুমানের আলেমও ছিলেন।-সম্পাদক।

কুরআন একত্র করার কাজে প্রধান ভূমিকা পালনকারী যায়দ ইবনে সাবিত রা.-এর বিবৃতিতে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উঠে এসেছে : ইয়ামামার যুদ্ধের পর আমিরুল মুমিনিন আবু বকর রা. আমাকে ডেকে পাঠান। গিয়ে দেখি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার কাছে উপস্থিত। আবু বকর রা. আমাকে বললেন, উমর আমার কাছে এসে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কুরআনের কারি ও হাফেয শহিদ হয়েছেন। আমার আশঙ্কা, এভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে কুরআনের কারিগণ শহিদ হয়ে গেলে কুরআনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আমার পরামর্শ, আপনি কুরআন একত্র করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এ কথা শুনে আমি উমর রা.-কে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে যাননি তা আপনি কীভাবে করবেন? তা শুনে উমর রা. বললেন, আল্লাহর শপথ, এ উদ্যোগের ফলে অনেক কল্যাণ সাধন হবে। এরপর উমর বারবার আমার কাছে বিষয়টি উত্থাপন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন। আমিও উমরের মতো বিষয়টি ভাবতে লাগলাম। যায়দ রা. বলেন, এরপর আবু বকর রা. আমাকে বললেন, আপনি একজন বিবেকবান যুবক পুরুষ, আপনার প্রতি আমরা পূর্ণ আস্থাশীল। এমনকি আপনি ছিলেন আল্লাহর রাসুলের ওপর অবতীর্ণ ওহির অন্যতম লেখক। তাই আমার সিদ্ধান্ত, আপনি কুরআনের অংশগুলো খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করে সবগুলো একত্র করুন।[১৪৪]

এ থেকেই বোঝা যায়, মন্ত্রিত্বের বিষয়টি আব্বাসীয় শাসনামলের আবিষ্কার বা ইসলামধর্মে পারসিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ নয়, বরং বিশ্বনবীর জীবনী ও তার বক্তব্যসমগ্র থেকে এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের দিকে তাকালেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, মন্ত্রিত্বের বিষয়টি ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত একটি বিষয়।

তবে যাই হোক, উমাইয়া শাসনামলে মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রিত্বের পদগুলোতে অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। রাজ্য সম্প্রসারণ, মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন ঐতিহ্য ও সভ্যতা নিয়ন্ত্রণে আবশ্যকভাবে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুপরামর্শ দরকার হতো খলিফাদের। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা লক্ষ করি, বিখ্যাত খলিফা মুআবিয়া ইবনে আবি

---

১৪৪. *বুখারি*, কিতাব : ফাজায়িলুল কুরআন, বাব : জামউল কুরআন, ৪৭০১।

সুফিয়ান রা. উযির (মন্ত্রী) হিসেবে নিয়োগ করেন আরেক বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস রা.-কে। যদিও তখন মন্ত্রিত্ব শব্দটি ব্যবহৃত হতো না। একবার আমর ইবনুল আস রা. মুআবিয়া রা.-এর উদ্দেশে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি কি আপনাকে সুপরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করি না? উত্তরে মুআবিয়া রা. বলেন, এর ফলেই তো আজ আমি যা অর্জন করার, তা অর্জন করতে পেরেছি।[১৪৫]

উযির শব্দের সরাসরি প্রচলন উমাইয়া শাসনামলে যে প্রচলিত ছিল এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ তাবারি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের (মৃ. ১২৫ হি.) শাসনামলে একবার মিশরের অধিবাসীগণ তাদের দেশে নিযুক্ত গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে রাজদরবারে উপস্থিত হলো। অনেক চেষ্টা করেও তারা খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারল না। দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করে যখন তাদের আসবাব ও রসদ শেষ হয়ে এলো, তখন কয়েকটি ছোট্ট কাগজে তাদের নামগুলো লিখে উযিরদের (মন্ত্রীদের) কাছে দিয়ে বলল, এগুলো আমাদের নাম ও বংশপরিচয়। নামগুলো পড়ে আমিরুল মুমিনিন যদি আমাদের খোঁজ করেন তাহলে আমাদের খবর দেবেন।[১৪৬] উপরের ঘটনাতে বিবৃত উযিরগণ (মন্ত্রিগণ) খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের নিকটস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং রাজ্যের কার্যনির্বাহী শ্রেণি ছিল এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বরং তাবারির বর্ণিত ৮৫ হিজরি সনের ঘটনাসমগ্রে আমরা পরিষ্কার জানতে পারি যে, সে সময় কাবিসা ইবনে যুআইবের ভূমিকা ছিল আমাদের বর্তমান সময়ের সরকারি মন্ত্রীদের মতো। যার ফলে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বলতেন, দিন হোক, রাত হোক কাবিসা যেন কখনো আমার চোখের আড়াল না হয়। আমি নির্জনে থাকি, কারও সাথে নীরবে সংলাপ করি, বা স্ত্রীদের সঙ্গে থাকি, সবসময় যেন তাকে আমার কাছে আসার সুযোগ দেওয়া হয়। কাবিসা কোথায় আছে সে খবর যেন সবসময় আমার কাছে সরবরাহ করা হয়। রাষ্ট্রীয় সিলমোহর ও মুদ্রা তৈরির নকশা তার কাছেই থাকত। খলিফার পক্ষ থেকে সবসময় তার

---

[১৪৫]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ২৪৭।
[১৪৬]. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৩।

কাছে সংবাদ আসত। খলিফার আগে তিনিই চিঠিপত্র পড়ে নিতেন। খলিফা আবুদল মালিকের কাছে তিনিই পত্র খুলে নিয়ে আসতেন।[১৪৭]

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে পরিষ্কার, উমাইয়া শাসনামলে মন্ত্রিত্বের প্রচলন ছিল। সে যুগে মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব ছিল কেবল খলিফাকে পরামর্শ দেওয়া। তখন মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রীয়ভাবে সরাসরি ক্ষমতা বাস্তবায়নের অধিকার রাখতেন না। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ছিল, যেমনটি উমাইয়া শাসনামলের সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের উযির (মন্ত্রী) বিখ্যাত লেখক আবদুল হামিদের বেলায় আমরা দেখতে পাই।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আব্বাসি শাসনামলে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। আব্বাসি খিলাফতে উযির নিয়োগের ব্যাপারটি ছিল খুব জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আবু সালাম আল-খাল্লাল নামে খ্যাত হাফস ইবনে সুলাইমানকে (মৃ. ১৩২ হি./৭৫০ খ্রি.) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম উযির (মন্ত্রী) উপাধি পাওয়া ব্যক্তি ধরা হয়। 'মুহাম্মাদ বংশের উযির (মন্ত্রী)' বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচারে তিনি বিপুল অর্থ খরচ করেন।[১৪৮]

আবু জাফর আল-মনসুর ছিলেন আব্বাসীয় শাসনামলের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি আবু আইয়ুব আল-মুরিয়ানি নামে খ্যাত সুলাইমান ইবনে মুখাল্লাদকে সরকারি দফতর সংরক্ষণের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইবনে কাসির রহ. তার ব্যাপারে লেখেন, তিনি ছিলেন রচনা ও প্রকাশনা বিভাগের প্রধান।[১৪৯]

আব্বাসীয় শাসনামলে উযিরের (মন্ত্রীর) ক্ষমতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এমনকি রাজ্যের ও জনগণের সকল বিষয় তদারকির একমাত্র দায়িত্ব বর্তায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে। বারমাকি পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে এমনটিই আমরা লক্ষ করি। যেমন ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ আল-বারমাকিকে রাজ্যের যেকোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অবাধ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ফলে রাজ্যের সকল-কিছুতে আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব তার হাতে চলে যায়। ইবনে কাসির রহ. উল্লেখ করেন, হারুনুর রশিদ

---

১৪৭. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭।

১৪৮. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ২৬৩।

১৪৯. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১১০।

খলিফা হওয়ার পর ইয়াহইয়া ইবনে খালেদের অধিকারকে তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নেন। তাকে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সব পদের দায়িত্ব প্রদান করেন। বারমাকিগণ যতদিন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, ততদিন তাদের এই ক্ষমতা ও অধিকার বলবৎ ছিল।[১৫০]

আব্বাসীয় খলিফাগণ সবসময় শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতাসম্পন্ন উযিরদের সন্ধানে থাকতেন। এমনকি বিখ্যাত আব্বাসি শাসক মামুনুর রশিদ উযির পদে নিয়োগের জন্য কিছু শর্ত ও মানদণ্ড আরোপ করেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি আমার রাজ্যের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনার জন্য এমন একজন লোকের সন্ধান করছি যিনি হবেন সকল উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী। যিনি হবেন একাধারে সচ্চরিত্র। নিজের দায়িত্ব পালনে অটল ও নিষ্ঠাবান। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতায় যিনি সমৃদ্ধ। তার কাছে গোপনীয় কিছু বলা হলে তিনি তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলে আন্তরিকভাবে তা পালন করবেন। তিনি নীরব থাকবেন বিচক্ষণতার সাথে। কথা বলবেন প্রজ্ঞার সাথে। সুযোগকে কাজে লাগাবেন। শত্রুদের রক্তচক্ষুর প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তার মাঝে থাকবে আমিরদের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তিদের শিষ্টাচার। বিদগ্ধ লোকদের বিনম্র স্বভাব। তার থাকবে বিশেষজ্ঞদের মতো বিবেক। তার প্রতি সদাচরণ করা হলে তিনি কৃতজ্ঞ হবেন। দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলে তিনি ধৈর্যের পথ বেছে নেবেন। আজকের সামান্য কিছুর বিনিময়ে আগামীর অপার সম্ভাবনাকে তিনি বেচে দেবেন না। ভাষার মাধুর্য ও কথার জাদু দিয়ে তিনি মানুষের অন্তর জয় করে নেবেন।[১৫১]

উপর্যুক্ত গুণাবলির বিচারে ফযল ইবনে সাহলকে (মৃ. ২০২ হি.) খলিফা মামুন উযির (মন্ত্রী) হিসেবে নিয়োগ দেন। ইসলামের ইতিহাসে ফযল ছিলেন বিখ্যাত ও মহান উযিরদের একজন। তার মর্যাদা ও বিচারবুদ্ধি দেখে রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ের ভার তার ওপর ন্যস্ত করে তার নাম দেন ذو الرياستين বা দুই ক্ষমতার অধিকারী।[১৫২] কারণ লেখালেখি ও রচনা

১৫০. প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২০৪।
১৫১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৩০-৩১।
১৫২. খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১৪, পৃ. ২২৯।

বিভাগের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধবিষয়ক অধিদপ্তরের দায়িত্বও ছিল তার কাঁধে। রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা উভয় বিষয়ের সকল ইস্যু দেখাশোনা ও পরিচালনা করতেন তিনি। এমন যুগপৎ গুণাবলি তার আগে কোনো মন্ত্রীর ছিল না। ঠিক তেমনই মন্ত্রণালয়ের এই মহান দায়িত্ব লিখিতভাবে বিশেষ সম্মাননার সঙ্গে তাকে প্রদান করা হয়। এটি ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদত্ত এক বিরল সম্মাননা। এটি সুস্পষ্ট হয় পত্রের বিবরণ থেকে। খলিফা মামুনুর রশিদের পক্ষ থেকে প্রদেয় সেই লিখিত পত্রের বিবরণে ছিল : আমি আপনাকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিচ্ছি, যে পদের অধিকারী ব্যক্তি কাউকে কোনো আদেশ করলে অবশ্যই তাকে তা পালন করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ পদের চেয়ে বড় আর কোনো পদ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবেন, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন, ততদিন আপনার এই অধিকার বলবৎ থাকবে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আপনাকে এসব ক্ষমতা প্রদান করছি। এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য মহান আল্লাহকেই একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক মেনে নিচ্ছি। ১৯৪ হিজরি সনের সফর মাসে এই অধিকার প্রদানপত্র লেখা সম্পন্ন হলো।[১৫৩]

হিজরি চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত উযির (মন্ত্রী) হলেন ইবনুল আমিদ আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (মৃ. ৩৬০ হি.)। বুওয়াইহি রাজবংশের[১৫৪] উযির হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, খিলাফতের রাজসভায় তার বন্দনা হতো। তাকে বিরাট মর্যাদা দেওয়া হতো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা তায়ি লিল্লাহ তাকে যুল-কিফায়াতাইন নামকরণ করেন। অর্থাৎ তিনিও রচনা ও লেখালেখির পাশাপাশি যুদ্ধবিষয়ক কার্যক্রমও সমানভাবে পরিচালনা করতেন।[১৫৫]

---

১৫৩. হিময়ারি, *আর-রওযুল মিতার*, পৃ. ৩১৬; আবদুল আযিয আদ-দুরি, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৫।

১৫৪. ডায়ালাসের এক রাজবংশ যারা পশ্চিম ইরান এবং ইরাকে ৯৩২-১০৫৬ খ্রি. পর্যন্ত শাসন করেছিল।-সম্পাদক

১৫৫. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২, পৃ. ২৮২; যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ২৬, পৃ. ২১৬।

উযির (মন্ত্রী) ইবনুল আমিদের প্রতি বিখ্যাত আব্বাসি খলিফা তায়ি লিল্লাহর এই অগাধ শ্রদ্ধা ও মর্যাদাদানের বিষয়টি কাকতালীয় কিছু ছিল না। কারণ ইবনুল আমিদ সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন। রণাঙ্গনে সশরীরে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন বীরত্বের প্রতীক। স্বল্পভাষী। কেউ জিজ্ঞেস না করলে অথবা কথা বললে উপকার হবে না এরকম জায়গায় কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। সচ্চরিত্র ও পবিত্র আচরণে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। সুসাহিত্যিক বা বিশেষজ্ঞ কোনো আলেম তার কাছে এলে মন দিয়ে তিনি তাদের কথা শুনতেন। তারপরও রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ ও গোলযোগের কারণে বাগদাদে যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল, স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছিল, তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এ কারণেই তার সংক্ষিপ্ত মন্ত্রিত্বের আমলে তিনি বিরাট মর্যাদার অধিকারী হয়ে যান। চারিদিকে তার প্রশংসা ও স্তুতি ছড়িয়ে পড়ে। তার হস্তক্ষেপে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ফিরে আসে। বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ যথাযথ মর্যাদা লাভ করেন। তার এই অভাবনীয় উন্নতি দেখে বুওয়াইহি রাজবংশের লোকেরা রাজত্ব ও ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে।[১৫৬]

মন্ত্রণালয়ের বিষয়টি ছিল খুবই সূক্ষ্ম, তাৎপর্যপূর্ণ ও দীর্ঘ পরিশ্রমের বিষয়। ইতিহাসবিদ শাবুশতি[১৫৭] উল্লেখ করেছেন, বিখ্যাত উযির সাইদ ইবনে মুখাল্লাদ (মৃ. ২৭৫ হি.) রাত জেগে নামাযে মশগুল থাকতেন। সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত নামায আদায়ে মগ্ন থাকতেন। এরপর অপেক্ষমাণ মানুষদের সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন। নানা প্রয়োজনে আসা জনসাধারণ সালাম দিয়ে তার কক্ষে ঢুকত। এরপর খিলাফতের রাজসিংহাসনে উপবেশন করে প্রায় চার ঘণ্টা সেখানে অবস্থান করে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও অভিযোগ শুনে সেগুলোর ফয়সালা করতেন। সেখান থেকে ঘরে ফিরে যোহর পর্যন্ত আবারও মানুষের দাবিদাওয়া ও আবেদনগুলো দেখতেন। উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলের খোঁজখবর নিতেন। যোহরের নামায আদায়

---

১৫৬. অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি*, খ. ১, পৃ. ১৮৭-১৮৮; ইহসান আব্বাস, *শাযারাতুন মিন কুতুবিন মাফকুদাতিন*, খ. ২, পৃ. ২৪০।

১৫৭. শাবুশতি : পুরো নাম আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাবুশতি। মৃ. ৩৯০ হি., ১০০০ খ্রি.। একজন বিখ্যাত লেখক। তিনি মিশরের আযিয বিল্লাহ ফাতেমির রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তার লিখিত কিতাব হলো *আদ-দিয়ারাত*, *মারাতিবুল ফুকাহা*। ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৩১৯।

করে তিনি দুপুরের খাবার সারতেন। এরপর ঘুমিয়ে পড়তেন। সন্ধ্যায় রাজদরবারের বৈঠকে বসে মধ্যরাত পর্যন্ত অর্থ ও হিসাবসংক্রান্ত কাজগুলো শেষ করতেন। তার নিত্যদিনের কাজ এই রুটিন অনুযায়ী চলত। দৈনন্দিন কোনো রাষ্ট্রীয় কাজই তার অজানা থাকত না। এরপর আর্থিক ঘাটতি ও ক্ষতির বিষয়গুলো সামনে নিয়ে তার কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ে মনোনিবেশ করতেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তার কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে যেতেন। এরপর সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে মনোরঞ্জন শেষ করে ঘুমিয়ে যেতেন।[১৫৮]

ইসলামি সভ্যতায় এমন অনেক উযির-মন্ত্রীই ছিলেন, যারা রাজনৈতিক বিভাগ ও দপ্তরগুলো পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক ছিলেন। ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণে তাদের ছিল বিরাট অবদান। এমনই একজন হলেন সেলজুক সাম্রাজ্যের বিখ্যাত উযির (মন্ত্রী) নিজামুল মুলক হাসান ইবনে আলি ইবনে ইসহাক। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, তিনিই বড় বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন বাগদাদে, নিশাপুরে, ইরানের বিখ্যাত শহর-তুসে। ইলম ও জ্ঞানের প্রচার প্রসারে তিনি ছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক। ছাত্র ও শিষ্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। হাদিস রচনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে পুরো মুসলিম-বিশ্বজুড়ে।[১৫৯]

বড় মাদরাসা বলতে ইমাম যাহাবি রহ. এখানে বাগদাদের মাদরাসায়ে নেজামিয়া উদ্দেশ্য করেছেন। শুনে অবাক হবেন, তিনি বাগদাদের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে মাদরাসায়ে নেজামিয়াতে যেতেন হাদিসের দরস দিতে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল আসিরের বর্ণনায়, মাদরাসায়ে নেজামিয়ায় প্রবেশ করে লাইব্রেরিতে বই নিয়ে অধ্যয়নে বসেন নিজামুল মুলক। সেখানে অসংখ্য গ্রন্থ পাঠ করেন। মানুষ তার কাছ থেকে হাদিসের কিছু অংশ গ্রহণ করে এবং আরও কিছু অংশের শ্রুতলিপি লেখান।[১৬০]

---

১৫৮. শাবুশতি, *আদ-দিয়ারাত*, পৃ. ৬৬।
১৫৯. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৯, পৃ. ৯৬।
১৬০. ইবনুল আসির, *আল-কামিল*, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯।

সাহাবি যুগের পর ইসলামি সভ্যতায় নিজামুল মুলক সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও ছিলেন বিখ্যাত উযিরদের (মন্ত্রীদের) একজন। আলেম তথা জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের তিনি ভালোবাসতেন। তাদের যথাযথ মর্যাদা দিতেন। ইমাম আবুল কাসেম আল-কুশাইরি এবং ইমাম আবুল মাআলি আল-জুওয়াইনি যখন নিজামুল মুলকের দরবারে যেতেন, তখন তাদের সম্মানে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। নিজ সিংহাসনে তাদের বসাতেন। আরেক বিখ্যাত আলেম আবু আলি আল-ফারমাযি তার দরবারে এলেও একই রকম করতেন। রাজ আসনে তাকে স্থান দিয়ে তিনি তার সামনে নিচে বসে যেতেন। তার সামনে এরকম কেন করেন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এ দুজনের (জুওয়াইনি ও কুশাইরি) মতো অনেক আলেম রয়েছেন, যারা আমার দরবারে এসে আমাকে প্রশংসার সাগরে ভাসিয়ে দেন। অতিমাত্রায় স্তুতি ও গুণগান করেন। তাদের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। হতাশা আমাকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু এই শাইখ (ফারমাযি) এসে চোখে আঙুল দিয়ে আমার দোষত্রুটি ধরিয়ে দেন। কারও প্রতি কোনো অবিচার করলে আমাকে সাবধান করে দেন। তা শুনে আমার অন্তর নরম হয়। অহমিকা দূর হয়। সেই ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিই।[১৬১]

ইলম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি নিদারুণ অনুরাগ থেকেই নিজামুল মুলক রচনা করেন যথাক্রমে *সিয়াসতনামা* অথবা *সিয়ারুল মুলুক* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি তিনি (৪৭৯ হি.) সেলজুক সুলতান মালিকশাহ ইবনে মুহাম্মাদের উদ্দেশে রচনা করেন। এর পেছনে তার লক্ষ্য ছিল পূর্ববর্তী সফল রাষ্ট্রনায়কদের বৃত্তান্ত তুলে ধরে দেশ পরিচালনার সঠিক ও যথার্থ পদ্ধতিগুলো তার সামনে উপস্থাপন করা। যেন সেলজুক সাম্রাজ্য সেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নীতি ও পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে সফলতার শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করতে পারে। নিজামুল মুলক তার এই উদ্দেশ্য পাঠকদের কাছে স্পষ্ট করেছেন এভাবে, এ কারণেই আমি আমার সারা জীবনের দেখা ও বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে শেখা অভিজ্ঞতাগুলো পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি।[১৬২] কোনো সন্দেহ নেই গ্রন্থটি সুলতানের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। পরবর্তীকালে পাঠকদের

---

১৬১. ইবনুল আসির, *আল-কামিল*, খ. ৮, পৃ. ৪৮১।

১৬২. নিজামুল মুলক, *সিয়াসাতনামা*, পৃ. ৪৪।

কাছেও বইটি বিরাট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এসবের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয় নিছক সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা পূর্ববর্তী কালের মহাপুরুষদের রেখে যাওয়া প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোয় আলোকিত ছিল।

ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য-সংক্রান্ত আলোচনায় আন্দালুসের ইতিহাস আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। মুসলিমবিশ্বের সর্বপশ্চিমে অবস্থিত এই সাম্রাজ্যে মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো ছিল অনেকটা বর্তমান সময়ে প্রচলিত মন্ত্রিপরিষদের মতো। শুরুতে খলিফা নিজেই প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকা পালন করতেন। এরপর ধীরে ধীরে তা হালনাগাদ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'হাজিব' হন প্রধান মন্ত্রী। হাজিব একটি পদ, যার স্থান ছিল খলিফার ঠিক পরই। আন্দালুসের ইসলামি রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয় অবকাঠামোর বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে খালদুন বলেন, শুরুতে আন্দালুসের উমাইয়া শাসনামলে উযির নামটি যথাযথ অর্থেই ব্যবহার হতো। পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা উযির (মন্ত্রী) নিযুক্ত করা হয়। অর্থনৈতিক বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী। ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখাশোনার জন্য একজন মন্ত্রী। নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য একজন মন্ত্রী। অপরাধী ও বিদ্রোহীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একজন মন্ত্রী। আর প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদা কক্ষ বা দপ্তর নির্ধারণ করা হয়, সেখানে মন্ত্রীদের বসার জন্য উন্নত গালিচা ও সোফা বসানো হয়। সকল বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত কর্মীগণ নিজ নিজ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করতেন। আর তাদের ও খলিফার মাঝে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একজন দায়িত্বশীল রাখা হতো। প্রতিনিয়ত খলিফাকে কাজের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সে অবহিত করত। এ কারণে এই দায়িত্বশীলের পদমর্যাদা অনেক উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর নাম দেওয়া হয় হাজিব। আন্দালুসে মুসলিম শাসনামলের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেখানে একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। সকল সরকারি পদ ছাপিয়ে এই পদটি সবার কাছে হয়ে ওঠে বেশ মূল্যবান। এমনকি স্পেনে খিলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর আন্দালুসের বিভক্ত ইসলামি ভূখণ্ডগুলো স্বাধীনভাবে পরিচালনাকারী 'তাইফা' রাজবংশীয়রা এই উপাধিকে নিজেদের বলে দাবি

করতে থাকে। যার ফলে তাদের অধিকাংশের নামের মধ্যে হাজিব শব্দের উপস্থিতি পাওয়া যায়।[১৬৩]

ইবনে খালদুনের বর্ণনা করা উপরের বিশ্লেষণে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, আন্দালুসের ইসলামি সভ্যতাকেই গ্রহণ করেছে বর্তমান যুগের সকল জাতি ও রাষ্ট্র। স্পেনের বুকে মুসলিমদের আবিষ্কার করা মন্ত্রিপরিষদ-ব্যবস্থাকেই আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে তারা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। কারণ আন্দালুসে উমাইয়া শাসনামলের সূচনা হয় ১৩৮ হিজরি সনে আবদুর রহমান ইবনে মুআবিয়া ইবনে হিশাম আদ-দাখিলের স্পেনে প্রবেশের মাধ্যমে। অর্থমন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়... মন্ত্রিপরিষদের এ জাতীয় বিভক্তি ও বিন্যাস সেখান থেকেই শুরু। এরপর 'হাজিব' উপাধিতে ভূষিত মন্ত্রিপ্রধানের পদ এবং মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের জন্য আলাদা দপ্তর, এ জাতীয় সুশৃঙ্খল বিন্যাস মুসলিমদের আগমনের পর থেকে আন্দালুসেই প্রথম শুরু হয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানী ও মনীষীগণই এসবের আবিষ্কারক।

স্পেনের মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসে সবচেয়ে খ্যাতিমান উযিরদের তালিকা করা হলে প্রথমেই চলে আসবে মনসুর ইবনে আবু আমির মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর নাম। তিনি ছিলেন দারুণ প্রতিভাসম্পন্ন। শুরুতে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের সাধারণ কর্মচারী। সেখান থেকে উন্নতি করতে করতে একপর্যায়ে পুলিশপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন। এরপর কনিষ্ঠ খলিফা হিশাম ইবনুল হাকামের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর হাজিব পদে উন্নীত হন। এরপর মন্ত্রিপ্রধানের পদ লাভ করেন।

বাস্তব কথা হলো, মনসুর ইবনে আবু আমির নামক এই প্রধান মন্ত্রী কখনোই নিজ সংকল্প ও অভিপ্রায় কার্যকরের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন না। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর পথে সংগ্রামী এক সাহসী বীরপুরুষ। ৩৭৩ হিজরি সনে তিনি নিজে লিওন রাজ্য অভিযান করেন। এরপর ৩৭৪ হিজরি সনে বার্সেলোনা বিজয় করেন। ৩৮৬ হিজরি সনে মরক্কোকে আন্দালুসের উমাইয়া শাসনের অধিভুক্ত করেন। মনসুর হাজিব

১৬৩. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২৪০।

থাকাকালে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের এত বেশি বিস্তৃতি ঘটেছে, যেরকমটি আগে কখনো ঘটেনি।[১৬৪]

ইসলামের ইতিহাসে মন্ত্রণালয়ের বিন্যাস ও পদগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ইসলামি রাষ্ট্রের শক্তিমত্তা ও ভাবমূর্তি উন্নত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি খিলাফত ও ইসলামি সাম্রাজ্যের দুর্বল ও জরাগ্রস্ত পরিস্থিতিতেও এমন অসংখ্য উযির বর্তমান ছিলেন, যারা তখনও ইসলামি সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। জেনে অবাক হবেন, খিলাফত যতই বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হোক, এসব বিখ্যাত উযিরগণ কখনোই খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। আন্দালুসে মনসুর ইবনে আবু আমিরের অসামান্য কীর্তি এবং বাগদাদে ইবনুল আমিরের (মৃ. ৩৬০ হি.) অনবদ্য ভূমিকা থেকে এ কথাই আমরা জানতে পারি।[১৬৫]

---

১৬৪. দেখুন, হুসাইন মুনিস, *মাওসুআতু তারিখিল উন্দুলুস*, খ. ১, পৃ. ৩৬৩-৩৭২।

১৬৫. অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি* খ. ১, পৃ. ১৮৫-১৮৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিন থেকেই মন্ত্রণালয় ব্যবস্থার সূচনা হয়। আর তাই ইসলামি আইনবিদদের রচিত ওযারাত বা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত অনেক রচনা ও গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়ে, যেগুলোতে ফিকহি মূলনীতি অথবা এমন সাধারণ কিছু নিয়মপদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো প্রত্যেক উযিরের মধ্যে থাকা উচিত। এ তালিকায় যারা অগ্রজের ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অন্যতম হলেন ইবনুল মুকাফফা। তিনি বলেন, উযির বা সহযোগী ছাড়া একজন সুলতান কখনো নিজের কাজগুলো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবেন না। আর উযিরদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কেবল সম্প্রীতি ও উপদেশের মাধ্যমেই।[১৬৬]

অপরদিকে ইবনে আবু রবি[১৬৭] তার বিখ্যাত *সুলুকুল মালিক ফি তাদবিরিল মামালিক* গ্রন্থে লেখেন, জেনে রাখুন একজন খলিফা বা শাসকের জন্য এমন উযিরের প্রয়োজন, যে খলিফার কাজগুলোর বিন্যাস করে দেবে। রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে তাকে সহযোগিতা করবে। সঠিক সিদ্ধান্ত ও মতামত তার সামনে উপস্থাপন করবে। আপনি কি আমাদের বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত পড়েননি?! মহান আল্লাহ তাকে সুস্পষ্ট সব নিদর্শন দিয়ে পাঠান। অলৌকিক সব গুণ দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেন। ইসলামের এই সুমহান জীবনব্যবস্থাকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা প্রদান করেন। সত্য পথের সন্ধান দেন। এত কিছুর পরও তিনি আলি ইবনে আবি তালিব রা.-কে

---

১৬৬. ইবনুল মুকাফফা, *আল-আদাবুস সগির*, পৃ. ৩২।

১৬৭. পুরো নাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু রবি (২১৮-২৭২ হি./৮৩৩-৮৮৫ খ্রি.)। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক এবং আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিমের অন্যতম উযির। তার অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্যে *সুলুকুল মালিক ফি তাদবিরিল মামালিক* অন্যতম। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২০৫।

তার উযির বলে সম্বোধন করেন। আলি রা.-কে উদ্দেশ্য করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى»

মুসার জন্য হারুন যেমন, আমার জন্য তুমিও তেমন।[১৬৮], [১৬৯]

অন্যের সহযোগিতা বা সুপরামর্শ গ্রহণ যদি তুচ্ছ কোনো বিষয় হতো, তাহলে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসা আ.-এর মতো উন্নত মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ উযির বা সহযোগী গ্রহণ থেকে নির্মুখাপেক্ষী থাকতেন। সুতরাং বোঝা গেল, উযির হলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় খলিফার প্রধান সহযোগী। রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো সুরক্ষার প্রধান নীতিনির্ধারক। কাজে ও বক্তব্যের মাধ্যমে সকল-কিছুর ব্যবস্থাপক।[১৭০]

অপরদিকে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যারা কলম ধরেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওয়ারদি। তিনি তার অনবদ্য *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা* গ্রন্থে মন্ত্রণালয়ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোকপাত করেন। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। সেখানে ওযারত বা মন্ত্রণালয়কে তিনি দুভাগে বিভক্ত করেন। এক. ওয়াযারাতু তাফবিয (وزارة تفويض)। দুই. ওয়াযারাতু তানফিয (وزارة تنفيذ)।

ওয়াযারাতু তাফবিয হলো মন্ত্রীদেরকে নিজ চিন্তা ও গবেষণার আলোকে নানা রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশ জারি করা এবং বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার অবাধ ক্ষমতা প্রদান।[১৭১] কোনো সন্দেহ নেই এ ধরনের ক্ষমতা

---

১৬৮. অন্য একটি বাক্যেও হাদিসটি বর্ণিত : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى : দেখুন, *বুখারি*, কিতাবুল মাগাযি, বাব : গাযওয়াতু তাবুক ওয়া হিয়া গাযওয়াতুল উসরাতি, হাদিস নং ৪১৫৪। *মুসলিম*, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, বাব : মিন ফাযায়িলি আলি ইবনে আবি তালিব, হাদিস নং ২৪০৪।

১৬৯. ইবনে আবু রবির উচিত ছিল আবু বকর, উমর ও উসমানের ওযারত (মন্ত্রিত্ব) নিয়ে আলোচনা করা। এরপর আলি ইবনে আবু তালিবের কথা উল্লেখ করা। কারণ এ ক্ষেত্রে তার অবস্থান তাদের পরে।

১৭০. ইবনে আবু রবি, *সুলুকুল মালিকি ফি তাদবিরিল মামালিক* গ্রন্থে যাফের কাসেমি রচিত *নিযামুল হুকমি ফিশ শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি* গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, খ. ১, পৃ. ৪২২-৪২৩।

১৭১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২৪-২৫।

প্রদান খিলাফত ও ইসলামি রাজনৈতিক অঙ্গনের দারুণ কুশলতার পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ ছোট-বড় সব বিষয়ের সমাধানের জন্য একই বিভাগের শরণাপন্ন হয়ে মানুষ যেন ভোগান্তিতে না পড়ে, সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টর ও দপ্তরভিত্তিক বিন্যাসে মন্ত্রণালয়কে সাজানো হয়। এরকম অবাধ স্বাধীন মন্ত্রিত্ব যারা লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে জাফর ইবনে ইয়াহইয়া আল-বারমাকি অন্যতম। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে তাকে সুলতান উপাধি দেওয়া হয়। কারণ খলিফার মতো রাষ্ট্রের সকল-কিছুতে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করার এবং সকল আদেশ-নিষেধ জারি করার একচ্ছত্র অধিকার তারও ছিল।[১৭২] এ তালিকায় আরও যাদের নাম এসে যায়, তাদের মধ্যে বাগদাদে ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণের অগ্রনায়ক নিজামুল মুলক এবং স্পেনের ইসলামি কৃষ্টিতে অবদান রাখা মনসুর ইবনে আবু আমির অন্যতম। এ দুজন সম্পর্কে একটু আগে আমরা জেনে এসেছি।

সে তুলনায় ওয়াযারাতু তানফিয কিছুটা কম মর্যাদার। কারণ এটি কেবল খলিফার আদেশ মান্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে ক্ষেত্রে খলিফার নির্দেশ যথাযথ পালন করা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি সাজানোর দায়িত্ব পেতেন এরকম উযিরগণ।[১৭৩] ইসলামি সভ্যতায় বেশিরভাগ উযিরের দায়িত্বই ছিল এ প্রকৃতির। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ইস্যুতে খলিফার আদেশ যথাযথভাবে পালন করার জন্য তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হতো।

সিরাজুল মুলুক গ্রন্থে উযির ও তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেন তারতুশি। একজন উযিরের কাছ থেকে খলিফা কী আশা করেন উক্ত গ্রন্থে তিনি তা স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, একজন উযিরের প্রধান দুটি দায়িত্ব হলো : এক. অজানা বিষয়গুলো তিনি খলিফাকে জানাবেন। দুই. খলিফা আগে থেকে যা জানতেন উযির তা আরও স্পষ্ট ও জোরালো করবেন।[১৭৪] তা ছাড়া মন্ত্রণালয়ের পদে নিন্দিত কোনো ব্যক্তিকে বসানো থেকে সতর্ক করেন তারতুশি। তার গ্রন্থে তিনি বলেন, নিন্দিত বা বিতর্কিত কেউ উন্নত পদে নিয়োগ পেলে তার সহযোগী কমে

---

১৭২. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২৩৮।

১৭৩. প্রাগুক্ত, ২৬। মুনির আল-আজলানি, *আবকারিয়্যাতুল ইসলামি ফি উসুলিল হুকমি*, পৃ. ২২৩।

১৭৪. তারতুশি, *সিরাজুল মুলুক*, পৃ. ৫৬।

যাবে। তার ভালো কাজগুলো সন্দেহের চোখে দেখা হবে। তিনিও নন্দিত ব্যক্তিদের হালকা চোখে দেখবেন। গুণধর ব্যক্তিদের ওপর তিনি অহংবোধ করবেন। এরপর এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তিনি সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক এবং উমর ইবনে আবদুল আযিযের মাঝে সংঘটিত একটি ঘটনা টেনে আনেন, সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ব্যক্তিগত পত্রলেখক ইয়াযিদ ইবনে আবু মুসলিমকে নিজের পত্রলেখক হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন, তখন উমর ইবনে আবদুল আযিয তাকে বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, এই লোকটিকে আপনার পত্রলেখক হিসেবে নিয়োগ করে হাজ্জাজের আলোচনা আবার জাগিয়ে তুলবেন না। উত্তরে তিনি বলেন, হে আবু হাফস, আমি তার বিরুদ্ধে এক দিনার বা এক দিরহাম পরিমাণও দুর্নীতির অভিযোগ পাইনি। তা শুনে উমর বললেন, দিরহাম-দিনারের আলোচনা যখন উঠল, তাহলে আপনাকে আমি দিরহাম-দিনার ব্যবহারে তার চেয়েও সৎ একজনের কথা বলব কি? সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কে? উত্তরে উমর বললেন, ইবলিস! জীবনেও সে কোনো দিনার বা দিরহাম স্পর্শ করেনি, কিন্তু সে ঠিকই পুরো মানবজাতিকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।[১৭৫]

আরেক বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা শাইযারি (মৃ. ৫৮৯ হি.) *আল-মানহাজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক* গ্রন্থে মাওয়ারদির মতোই মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক ও বিভাগীয় বিন্যাসের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও একজন উযিরের মধ্যে দশটি অপরিহার্য গুণ থাকার কথা বলেছেন শাইযারি। সেগুলো হলো যথাক্রমে : যথেষ্ট জ্ঞান, পরিণত বয়স, সততা, সত্যবাদিতা, অল্পেতুষ্টি, শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় পারদর্শিতা, উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা, প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি, স্বেচ্ছাচারহীনতা এবং সকল-কিছু নিজেই মীমাংসা করতে পারার মতো যোগ্যতা।[১৭৬]

অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল-কালয়ি (মৃ. ৬৩০ হি.) রচনা করেন বিখ্যাত *তাহযিবুর রিয়াসাতি ওয়া তারতিবুস সিয়াসা* গ্রন্থ। বিশাল কলেবরের এ বইয়ে পূর্ববর্তী শাসকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে

---

১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১৭৬. দেখুন, শাইযারি, *আল-মানহাজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক*, পৃ. ২০৭-২১০।

সুষ্ঠু ও সুনিপুণভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্য খলিফা, গভর্নর ও শাসকদের জন্য উপকারী সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। গ্রন্থটি তিনি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে তিনি প্রজ্ঞাবানদের নির্বাচিত বাণী ও ভাষাপণ্ডিতদের দুর্লভ সংলাপের বিবরণ দিয়ে সেগুলোকে বিচিত্র উপমা ও বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে সাজিয়ে তোলেন। দ্বিতীয় ভাগে তিনি খলিফা, উযির, গভর্নর, সরকারি কমকর্তা, কর্মচারী ও কার্যনির্বাহীদের জন্য শিক্ষণীয় বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন। এসব ঘটনা থেকে তাদের মানমর্যাদা, সদাচরণ, সচ্চরিত্র ও মনুষ্যত্বের গুণাবলির প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৭৭] মন্ত্রণালয়ের আলোচনা করতে গিয়ে প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের দেওয়া নানা উপমা ও প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন। তা ছাড়া ওযারত ও উযিরদের নিয়ে লেখা বিভিন্ন কবিতাও তিনি সেখানে বর্ণনা করেন।

অপরদিকে আবদুর রহমান ইবনে খালদুন (মৃ. ৮০৮ হি.) তার বিখ্যাত *আল-মুকাদ্দিমায়* বিশ্বনবীর যুগ থেকে শুরু করে তার যুগ পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনার অভূতপূর্ব উন্নতির ঐতিহাসিক বিবরণ দেন। ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কোনো রাষ্ট্রের বা আমলের মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি ও অবনতির বিস্তারিত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা তুলে ধরেন। এ বইয়ের মাধ্যমে ইসলামি রাজনৈতিক বিষয়ে ইবনে খালদুনের গভীর জ্ঞান ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বনি উমাইয়ার শাসনামলে মন্ত্রিত্বের গুরুত্বের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সে যুগে পুরো বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও উন্নত পদ ছিল মন্ত্রিত্ব। সরকারি সকল বিষয় দেখাশোনা ও পরিচালনা এবং নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা-বিষয়ক সকল ইস্যুতে একমাত্র উযিরগণই হস্তক্ষেপ করতেন। তা ছাড়া সামরিক ইস্যু এবং নাগরিকদের ভাতা প্রদান, এ জাতীয় বিষয়গুলো তারাই পরিচালনা করতেন।[১৭৮] এতে কোনো সন্দেহ নেই তার রচিত রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং তার প্রদর্শিত ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সাংস্কৃতিক রূপকেই পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়েছে।

---

[১৭৭]. কালয়ি, *তাহযিবুর রিয়াসাতি*, পৃ. ৬০।

[১৭৮]. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, পৃ. ২৩৮।

অপরদিকে শামসুদ্দিন ইবনুল আযরাক আল-গারনাতি (মৃ. ৮৯৬ হি.) তার রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে খালদুনের দেখানো পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তার লেখা *বাদায়িয়ুস সিলকি ফি তাবায়িয়িল মুলকি* গ্রন্থে 'যেসব কর্মসূচির আলোকে গড়ে একজন রাষ্ট্রনায়কের সকল দায়িত্ব' শীর্ষক একটি অধ্যায় রচনা করে উযির নিয়োগের কাজকে শাসকের প্রথম দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন। সেজন্য যৌক্তিক ও শরয়ি সকল প্রমাণ উপস্থাপন করে তার এই দাবিকে জোরালো করে তোলেন। তার এ গ্রন্থের বিন্যাস অনেকটা দর্শন ও তর্কশাস্ত্রীয় বইয়ের মতো।[১৭৯]

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আশা করি পাঠক মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তা ছাড়া এটাও জেনে রাখা দরকার, ইউরোপীয় কোনো জাতি এবং ইসলামপূর্ব কোনো জনগোষ্ঠী মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় কোনো অবদান রেখেছে বলে আদৌ প্রমাণিত নয়।

---

১৭৯. ইবনুল আযরাক, *বাদায়িয়ুস যিলকি ফি তাবায়িয়িল মুলকি*, পৃ. ২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভাগ ও কার্যালয়

আদ-দিওয়ান (الديوان) শব্দটি মূলত ফারসি। তার বাংলা অর্থ গ্রন্থালয় বা নথি সংরক্ষণের নির্ধারিত স্থান।[১৮০] তবে পরিভাষায় দিওয়ান শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মাওয়ারদি বলেন, রাজ্যের সকল কর্মকাণ্ড ও আর্থিক হিসাব এবং তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য সেনাবাহিনী ও সরকারি কার্যনির্বাহীদের দায়িত্ব ও অধিকারের নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়কে বলা হয় দিওয়ান।[১৮১]

অনেক ইতিহাসবিদের দাবি, ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামল থেকেই দিওয়ান বা বিভাগীয় কার্যালয় ব্যবস্থার সূচনা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় নির্ধারণ এবং সেজন্য দায়িত্বশীল ও কার্যনির্বাহী নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এ দাবিটি ঠিক আছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু এই দিওয়ান ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক গোড়াপত্তন ঘটে মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই। কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সরকারপ্রধান, শাসক, গোত্রনেতা থেকে শুরু করে নিজ দেশের সরকারি কর্মী ও গভর্নরদের কাছে রাষ্ট্রীয় পত্র লেখার জন্য অনেক সুদক্ষ লেখক নিয়োগ করেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, ইসলামি রাষ্ট্রে বিভাগীয় কার্যালয় ব্যবস্থার সূচনা সেই নববি যুগেই হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে দিওয়ান নামে যদিও এর প্রচলন ছিল না, তবে এ ধরনের পত্র লেখালেখি ও আদান-

---

১৮০. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, دون মূল ধাতু, খ. ১৩, পৃ. ১৬৪।

১৮১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২৫৯।

প্রদানের যাবতীয় কার্যক্রম তখন প্রচলিত ছিল। এ কারণেই এ বিষয়ে আলোচনা আমরা একটু বিস্তারিত আকারে কয়েকটি অনুচ্ছেদে সাজানোর পরিকল্পনা করেছি :

প্রথম অনুচ্ছেদ : পত্র ও রচনা বিভাগ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ভাতা ও সৈনিক বিভাগ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াকফ বিভাগ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ডাক ও যোগাযোগ বিভাগ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : রাজকোষ বা অর্থ তহবিল

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : পুলিশ প্রশাসন

সপ্তম অনুচ্ছেদ : আল-হিসবাহ

অষ্টম অনুচ্ছেদ : সামরিক বিভাগ

প্রথম অনুচ্ছেদ

১. পত্র ও রচনা বিভাগ

এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল লেখালেখি ও রাষ্ট্রীয় নথিপত্র তৈরি। যুগ যুগ ধরে লেখালেখি বা রচনার কাজ খলিফা পদের পর সবচেয়ে উন্নত ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হতে থাকে। কারণ সমৃদ্ধির সকল পথের মিলন হয়েছে এ পদকে কেন্দ্র করে। মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে এ পদ। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই রচনা বিভাগের কাজ হয়ে ওঠে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নব্য ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য অনেক রচয়িতা বা লেখক নিযুক্ত করেন, বিশেষজ্ঞগণের মতানুযায়ী বিশ্বনবীর নিযুক্ত লেখকদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।[১৮২]

বিশেষ করে খলিফা ও গভর্নরদের খুব প্রয়োজন দক্ষ লেখকদের। ফলে আমরা দেখি, সেই যুগে লেখকদের নিয়ে প্রচুর প্রশংসাগাথা তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে যুবাইর ইবনে বাক্কার বলেন, লেখকগণ হলেন রাজা আর সকল মানুষ প্রজা।[১৮৩] ইবনুল মুকাফফা বলেন, লেখকগণ শাসকদের মুখাপেক্ষী ঠিক, তবে এর চেয়ে বেশি শাসকগণ লেখকদের মুখাপেক্ষী।[১৮৪]

কালকাশান্দি (মৃ. ৮২১ হি.) রচনাশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, চুক্তিনামা, শপথনামা, প্রাপ্তিস্বীকার, প্রত্যয়নপত্র, জামিননামা, দণ্ডাদেশ, শান্তিচুক্তি, আমানত গ্রহণ ও প্রদানপত্র, রাষ্ট্রীয় ফরমানসহ যেকোনো কথা ও ভাবকে লেখায় রূপান্তর করার নাম রচনাশাস্ত্র।[১৮৫]

---

১৮২. ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৯৯।

১৮৩. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১, পৃ. ৩৭।

১৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭।

১৮৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪।

উপরের এই বিবরণ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, রচনা বিভাগের দায়িত্ব কেবল শাসক ও গভর্নরদের পত্র লেখার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সেজন্য উপযুক্ত বাক্য নির্বাচন এবং কূটনৈতিক পরিভাষা ব্যবহারও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ পদের লোকদের আমরা খলিফা বা গভর্নরের মুখপাত্র হিসেবে অভিহিত করতে পারি। এ ছাড়াও রাষ্ট্রের সকল গোপন নথি ও খলিফার সঙ্গে উযির ও গভর্নরদের সম্পর্কের বিস্তারিত দলিলপত্র তাদের কাছে জমা রাখা হতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও চুক্তির নথিও তাদের কাছে সংরক্ষিত থাকত।

কোনো সন্দেহ নেই, কালকাশান্দির এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, হিজরি অষ্টম ও নবম শতকে লেখালেখি ও রচনা বিভাগ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ব রূপ লাভ করে।

ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম বিশিষ্ট লেখকদের নিযুক্ত করেন। এ থেকেই ইসলামি সভ্যতায় লেখালেখির গুরুত্ব অনুমান করা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রের গভর্নর, যুদ্ধাভিযানে থাকা সেনানায়ক সাহাবিদের কাছে রাষ্ট্রীয় পত্র পাঠাতেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসক ও সরকারপ্রধানদের ইসলামের দিকে আহ্বান করে পত্র পাঠাতেন। সাহাবিদের রাষ্ট্রদূত বানিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করতেন। আমর ইবনে হাযমকে ইয়ামেনে নিযুক্ত করার সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উদ্দেশে শপথনামা লেখেন। নিযুক্ত তামিম দারি ও তার ভাইদের উদ্দেশে বিশ্বনবী শামে জায়গির প্রদান মর্মে পত্র লিখে পাঠান। হুদাইবিয়ার বছর তার ও কুরাইশ গোত্রের মাঝে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি লেখান...।[১৮৬]

খুলাফায়ে রাশেদিনও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো এই পথে হাঁটেন। ফলে আমরা দেখি, খলিফা আবু বকরের জন্য উসমান ইবনে আফফান ও যায়দ ইবনে সাবিত লেখকের ভূমিকা পালন করেন। এরপর দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের জন্য যায়দ ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে খালাফ লেখকের ভূমিকা পালন করেন। তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফানের জন্য মারওয়ান ইবনুল হাকাম লেখকের দায়িত্ব পালন করেন। চতুর্থ খলিফা আলি ইবনে আবু তালিবের জন্য

---

১৮৬. কাত্তানি, *আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ১১৮।

আবদুল্লাহ ইবনে রাফে ও সাইদ ইবনে নাজরান আল-হামদানি লেখকের ভূমিকা পালন করেন। এরপর পঞ্চম খলিফা হাসান ইবনে আলির জন্যও তারা লেখকের দায়িত্বে ছিলেন।[১৮৭]

বনু উমাইয়ার শাসনামলে খিলাফতের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। রাজ্য ও গভর্নরদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় খলিফাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও পত্র আদান-প্রদানের হার বৃদ্ধি পায়। ফলে রচনা ও লেখালেখির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা আরও ব্যাপক হয়। উমাইয়া শাসনামলে রচনা বিভাগে যারা কাজ করতেন তাদের মাঝে আরব লেখকদের পাশাপাশি ছিল দাস ও অনারব শ্রেণিও। খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের দাস আবুয যুআইযিআ এবং রুহ ইবনে যানবা আল-জুযামি ছিলেন খলিফার খুব কাছের লেখক। রুহ ইবনে যানবার রচনাদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাকে ফারিসিয়্যুল কিতাবা (فارسي الكتابة) উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৮৮]

সরকারি রচনা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হতো বিখ্যাত ও বিশিষ্ট লেখকদের। তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো গুরুত্বপূর্ণ এসব বিভাগ। 'আবদুল হামিদ আল-কাতেব' উপাধি পাওয়া আবদুল হামিদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আমেরি (মৃ. ১৩২ হি.) ছিলেন উমাইয়া খিলাফতের বিশিষ্ট একজন সরকারি লেখক। পুরো ইসলামি সভ্যতায় বিখ্যাত লেখকদের তালিকা করলে তাকে বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নেই। তো উমাইয়া সাম্রাজ্যে তার উন্নত মর্যাদার দরুন বনু উমাইয়ার সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ (মৃ. ১৩২ হি.) তাকে নিজের একান্ত উযির হিসেবে নিয়োগ করেন। সে সময় তার প্রধান দায়িত্ব ছিল রচনা ও লেখালেখি।

একজন লেখকের মাঝে কী কী গুণ থাকা উচিত এবং রচনা বিষয়ে কী কী সাধারণ মূলনীতি অনুসরণ করা উচিত সেগুলো প্রথম আবদুল হামিদ আল-কাতেবের প্রণয়ন করা। এই শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তার উদ্দেশে বলা হয়,

---

[১৮৭]. ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০১।

[১৮৮]. জাহশিয়ারি, *আল-ওয়াযারাউ ওয়াল-কুততাব*, পৃ. ৩৫।

«فُتحت الرسائل بعبد الحميد وخُتمت بابن العميد»

পত্র লেখালেখির সূচনা হয় আবদুল হামিদ থেকে এবং সমাপ্তি ঘটে ইবনুল আমিদ পর্যন্ত এসে।[১৮৯]

এ কারণেই তার শিষ্যগণ রাষ্ট্রের সব গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করতে সক্ষম হন, বিশেষত খিলাফতের অঙ্গনে। তার অন্যতম শিষ্য ইয়াকুব ইবনে দাউদকে উযির হিসেবে নিয়োগ করেন আব্বাসি খলিফা আল-মাহদি।[১৯০]

আব্বাসি খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিভাগের ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। রচনা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সুযোগ-সুবিধা ছিল, আব্বাসি খিলাফতের সময় তা আরও বাড়ানো হয়। এরকম বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদার একটি ছিল স্বাক্ষর। অর্থাৎ তারা নানা প্রয়োজনে রাজদরবারে আসা মানুষদের আবেদনগুলো গুছিয়ে সংক্ষিপ্ত কথায় লিখে স্বাক্ষর করে খলিফার সামনে পেশ করতেন। খলিফা এক নজর চোখ বুলিয়ে এ বিষয়ে তার মত শুনে পত্রে স্বাক্ষর করতেন। এরপর সেগুলো রাজস্ব বিভাগ, অর্থ তহবিল বা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠিয়ে দিতেন। ওই আবেদনপত্রেই খলিফা বা তার কাতেব মঞ্জুরিমূলক শব্দ লিখে স্বাক্ষর করতেন। এসব নির্দেশনামূলক শব্দ হতো সুসংক্ষিপ্ত ও পাণ্ডিত্বপূর্ণ ভাষায়। তা দ্বারা স্বাক্ষরকারীর ব্যুৎপত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও সুবচন নির্বাচনে তার দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যেত। অধিকাংশ পণ্ডিত খলিফা হারুনুর রশিদের আমলের বিশিষ্ট সরকারি কার্যনির্বাহী ও বিল অনুমোদন বিভাগের প্রধান জাফর ইবনে ইয়াহইয়া আল-বারমাকির স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত। তার পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তি ছিল অনেক উঁচুমানের। এমনকি লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল, তার একটি স্বাক্ষর এক দিনার মূল্যে বিক্রয় হতো।[১৯১]

আব্বাসি খিলাফতের যামানায় আমরা দেখতে পাই, খলিফাগণ এরকম লেখক ও রচয়িতাদের অনেক মর্যাদা দিতেন। আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে কাসেম (মৃ. ২১৩ হি.) ছিলেন খলিফা মামুনের শাসনামলে পত্র ও

---

১৮৯. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ৮, পৃ. ৪৭০-৪৭১।

১৯০. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ৬০।

১৯১. খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ৭, পৃ. ১৫২।

রচনা বিভাগের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। রচনা বিভাগে তার দক্ষতা ও যোগ্যতা দেখে আহমাদ ইবনে আবু খালেদ আল-আহওয়ালের ইনতেকালের পর খলিফা মামুন তাকে উযির হিসেবে নিয়োগদান করেন। তার অগাধ পাণ্ডিত্য ও পত্র লেখায় পারদর্শিতার বিষয়ে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। খলিফা মামুন একবার রমযান মাসে রাতের বেলায় শহরের সব মসজিদের বাতির সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সকল গভর্নর ও কর্মী বরাবর ফরমান লিখতে তাকে নির্দেশ দেন। আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে কাসেম বলেন, এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কেউ লেখেনি। কারও লেখা দেখে অনুসরণ করব সে সুযোগও নেই। কী লেখা যায়, কী লেখা যায়, এরকম চিন্তা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখি, একজন আগন্তুক এসে আমাকে বলল, লিখুন,

«فإن فيها أُنْسًا للسابلة، وإضائة للمتهجدة، ونشاطا للمتعبدين، ونفيا لمكامن الريب، وتنزيها لبيوت الله عن وحشة الظُّلم»

এতে করে পথিকদের জন্য সুবিধা হবে। তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ আলো পাবে। ইবাদতকারীদের জন্য প্রাণবন্ততা বয়ে আনবে। সন্দেহযুক্ত গোপন স্থান বলতে আর কিছুই থাকবে না। তা ছাড়া অন্ধকারের নির্জন পরিবেশ থেকে আল্লাহর ঘরগুলো পবিত্র থাকবে।[১৯২]

মোটকথা, নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অসামান্য রচনাশক্তিই আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনুল কাসেমকে পরবর্তী সময় উযিরের পদে অধিষ্ঠিত করেছিল।

প্রায় ছয় শতাব্দীজুড়ে আব্বাসি শাসনামলে এমন অসংখ্য খ্যাতিমান ও বিদগ্ধ লেখকের জন্ম হয়েছে, যাদের দ্বারা আব্বাসি খিলাফত দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। এ কারণেই আব্বাসি শাসনব্যবস্থার আদলে পরবর্তীকালে উবাইদি, আইয়ুবি, আন্দালুসি রাজবংশসহ স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সুলতান ও আমিরগণও নিজ নিজ সাম্রাজ্যে স্বতন্ত্র রচনা বিভাগ চালু করেন, যা পত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গণমাধ্যমের ভূমিকাও পালন করত।

---

১৯২. কুদামা ইবনে জাফর, *আল-খারাজ ওয়া সিনাআতুল কিতাবা*, পৃ. ৩৭।

খলিফা মামুনের রচনা বিভাগে কর্মরত এরকমই একজন বিখ্যাত লেখক হলেন আবু উসমান আল-জাহিয। কিন্তু সহকর্মীদের রাজকীয় পোশাক গ্রহণ ও কথাবার্তায় তাদের অতিউৎসাহী স্বভাব দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি লেখালেখির পেশা বর্জন করে রাজবিভাগ থেকে বের হয়ে যান। তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, মানবপ্রকৃতি ও প্রাণিবিদ্যা নিয়ে লেখালেখি করতে তিনি বাগদাদ ছেড়ে বসরায় চলে আসেন।

মুরাবিতিন সাম্রাজ্যেও রচনা বিভাগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এক বিভাগ। সার্বিক দেখাশোনা ও পরিচালনায় থাকতেন একজন বড় লেখক। মুরাবিতিন রাজবংশীয়গণ বড় বড় সাহিত্যিক থেকে বাছাই করে করে রাজলেখক নিয়োগ করতেন। এমনকি মধ্যযুগে রচনাশৈলী এমন উন্নত পর্যায়ে পৌছে, তর্কশাস্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও তাতে ঢাকা পড়ে যায়। সে সময় আমিরদের একসঙ্গে একাধিক রাজলেখক থাকত। তাদের মাঝে একজন থাকতেন প্রধান হিসেবে। মূলত তিনিই সরকারি রচনা বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন।[১৯৩]

শাসকগণ রচনা বিভাগের লেখক নিয়োগের জন্য নানারকম নির্বাচন-প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। সবচেয়ে বিজ্ঞ ও সুসাহিত্যিক ব্যক্তিকেই রচনা বিভাগের প্রধান করা হতো। তাকে মাননীয়-মহোদয় জাতীয় সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করা হতো। তিনিই সকল আবেদন ও নথিপত্র গ্রহণ করতেন। পরবর্তী সময়ে সেগুলো খলিফার সামনে পেশ করতেন। আবেদন গ্রহণ ও অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে তিনিই বাকি লেখকদের নির্দেশনা দিতেন। খলিফা নিজেও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে তার মতামত গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন। যেকোনো সময় সাক্ষাৎ করতে চাইলে খলিফা নিষেধ করতেন না। আর এ সুযোগ অন্য কারও জন্য ছিল না। এমনকি অনেক সময় রাষ্ট্রীয় কাজের সুবাদে তিনি খলিফার কাছে কয়েক রাত পর্যন্ত অবস্থান করতেন। তার বেতন ছিল প্রতি মাসে একশ বিশ দিনার। এরকম মোটা অঙ্কের বেতন রাজদরবারে তাদের অসামান্য মর্যাদার কথা প্রমাণ করে। এ কারণেই জায়গির প্রদান সংক্রান্ত বিষয়, পোশাক প্রদান সংক্রান্ত, সরকারি ফি প্রবর্তন ও লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়গুলো যারা দেখাশোনা করতেন তাদের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন

---

১৯৩. ইবরাহিম হারাকাত, *আন-নিযামুস সিয়াসি ওয়াল-হারাবি ফি আহদিল মুরাবিতিন*, পৃ. ৯৩-৯৪।

লেখকগণ। রাজপ্রসাদে অবস্থিত তার দফতরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, এমনকি বিশিষ্ট রাজ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কেউ রাজলেখকদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেত না। আমিরশ্রেণি থেকে তার জন্য হাজিব (সহযোগী) নির্ধারণ করা হতো। তার জন্য আলাদা পরিচ্ছন্নতাকর্মী থাকত। তার মর্যাদা ছিল অভাবনীয়। তার প্রাসাদে শোভা পেত রাজসরঞ্জাম, আসবাব, সোফা, উন্নত মসনদ ও লেখালেখির সব উন্নত উপাদান, খলিফার বিশিষ্ট লেখকগণই এগুলো সরবরাহ করতেন।[১৯৪]

সেই যুগের রচনা বিভাগের আলোচনা করতে গেলে বিখ্যাত লেখক কালকাশান্দির কথা বলতেই হবে। তিনি ভূগোল, ইতিহাস ও প্রশাসনিক বিষয়ের প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ *সুবহুল আ'শা ফি সিনাআতিল ইনশা* রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি স্বতন্ত্র রচনা বিভাগ, সেই বিভাগের জন্য যোগ্য লেখক নিয়োগের গুরুত্ব এবং একজন লেখকের মাঝে কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সে বিষয়গুলো তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, লেখক হবেন উজ্জ্বল ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী। তার ভাষা হবে সহজ, শুদ্ধ ও পরিষ্কার। তিনি হবেন সেই দেশের নাগরিক। স্থানীয়ভাবে তিনি হবেন সকলের কাছে সমাদৃত। ভাবগাম্ভীর্যের অধিকারী। অত্যন্ত ভদ্র। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। নম্র ও সহনশীল। বাদশাকে সবসময় সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন। কখনো কৌশল অবলম্বন করবেন না। বাদশার ন্যায্য সিদ্ধান্ত, তার গৃহীত যেকোনো সুপরিকল্পনা ও পদক্ষেপের প্রচারপ্রসার করবেন। এ বিষয়গুলো জনগণের সামনে মহত্ত্ব ও অত্যন্ত সম্মানের সাথে উপস্থাপন করবেন। বারবার আলোচনা করবেন। জনগণকে বাদশার প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ে উৎসাহিত করবেন। রাজদরবারে বা ভরা মজলিসে বাদশা যদি এমন কোনো কথা বলেন যা তার কাছে সঠিক মনে হয়নি, তাহলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। বাদশার সম্মান ও ভাবমূর্তির কথা বিবেচনা করে নীরব থাকবেন। বড় ধরনের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত হলে ধৈর্য ধারণ করে নির্জনে কথা বলার অপেক্ষায় থাকবেন। বাদশা যখন একা থাকেন, তখন বাদশার মেজাজ-মর্জি বুঝে অন্যান্য আলোচনার ফাঁকে সম্পূর্ণ নিরহংকারী মনোভাব নিয়ে প্রজ্ঞার সাথে সত্য

১৯৪. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িযু ওয়াল-ইতিবার*, খ. ১, পৃ. ৪০২।

ও সঠিক পরামর্শ বাদশার কাছে উপস্থাপন করবেন। এতে করে যেন বাদশার সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিকভাবে খণ্ডন না করা হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখবেন। নিজের মতামতের কারণে আহমিকা দেখাবেন না। শান্তি ও নিরাপত্তা-রক্ষা, সুবিচার স্থাপন, সমতা বিধান, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়িত মানুষের অধিকার সুরক্ষায় সবসময় কথা ও পরামর্শ দিয়ে বাদশাকে সহযোগিতা করে যাবেন।[১৯৫]

মোটকথা, পত্র ও রচনা বিভাগ ছিল ইসলামি সভ্যতার অন্যতম উৎকর্ষের প্রতীক। এটি ছিল উন্নত ইসলামি ঐতিহ্য, যা ছিল জনগণের সকল চাহিদা পূরণে একটি সুষ্ঠু সরকারি কার্যালয় এবং অনিন্দ্যসুন্দর ইসলামি ব্যবস্থাপনা।

---

১৯৫. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১, পৃ. ১৩৯-১৪০।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২. ভাতা ও সৈনিক বিভাগ

ভাতা ও সৈনিক বিভাগ চালু করার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সৈনিকদের সংখ্যা, তাদের নাম ও জাতীয়তা সংরক্ষণ করে তাদের জন্য উপযুক্ত ভাতা নির্ধারণ করা। সেই সঙ্গে কে কখন ভাতা গ্রহণ করবেন এবং কে কী ধরনের হাতিয়ার বহন করবেন তা নির্দিষ্ট করা। এতে করে যোদ্ধাদের সুবিধার পাশাপাশি তাদের পরিবার ও স্বজনদের জন্যও অনেক সহযোগিতা হতো।[১৯৬] এ ধরনের ভাতা বিভাগ প্রথম চালু করেন আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। এ ব্যাপারে সকল ইতিহাসবিদ একমত।

আবু বকর রা.-এর ইনতেকালের পর মুসলিমদের আমির নিযুক্ত হন উমর ইবনে খাত্তাব রা.। আর রাষ্ট্র পরিচালনায় উমরের ছিল এক বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষত অর্থনৈতিক বিষয়ে। এ কারণেই তিনি ভাতার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করেন। অন্যদিকে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সহায়তায় খিলাফত যখন সম্প্রসারিত হচ্ছিল, তখন মুসলিমদের দখলে আসতে থাকে একের পর এক ভূখণ্ড এবং প্রচুর অর্থসম্পদ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উমর রা. চাচ্ছিলেন মানুষের মাঝে এসব অর্থসম্পদ সর্বোত্তম উপায়ে বণ্টন করতে। এর আগে আবু বকর রা. কে আগে মুসলিম হয়েছে আর কে পরে তা পার্থক্য না করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সমহারে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। একদল সাহাবি এতে আপত্তি করলে তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কারা আগে মুসলিম হয়েছে আর কারা পরে এ নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না, বরং এগুলো হলো মহান আল্লাহর অনুপম কৃপা ও

---

১৯৬. আবদুর রহমান আমিরা, *আল-ইসতিরাতিজিয়াতুল হারবিয়্যা ফি ইদারাতিল মাআরিকি ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৭৮।

অনুগ্রহ। এগুলো তাদের রিযিক। রেখে দেওয়ার চেয়ে এগুলো সমহারে তাদের মাঝে বন্টন করে দেওয়াই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে।[১৯৭]

তবে উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। বেতন-ভাতা নির্ধারণে তিনি কয়েকটি স্তর তৈরি করেন। যেমন, আল্লাহর রাসুলের বংশীয় লোকজন এক স্তরে। ইসলাম ও জিহাদে যারা অগ্রজ তারা এক স্তরে। যুদ্ধবিদ্যায় যারা দক্ষতা ও পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন তারা এক স্তরে। শত্রুপক্ষের কাছাকাছি সীমান্ত এলাকায় যারা বসবাস করেন তারা এক স্তরে। যারা দূরে অবস্থান করেন তারা এক স্তরে। এভাবে নানা শ্রেণি ও স্তর আবিষ্কার করে তাদের জন্য উপযুক্ত বেতন-ভাতা ধার্য করেন।[১৯৮]

উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে স্তর নির্ণয়ের কারণে এর জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ চালু করা জরুরি হয়ে পড়ে। সৈনিকদের অধিকারের সুষ্ঠু ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে এরকম অভূতপূর্ব ভাতা ও সৈনিক বিভাগের প্রচলন ছিল ইসলামি সভ্যতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা দেখতে পাই, সূচনালগ্ন থেকেই ভাতা বিভাগ অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং সুনিপুণভাবে পরিচালিত হয়। এমনকি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. রাষ্ট্রের ছোট বড় কাউকেই ভাতা প্রদান থেকে বঞ্চিত করেননি, এমনকি নবজাতক শিশুকেও তিনি ভাতা প্রাপ্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এ বিভাগের পরিচালনানীতি সময় ও কালের পরিক্রমায় আরও সুসংগঠিত ও আধুনিক হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পারস্য ও রোমান সৈনিকদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণ করা যোদ্ধাদেরও শেষ পর্যন্ত এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৯৯]

সাহাবিগণের মধ্যে অনেকে অধিক তাকওয়া অবলম্বন করার লক্ষ্যে ভাতাগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। তাদের একজন হলেন হাকিম ইবনে হাযাম রা.। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উদ্দেশে বলেছিলেন,

---

[১৯৭]. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ৪২।

[১৯৮]. ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮৩।

[১৯৯]. আকরাম আল-উমারি, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ*, পৃ. ৩৮০।

«يَا حَكِيْمُ، إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ»

হাকিম, এই (পার্থিব) অর্থসম্পদ খুব সবুজ-সতেজ ও মনোহর। অনীহা নিয়ে যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে লোভের বশবর্তী হয়ে আগ বেড়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।[২০০]

কোনো সন্দেহ নেই, এ ধরনের উপেক্ষানীতি ও লালসা-ত্যাগের ঘটনায় ওইসব উন্নত চরিত্রবান লোকদের পরিচয় পাওয়া যায়, যুগ যুগ ধরে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামি সভ্যতা যাদের সুনিপুণভাবে তৈরি করেছে।

উমাইয়া শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিখ্যাত শাসক মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. ছিন্নমূল, বাস্তুহারা ও সর্বস্বান্তদের জন্য এই বিভাগ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করেন।[২০১]

যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা ও ইসলামের বিজয়াভিযানে সফলতার স্বাক্ষর রাখা সৈনিক ও সেনাপতিদের জন্য এই বিভাগ থেকে বিশেষ ভাতা ও সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৮৩ হিজরিতে আফ্রিকা বিজয়ের পর সেনাপতি মুসা ইবনে নুসাইরকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান। তেমনই আযরাকি খারেজি সম্প্রদায় দমনে অসামান্য অবদান রাখা মুহাল্লাব ইবনে আবু সাফরা ও তার সঙ্গীদেরও বিশেষভাবে সম্মানিত করে তাদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেন আরেক বিখ্যাত শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তাদের ব্যাপারে হাজ্জাজ বলেন, তারাই প্রকৃত কার্যনির্বাহী। তারাই অর্থসম্পদ লাভের সবচেয়ে বেশি অধিকারী। তারাই সীমান্ত শহরগুলো রক্ষা করে এবং শত্রুদের কোণঠাসা করে রাখে।[২০২]

---

২০০. *বুখারি*, কিতাব : যাকাত, বাব : আল-ইসতিফাফ আনিল মুসাআলাতি, হাদিস নং ১৪০৩।
২০১. মুসআব যুবাইরি, *নাসাবু কুরাইশ*, পৃ. ১২৯।
২০২. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ১৩৫।

এই বিভাগের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শাসকগণ সবসময় জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকদের খুঁজে বের করে বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব দিতেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইমাম লাইস ইবনে সাদকে এই বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করেন আবু জাফর আল-মনসুর।[২০৩] এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ইসলামি রাজসভা জনগণের সুযোগ-সুবিধা ও উন্নতির কথা বিবেচনা করে সবসময় জ্ঞানী, যোগ্য, দক্ষ ও প্রশাসন পরিচালনায় অভিজ্ঞ লোকদেরকেই নিয়োগ দিতেন। অপরদিকে ভাতা ও সৈনিক বিভাগে কর্মরত লেখকের দায়িত্ব ছিল সকল প্রকার হিসাব, অশ্ব ও বাহনের প্রকার, সদস্যদের নাম, পদবি ও দায়িত্বের বিবরণগুলো সংরক্ষণ করা।[২০৪]

সৈনিক ও জনগণের বিষয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ফলে এই বিভাগের অনেক প্রধানের পদোন্নতি ঘটে। এমনকি তাদের অনেকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদেও উন্নীত হন। আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা 'কারামেতা' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৎকালীন সৈনিক ও ভাতা বিভাগের প্রধান মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমানকে সেনা প্রধানের দায়িত্ব দেন খলিফা মুকতাফি (মৃ. ২৯৫ হি.)।[২০৫]

সরকারি বিভিন্ন নথি সংরক্ষণে এই বিভাগের ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব। যেমন, মানুষের মৃত্যুর সন-তারিখ সংরক্ষণ করা। এই বিভাগের সংরক্ষিত তালিকা থেকে অনেক সৈনিক ও মনীষীর মৃত্যুর তারিখ জানা যায়, যা অন্যত্র মৃত্যুবরণের কারণে আর কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। সে হিসেবে এই বিভাগের ভূমিকা ছিল খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি সংরক্ষণের মতো। একবার শামের হিমসে এসে এক শাইখ স্থানীয় এক লোকের সঙ্গে কোনো এক বিষয় নিয়ে আলোচনারত ছিলেন। আলোচনার একপর্যায়ে বিখ্যাত মুজাহিদ খালেদ ইবনে মিদান আল-কুলায়ির মৃত্যু সন নিয়ে কথা ওঠে। স্থানীয় সেই লোকটি ছিল মুজাহিদ খালেদের খুব কাছের ব্যক্তি। সেই শাইখ দাবি করেন যে, ১০৮ হিজরি সনে আরমেনিয়ার যুদ্ধে মুজাহিদ খালেদ ইবনে মিদান আল-কুলায়ির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু মুজাহিদ খালেদের স্বজনদের

---

২০৩. ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ৫০, পৃ. ৩৬৭।
২০৪. ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি, *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু*, খ. ২, পৃ. ৩৩১।
২০৫. মাকরিযি, *ইত্তিআযুল হুনাফা*, পৃ. ৫১।

বক্তব্য, তার ইনতেকাল হয়েছে ১০৪ হিজরিতে। বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য তারা সৈনিক ও ভাতা বিভাগের শরণাপন্ন হলে সেখানে সংরক্ষিত নথি থেকে প্রমাণিত হয় আসলেই তিনি ১০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[২০৬]

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, স্পেনে উমাইয়া শাসনামলে কবি ও ছড়াকারদেরও এই বিভাগ থেকে বিশেষ ভাতা দেওয়া হতো। কাব্যের মান অনুযায়ী তাদের জন্য ভাতা নির্ধারিত হতো। একবার হাজিব মনসুর ইবনে আবু আমিরের প্রশংসায় চমৎকার ভাষাশৈলী ব্যবহার করে কিছু কবিতা রচনা করেন কবি আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসতালি। কিন্তু তার ওই কবিতা আরেক বিখ্যাত কবি সাইদ ইবনুল হাসান আন্দালুসির রচিত কবিতার সাথে সাজ্ঘর্ষিক হওয়ায় তার কবিতা নিয়ে লোকমুখে কুধারণা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তার প্রতি অপবাদের তির ছুড়ে দেয়। মনসুর ইবনে আমিরের আমলে কবিদের ভাতা নির্ধারণের জন্য আলাদা বিভাগ ছিল। কবিদের স্তর অনুযায়ী সেখান থেকে তাদের ভাতা মিলত। তো কুধারণায় পড়ে অনেকে মনসুরের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করে যে, এই লোকটি কাব্যচোর, অন্যের কবিতা আবৃত্তি করে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আছে তার। ভাতা বিভাগ থেকে কানাকড়িও পাওয়ার যোগ্য নয় সে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে ডেকে পাঠান মনসুর। দিনটি ছিল ৩৮২ হিজরি সনের ৩ শাওয়াল। এরপর মনসুর তাকে কবিতা আবৃত্তি করতে বললে তিনি একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে মনসুরের সামনে তার কাব্যপ্রতিভা প্রমাণ করেন। ফলে সকল অপবাদের অবসান ঘটে। মনসুর তাকে নগদ একশ দিনার পুরস্কার প্রদান করেন এবং ভাতা বিভাগ থেকে তার জন্য মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করে কবি হিসেবে তাকে বরণ করে নেন।[২০৭]

ইবনে খালদুনের বর্ণনা অনুযায়ী মামালিক সাম্রাজ্যে ভাতা বিভাগের প্রধানকে সেনাবাহিনী পর্যবেক্ষক উপাধিতে ডাকা হতো। বোঝা যায়, মামালিক বংশের রাজত্বকালে এই বিভাগের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

---

২০৬. ইবনুল আদিম, *বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালব*, খ. ৩, পৃ. ২৫৩।
২০৭. হুমাইদি, *জাযওয়াতুল মুকতাবাস*, পৃ. ৪০।

মোটকথা, ভাতা ও সৈনিক বিভাগ ছিল সমগ্র ইতিহাসজুড়ে ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য প্রতীক। এই বিভাগের মাধ্যমেই ইসলামি রাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণির বেতন-ভাতা ও সম্মানী নির্ধারণ করে সুনিপুণভাবে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুমহান দায়িত্ব পালন করেছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩. ওয়াকফ বিভাগ

বিশ্বনবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমাজসেবা, জনকল্যাণমূলক কাজ এবং আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠায় পাল্লা দিয়ে এগিয়েছেন মুসলিমগণ। এর মধ্যে ওয়াকফ ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলিম জনসাধারণের বেশি উপকারে আসা উদ্যোগসমূহের একটি। ওয়াকফ ব্যবস্থা ছিল ওই ভিত্তি প্রস্তরের মতো, ইসলামি সভ্যতার পুরো ইতিহাসজুড়ে প্রতিটি সেবামূলক সংগঠন যা সুষ্ঠুরূপে পালন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম সমাজের জাগরণ ও উন্নতি সাধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। সভ্যতা বিনির্মাণে এবং ইসলামি ওয়াকফ ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে মুসলিম মানসে যে মূলমন্ত্র কাজ করেছিল এবং বিশ্বনবীর যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলিম হৃদয়ে যে প্রচেষ্টা নিজ গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলে আসছিল, চিন্তাশীল মাত্রই তার মূল রহস্য জেনে অবাক হবেন। তা ছাড়া এ কথাও দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, ওয়াকফ ব্যবস্থা মানবতার কল্যাণ সাধনে গঠিত নির্ভেজাল একটি ইসলামি উদ্যোগ, ইসলামি সভ্যতার অভ্যুদয়ের প্রাক ও সমকালে অন্য কোনো সভ্যতায় এরকম নজির আছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

প্রথমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল স্তরের মুসলিমের জন্য ওয়াকফ ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ইসলামে প্রথম ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল সাহাবি মুখাইরিকের[২০৮] জমিসমূহ। *তাবাকাতে ইবনে সাদ* গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযির বরাতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মদিনার সাতটি বাগান

---

২০৮. পুরো নাম মুখাইরিক আন-নাযরি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন একজন বড় ইহুদি আলেম ও বিশিষ্ট শিল্পপতি। পরবর্তী সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার সমুদয় অর্থসম্পদ বিশ্বনবীর জন্য ওসিয়ত করে যান। হিজরি তৃতীয় সনে সংঘটিত ঐতিহাসিক ওহুদের যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। তার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন, ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা*, খ. ৬, পৃ. ৫৭।

ওয়াকফ সম্পত্তিভুক্ত ছিল। সেগুলো হলো যথাক্রমে, আল-আওয়াফ, আস-সাফিয়া, আদ-দাল্লাল, আল-মাইসাব, বারকা, হাসনা এবং মাশরাবা উম্মে ইবরাহিম। ইবনে কাব বলেন, এরপর মুসলিমগণ তাদের পুত্র ও পৌত্রদের নামে সেগুলো ওয়াকফ করে দেন।[২০৯]

আল্লাহর রাসুলের জীবদ্দশায় এবং তার ওফাতের পর অধিকাংশ সাহাবি নিজেদের নামে কিছু না কিছু ওয়াকফ করে যান। এর মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাবের ওয়াকফ, উসমান ইবনে আফফানের ওয়াকফ, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর ওয়াকফ, আলি ইবনে আবু তালিবের ওয়াকফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল ওয়াকফ সম্পত্তি জনসাধারণের সেবা ও কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ওয়াকফনামার বিবরণে লেখেন যে, তার এই ওয়াকফ সম্পত্তির লভ্যাংশ দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, মুক্তিকামী দাস, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অতিথি এবং মুসাফির-ভিক্ষুকদের জন্য ব্যয় করা হবে। তবে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বশীল ব্যক্তি সুষ্ঠু উপায়ে তা থেকে উপকৃত ব্যক্তি হতে পারবে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে তা থেকে যেকোনো বন্ধুকেও খাওয়াতে পারবে।[২১০]

ওয়াকফকারীর মত অনুযায়ী ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পিত হয় উপকারভোগীদের ওপর, অথবা নির্দিষ্ট কমিটির ওপর। তবে প্রথম দিকে ইসলামি রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ সেখানে ছিল না। এরপর উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে কাযি তওবা ইবনে নামির আল-হাদরামি[২১১] মিশরের বিচারক পদে নিযুক্ত হলে তিনি লক্ষ করেন, ওয়াকফ সম্পত্তি ওয়াকফকারীর পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বশীলদের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ফলে সম্পত্তির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত ভোক্তা শ্রেণি।

---

২০৯. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৫০৩।

২১০. *বুখারি*, কিতাবুশ শুরুত, বাব : আশ-শুরুত ফিল-ওয়াকফ, হাদিস নং ২৫৮৬, *মুসলিম*, কিতাবুল ওয়াকফ, বাব : আল-ওয়াকফ, হাদিস নং ১৬৩২।

২১১. পুরো নাম আবু মিহজান তওবা ইবনে নামির ইবনে হারমাল আল-হাদরামি। তিনি মিশরের বিচারক ছিলেন। তার সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেন, স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ নিজেদের বলে চালিয়ে দেবে বা উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবে এ আশঙ্কায় ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারিভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা তিনিই প্রথম চালু করেন। ১২০ হিজরি সনে তিনি ইনতেকাল করেন। আরও জানতে দেখুন, ইবনে হাজার, *তাজিলুল মানফাআতি*, পৃ. ৬১।

যার কারণে ওয়াকফের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করতে তিনি নিজে ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। এর ফলাফলও হাতেনাতে পায় মিশরের জনগণ। কাযি তওবার ইনতেকালের পরপরই ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মিশরে স্বতন্ত্র সরকারি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রধান হিসেবে থাকতেন একজন বিচারক। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে এ প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটলে মিশরেই তা পূর্ণতা লাভ করে। এভাবেই একজন বিচারক সবসময় এ বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে থেকে ওয়াকফের শর্তাবলি অনুযায়ী সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতেন। তবে ওয়াকফকারীর শর্তমতে সম্পত্তির কোনো মুতাওয়াল্লি নির্দিষ্ট করা থাকলে তিনিই বিচারকের সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা নিয়ে প্রকল্প দেখাশোনা করতেন।[২১২]

হিজরি চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এ সময় আলাদা মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করে ওয়াকফ প্রকল্প দেখাশোনার সকল দায়দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হতো। তিনিই প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। ওয়াকফ বিভাগের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পত্তির লভ্যাংশ গরিব-মিসকিন ও ভোক্তাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। ওয়াকফ বিভাগ স্বতন্ত্র একটি বিভাগ হওয়ার পেছনে এটাই ছিল কারণ। এই বিভাগ নতুন হওয়া সত্ত্বেও দিন যতই গড়িয়েছে এ বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভাগীয় প্রধানের ততই পদোন্নতি ঘটেছে। এমনকি তাদের অনেকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলেও ইতিহাসে পাওয়া যায়। মিশরে প্রধান বিচারপতির পদকেও ছাপিয়ে যায় ওয়াকফ বিভাগীয় প্রধানের পদ। এরকম ঘটনাও প্রসিদ্ধ আছে, ঈদ বা জাতীয় উৎসবের মৌসুমে জনগণের পক্ষ থেকে সুলতানকে শুভেচ্ছা জানানোর অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণের জন্য মিশরের প্রধান বিচারপতি একবার তার সেবককে বলে পাঠালেন, যাও, রাজদরবারের গেটে দাঁড়িয়ে থাকো। ওয়াকফ বিভাগীয় প্রধান সুলতানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেলে আমাকে এসে সংবাদ দিয়ো। এরপর ঠিকই ওয়াকফ বিভাগীয় প্রধান সুলতানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় হলে প্রধান বিচারপতি এসে সুলতানের প্রতি অভিনন্দন ব্যক্ত করেন। এ ঘটনার

---

২১২. আল-কিন্দি, *আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*, পৃ. ৩৯০; মুহাম্মাদ আবু যাহরা, *মুহাদারাত ফিল-ওয়াকফ*, পৃ. ১২।

কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে *লুমাউল কাওয়ানিনিল মুদিয়্যা ফি দাওয়াবিনিদ দিয়ারিল মিসরিয়্যা* গ্রন্থকার নাবুলুসি[২১৩] বলেন, রাজদরবারে দুজন প্রভাবশালী রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্বের সমাবেশ এড়াতেই তিনি এ ঘটনার জন্ম দেন। যাই হোক, রাজদরবারে ওয়াকফ বিভাগের প্রধানের স্থান ছিল ঠিক সুলতানের বাঁ পাশেই। কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে তার ছিল অসামান্য গুরুত্ব এবং তিনি ছিলেন উন্নত মর্যাদার অধিকারী। মাকরিযি বলেন, ওয়াকফ বিভাগের প্রধান সরাসরি সকল সরকারি বিভাগসমূহে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখতেন। আর সেখানে কেবল একনিষ্ঠ ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মুসলিম লেখকদেরকেই কাজের সুযোগ দেওয়া হতো।[২১৪]

তবে উসমানীয় খিলাফতের সময় সম্পূর্ণ নতুন ওয়াকফ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। যেসব জমিতে ওয়াকফ ভবন নির্মাণ করা হবে এবং যে অর্থসম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় না এবং ব্যবসার জন্য নির্ধারিত নয় তবে তা প্রবৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করা যায় এবং দায়িত্বশীলগণ তা ভাড়া দিয়ে অথবা তা থেকে অর্জিত লভ্যাংশ থেকে উপকৃত হন এরকম আধুনিক নিয়মনীতি এবং ওয়াকফ ভূমির ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত নীতিমালা ওই নতুন ওয়াকফ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়। আজ পর্যন্ত অনেক আরবরাষ্ট্রে ভূমির সেই বিভাজন ব্যবস্থা ও নীতিমালা পুরোপুরি অনুসরণ করা হচ্ছে। উসমানীয় শাসনতন্ত্রের প্রণয়ন করা ওয়াকফ-বিষয়ক আরেকটি ব্যবস্থা হলো 'নির্দেশনা ও দায়িত্ব প্রদান বিভাগ'। এই বিভাগের কাজ ছিল অলাভজনক ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সঠিক পেশা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা। ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লি হওয়ার জন্য আগ্রহীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা। আগ্রহীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ধর্মীয় পেশা প্রাধান্য পেত। যেমন মসজিদের ইমাম হওয়া, মুয়াজ্জিন হওয়া, খতিব হওয়া, ধর্মীয় শিক্ষক হওয়া ইত্যাদি। এভাবেই উসমানীয়

---

২১৩. পুরো নাম উসমান ইবনে ইবরাহিম নাবুলুসি। অপর নাম ফখরুদ্দিন। আইয়ুবি সাম্রাজ্যের অন্যতম আমির। সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুব আন-নযর ৬৩২ হিজরি সনে মিশরের দিওয়ানে তাকে অধিষ্ঠিত করেন। এই সুলতানের আদেশেই তিনি *লুমাউল কাওয়ানিনিল মুদিয়্যা ফি দাওয়াবিনিদ দিয়ারিল মিসরিয়্যা* রচনা করেন। ৬৮৫ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন। যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২০২।

২১৪. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয*, খ. ২, পৃ. ২৯৫; কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৩, পৃ. ৫৬৭; নাবুলুসি, *লুমাউল কাওয়ানিনিল মুদিয়্যা ফি দাওয়াবিনিদ দিয়ারিল মিসরিয়্যা*, পৃ. ২৮; সামাররায়ি, *আল-মুআসসাসাতুল ইদারিয়্যা ফিদ-দাওলাতিল আব্বাসিয়া*, পৃ. ২৯৮-৩০৭।

খিলাফতের সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পুরো মুসলিম-বিশ্বজুড়ে অব্যাহত আছে এই ওয়াকফ ব্যবস্থা। অবশেষে ওয়াকফের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয়ও গঠন করা হয়।[২১৫]

আর ওয়াকফ ব্যবস্থাপনায় স্থান পায় গুরুত্বপূর্ণ সব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। মসজিদ নির্মাণ, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল নির্মাণ, সড়ক ও পথ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, অতিথি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠাসহ ধর্মীয় ও মানবিক দিক থেকে ইসলামি সমাজের চাহিদা পূরণে কার্যকর এরকম অনেক প্রকল্পই ছিল ওয়াকফ ব্যবস্থার আওতাধীন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ওয়াকফ ব্যবস্থার অসামান্য অবদান আমাদের চোখের সামনেই। আর মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজারো মসজিদ প্রতিষ্ঠার পেছনে ওয়াকফকারীদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, মুসলিমদের জন্য জামাতে নামায আদায়ের সুব্যবস্থা করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন এবং পরকালে অফুরন্ত প্রতিদান লাভ।

শিক্ষাঙ্গনে আমরা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াকফ ব্যবস্থায় নির্মিত শত শত মাদরাসা দেখতে পাই, যা হাজার বছর ধরে বিদগ্ধ মুসলিম মনীষী তৈরি করে বিশ্ব দরবারে মুসলিমজাতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছে, যার সওয়াব ওয়াকফকারীগণ অবিরাম পেয়ে আসছেন এবং পেতে থাকবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়াকফ ব্যবস্থার পুনর্জাগরণে অসামান্য অবদান রাখা সব থেকে বিখ্যাত সুলতান হলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.। মিশরে তার ওয়াকফকীর্তির অন্যতম হলো, তিনি কায়রোতে অবস্থিত ইমাম হুসাইন ওয়াকফ আলি স্কয়ার হিসেবে খ্যাত সেই পবিত্র স্থানের পাশেই একটি বড় মাদরাসা নির্মাণ করে তা ওয়াকফ করে দেন। মিশরের জনগণের কল্যাণে নিবেদিত 'দারে সায়িদিস সুআদা' নামে একটি সর্বজনীন খানকা নির্মাণ করে তাও ওয়াকফ করে দেন। 'দারে আব্বাস ইবনুস সাল্লার' নামে একটি হানাফি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তা ওয়াকফ করে দেন। মিশরে শাফিয়ি মাযহাবের ওপর পড়াশোনার জন্য তিনি 'যাইনুন নাজ্জার' নামে বিখ্যাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তা ওয়াকফ করে যান। তা ছাড়া মালেকি

---

[২১৫]. মুহাম্মাদ আবু যাহরা, *মুহাদারাত ফিল-ওয়াকফ*, পৃ. ২৬-২৭; ইকরামা সাবরি, *আল-ওয়াকফুল ইসলামি*, পৃ. ২১-২২।

মাযহাবের ওপর পড়াশোনা করার জন্যও তিনি মিশরে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২১৬]

সামাজিক অঙ্গনে ওয়াফক ব্যবস্থার অবদান হিসেবে পথঘাট নির্মাণ, দরিদ্র-নিকেতন ও অভাবগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ গরিব মিসকিনদের জন্য আরও অনেক ওয়াকফ প্রক্রিয়া চলমান ছিল, যা ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রচলিত যৌথ সামাজিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমির নুরুদ্দিন মাহমুদ আলেপ্পোসহ সমগ্র মুসলিমবিশ্বে অসুস্থ, এতিম ও দরিদ্রদের জন্য নানাবিধ ওয়াকফ প্রকল্পের সূচনা করেন। পবিত্র নগরী মক্কায় একেবারে হারাম শরিফের কাছে নির্মিত বিরাট বাগানটি ৬৯৭ হিজরি সনে দরিদ্র, মিসকিন, মুসাফির ও হাজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন শাইখ আযুদ্দৌলা রাইহানুন্নাদা শিহাবি, যাকে সবাই হারাম শরিফের সেবকদের শাইখ বলে ডাকেন।[২১৭]

মামলুকি রাজবংশের সুলতান যাহের বারকুক জাবাল দুর্গে[২১৮] বসবাসরত এতিম শিশুদের জন্য কুরআন পাঠ ও হিফয করার একটি বড় মক্তব প্রতিষ্ঠা করে তা ওয়াকফ করে দেন। ওই দুর্গ থেকেই মিশর ও শামসহ সুলতানের অনুগত সকল অঞ্চল শাসন করা হতো। পূর্ববর্তীকালের বাদশা, সুলতান, ধনী ও মুসলিম সমাজসেবকগণ ওয়াকফের কাজে কী পরিমাণ অগ্রগামী ছিলেন, তা এই উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট। এসব ওয়াকফ প্রকল্প মুসলিম সামাজিক জীবনের মানোন্নয়নে যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সিরিয়ার দামেশকেও এরকম অনেক ওয়াকফ প্রকল্প প্রচলিত ছিল যা ইসলামের সৌন্দর্য ও সৌহার্দ্যের প্রতীককে সমুন্নত করেছে। বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা বড় আশ্চর্য ও বিস্ময় ভরা কণ্ঠে সেই ওয়াকফ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দামেশকে আওকাফ প্রকল্পের সংখ্যা এবং এ খাতে ব্যয়ের বাজেট হিসাব করে শেষ করার মতো নয়। এর মধ্যে একটি ছিল অপারগ হাজিদের জন্য হজের ব্যয়ভার বহন করা। সেই তহবিল থেকে প্রয়োজন অনুপাতে প্রত্যেক

---

[২১৬]. ইয়াফেয়ি, *মিরআতুল জিনান ওয়া-ইবরাতুল ইয়াকযান ফি মারিফাতি হাওয়াদিসিয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৩৫১।

[২১৭]. ইবনুদ দিয়া, *তারিখু মাক্কাতাল মুকাররামা ওয়াল-হারামিশ শারিফ*, পৃ. ২৪৭।

[২১৮]. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ৪৪৮।

হাজিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হতো। অন্য একটি প্রকল্প হলো, দরিদ্র পরিবারের বিয়ের উপযুক্ত মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করে প্রসাধনী ও আসবাবপত্রসহ স্বামীর হাতে তুলে দেওয়া। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে ছিল বন্দিমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। দুঃস্থ, অভাবী, পথিক, মুসাফিরদের জন্য সহযোগিতা প্রদান, এই প্রকল্প থেকে তাদের জন্য অন্নবস্ত্র ও নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় পাথেয়ের ব্যবস্থা করা হতো। আরও ছিল সড়ক ও ফুটপাত সংস্কার। তৎকালীন দামেশকের প্রধান সড়কগুলোর দুপাশে পথচারীদের হাঁটার জন্য ফুটপাতের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া দামেশকে আরও অনেক সেবামূলক কাজ প্রচলিত ছিল ওয়াকফ বিভাগের তত্ত্বাবধানে।[২১৯] যার সুফল দামেশকে বসবাসরত সকল মুসলিম-অমুসলিম সমানভাবে ভোগ করত।

ইবনে বতুতার বর্ণনা করা আরেক বিস্ময়কর বিবরণ হলো পাত্র মেরামত ওয়াকফ প্রকল্প। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, একবার আমি দামেশকের একটি গলি পার হওয়ার সময় দেখি, অল্পবয়স্ক একজন দাসের হাত থেকে চীনের তৈরি দামি একটি থালা মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। তা দেখে আশপাশের মানুষেরা জড়ো হলে একজন বলতে থাকেন, বাসনের এই ভাঙা অংশগুলো নিয়ে গিয়ে পাত্র মেরামত ওয়াকফ বিভাগের দায়িত্বশীলকে দেখাও। এরপর দাস সেগুলো তাড়াতাড়ি উঠিয়ে ওই বিভাগে যায়। সঙ্গে যায় ওই লোকটিও। ওখানে গিয়ে বাসনের ভাঙা অংশগুলো দেখালে এরকম পাত্র কেনার মতো মূল্য সে দিয়ে দেয়। ফলে ওই ভৃত্য গিয়ে অনুরূপ নতুন আরেকটি বাসন কিনে নেয়। এটি খুব সুন্দর একটি উদ্যোগ। কারণ ভৃত্য হওয়ায় দামি একটি বাসন ভাঙার অপরাধে মনিব অবশ্যই তাকে গালমন্দ বা প্রহার করত, এতে বালকটি কষ্ট পেত। এরকম পাত্র মেরামত ওয়াকফ প্রকল্পের মতো সুন্দর উদ্যোগ মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়। যারা এরকম অসাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ করে সমাজসেবা করেছেন তাদের আল্লাহ ভরপুর প্রতিদান দিন সবসময়, আমরা এই দোয়াই করি।[২২০]

---

২১৯. ইবনে বতুতা, *রিহলাতু ইবনে বতুতা*, পৃ. ৯৯।

২২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

এমনকি একাধিক ইসলামি রাষ্ট্রে বিয়েশাদিতে কনের সাজগোজের জন্য দামি প্রসাধনী ও স্বর্ণালংকার ভাড়া দেওয়ার মতো ওয়াকফ প্রকল্পগুলোও ছিল উল্লেখযোগ্য। এতে করে বরকনে উভয়ের আনন্দ-উৎসবে ভিন্ন মাত্রা যোগ হতো। এরকম দামি অলংকার পরিয়ে স্ত্রীকে ঘরে তোলার মতো সাধ ও সাধ্য যাদের নেই, সেইসব দরিদ্র, অসহায় ও গরিবের জন্যই ছিল এই ওয়াকফ প্রকল্পের ব্যবস্থা। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে আবার সেগুলো ওয়াকফ কার্যালয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। এভাবেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরমানন্দে বিয়ের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে উপলক্ষ্যটি সুখময় ও স্মৃতিবহ করে তুলত।[২২১]

তিউনিসিয়ায় ছিল দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য খতনার ওয়াকফ বিভাগ। খতনা করিয়ে শিশুকে নতুন পোশাক ও কিছু দিরহাম উপহার দেওয়া হতো। সেখানে রমযান মাসে বিনামূল্যে মিষ্টি বিতরণও ছিল একরকম ওয়াকফ উদ্যোগ। বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে তিউনিসিয়ার সমুদ্রতীরে প্রচুর পরিমাণ মাছ ভেসে উঠত। এ কারণে সেখানে এক ধরনের ওয়াকফ প্রচলন ছিল, যার লভ্যাংশ দিয়ে প্রচুর পরিমাণ মাছ কিনে বিনামূল্যে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হতো। আরও একটি আশ্চর্যকর ওয়াকফের ব্যবস্থা ছিল সেখানে, কারও কাপড়ে প্রদীপের তেল পড়ে গেলে কিংবা কোনো কিছুর আঁচড়ে কাপড় ছিঁড়ে গেলে ওয়াকফ অফিসের শরণাপন্ন হলে সেখান থেকে কাপড়ের মূল্য দিয়ে দেওয়া হতো, তা দিয়ে সে অনায়াসে নতুন কাপড় কিনতে পারত।[২২২]

'দারুদ দুক্কা' নামে আরও আশ্চর্যকর এক ওয়াকফ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল মরক্কোর মারাকেশ শহরে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদবশত রাগ করে যেসব নারী ঘর থেকে বের হয়ে যেত, তারা এই সংগঠনে এসে আশ্রয় নিতে পারত। স্বামীর সঙ্গে তাদের বিবাদ না মেটা পর্যন্ত যতদিন ইচ্ছা তারা সেখানে বিনামূল্যে পানাহার ও অবস্থান করতে পারত।

অপরদিকে হিজরি প্রথম শতাব্দী থেকেই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ওয়াকফ ব্যবস্থার ছিল নানা উদ্যোগ। প্রথমে বড় আকারে চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক। তিনি

---

২২১. শাকিব আরসালান, *হাদিরুল আলামিল ইসলামি*, খ. ৩, পৃ. ৮।
২২২. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

দামেশকে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে তা অসুস্থদের ফ্রি চিকিৎসার জন্য ওয়াকফ করে দেন।[২২৩] তা ছাড়া কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসায় তিনি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে তাদের জন্য সেবা ফ্রি করে দেন। কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে যেন চিকিৎসার জন্য কারও কাছে হাত পাততে না হয়, সেই ব্যবস্থা তিনি নিশ্চিত করেন। পুরো একটি শহর তাদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য ওয়াকফ করে দেন। তা ছাড়া প্রত্যেক অবসরপ্রাপ্ত ও দুর্বল বয়োবৃদ্ধের জন্য তিনি একজন করে সেবক এবং প্রত্যেক অন্ধ প্রতিবন্ধীর জন্য একজন করে গাইড নিযুক্ত করেন।[২২৪]

বাগদাদে ওয়াকফসূত্রে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলোর অন্যতম ছিল আল-আযুদি হাসপাতাল। বুওয়াইহি রাজবংশের অন্যতম শাসক আযুদুদ্দৌলা ৩৬৬ হিজরি/৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ শহরের পশ্চিমাংশে তা নির্মাণ করেন। এই হাসপাতালে বিভিন্ন রোগচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চব্বিশজন ডাক্তার সবসময় কর্মরত থাকতেন।[২২৫] হাসপাতালটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আযুদুদ্দৌলা বহুবিধ প্রবৃদ্ধিমূলক প্রকল্প ওয়াকফ করেন। এখানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক বিনামূল্যে চিকিৎসা পেত। রোগীরা এখানে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও বিভিন্ন সেবা লাভ করত। যেমন নতুন পোশাক, স্বাস্থ্যসম্মত বাহারি খাবার, জরুরি ওষুধ ইত্যাদি। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি পৌঁছার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পাথেয় ও পথখরচও দিয়ে দেওয়া হতো তাদের।[২২৬]

হাসপাতালগুলোতে এত উন্নত, আরামদায়ক ও বিলাসবহুল স্বাস্থ্যসেবা ও দামি খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হতো যে, অনেকে এগুলো ভোগ করার জন্য অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হতো। কোনো কোনো ডাক্তার তাদের এই বাহানা দেখে কখনো কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতেন। বিশিষ্ট

---

২২৩. যাহরানি, *নিযামুল ওয়াকফ*, পৃ. ২৪৮।

২২৪. ইবনুল আসির, *আল-কামিল*, খ. ৪, পৃ. ২৯২; ইবনে দুকমাক, *আল-জাওহারুস সামিন*, পৃ. ৬৫।

২২৫. এর দ্বারা বোঝা যায় হাসপাতালটি বিশাল আয়তনের ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।-অনুবাদক

২২৬. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ৬৭; মুহাম্মাদ হুসাইন আলি, *তারিখুল আরবি ওয়াল-মুসলিমিন*, পৃ. ১৯৬; কাদরি হাফেজ তুকান, *আল-উলুমু ইনদাল আরাবি ওয়াল-মুসলিমিন*, পৃ. ৩২-৩৪।

ইতিহাসবিদ খলিল ইবনে শাহিন যাহেরি[২২৭] বর্ণনা করেন, ৮৩১ হিজরি/১৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে একবার তিনি দামেশকের একটি হাসপাতাল দেখতে যান। তার বর্ণনামতে, এরকম বিলাসবহুল চিকিৎসাকেন্দ্র তিনি পৃথিবীর আর কোথাও দেখেননি। সেখানে তিনি লক্ষ করেন, এক লোক অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তিন দিন পার হওয়ার পর ডাক্তার তার চিকিৎসাপত্রে লিখে দেন, মেহমান কখনো তিন দিনের বেশি অবস্থান করেন না।[২২৮]

এরকম নানা আয়োজন আর বিচিত্র সব উদ্যোগের কারণে ইসলামি সভ্যতায় অনন্য হয়ে ওঠে এই ওয়াকফ ব্যবস্থা। ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য শুধু ওয়াকফ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি, যা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে কাজ করে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কোনো সভ্যতাই এরকম সংহতি, পরোপকার ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনসেবায় অংশগ্রহণের নজির স্থাপন করতে পারেনি।

---

২২৭. খলিল ইবনে শাহিন যাহেরি (৮১৩-৮৭৩ হি./১৪১০-১৪৬৮ খ্রি.)। ইবনে শাহিন নামে তিনি পরিচিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদগ্ধ একজন গবেষক। তার অনেক গ্রন্থ মিশরে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে *যুবদাতু কাশফিল মামালিক ওয়া বায়ানিত তুরুকি ওয়াল-মাসালিক* অন্যতম। তার সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ৩১৮।

২২৮. ইকরামা সাইদ সাবরি, *আত-তামরিয ফিত-তারিখিল ইসলামি*, পৃ. ২৯-৩০।

৪. চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ডাক ও যোগাযোগ বিভাগ

ডাক ও যোগাযোগের সকল উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে অনেক গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে সেজন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান নিশ্চিত করেছে ইসলামি সভ্যতা। ইসলামি রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল সময়ের দাবি, যা খিলাফতের রাজধানীর সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য শহরের, বিশেষ করে খলিফার সাথে প্রাদেশিক গভর্নরদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেজন্য পুরো একটি বিভাগ এবং স্বতন্ত্র একটি কার্যালয় গঠন করা হয়, যা ইসলামি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে এবং বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে সদা সতর্ক ও অবগত থাকতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ইসলামি সভ্যতা যে উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেছিল, তারই উজ্জ্বল প্রমাণ এই ডাক ও যোগাযোগ বিভাগ।

আরবি বারিদ শব্দের অর্থ ও তার আধুনিকায়নঃ

بريد শব্দের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে ঠিক, তবে এটি যে নিখাদ আরবি শব্দ এ নিয়ে কারও মাঝে বিরোধ নেই। এ শব্দের অনেকগুলো অর্থের একটি হলো : দূত, বার্তাবাহক। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে :

«اَلْحُمّٰى بَرِيْدُ الْمَوْتِ»

জ্বর হলো মৃত্যুর দূত।

অর্থাৎ জ্বর মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে, জীবনাবসানের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজেয বলেন,

«رَأَيْتُ لِلْمَوْتِ بَرِيْدًا مُبْرَدًا»

আমি মৃত্যুর বার্তাবাহককে আসতে দেখেছি।

সিংহের আগমনি বার্তা দেয় বিধায় সারসপাখিকেও আরবিভাষীগণ 'বারিদ' বলে থাকেন।[২২৯]

গাধা বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যারা বার্তা আদান-প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন, তাদেরকেও 'বারিদ' বলা হয়। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيْدًا، فَابْعَثُوْهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الِاسْمِ»

আমার কাছে কোনো বার্তাবাহক পাঠানোর সময় তোমরা সুদর্শন ও সুন্দর নামের অধিকারী কাউকে পাঠিয়ো।[২৩০]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

«إِنِّي لَا أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُرْدِ»

আমি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না এবং কোনো দূতকে গ্রেফতার করি না।[২৩১]

যামাখশারি রহ. বলেন, بُرْدٌ শব্দের راء-তে সাকিন করে পড়লে সেটি بَرِيْدٌ শব্দের বহুবচন ধরা হবে। তখন অর্থ হবে বার্তাবহক। رُسُلٌ শব্দটির سين-এ যেমন পেশ ও সাকিন উভয়টাই চলে, তেমনই بَرِيْدٌ শব্দের বহুবচন بُرْدٌ-এর راء-তে পেশ ও সাকিন উভয়টাই চলবে।[২৩২]

এ কারণেই পত্রবাহক জন্তুকেও বলা হয় বারিদ। তানুখি বলেন, পত্র বহন ও পৌছানোর দায়িত্বটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। কারণ একজন-দুজন নয়, পুরো একটি সংঘবদ্ধ দলকে কাজ করতে হতো এর জন্য। দরকার হতো দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার বহু সরঞ্জাম ও ভ্রমণ পাথেয়ের। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল পত্রবাহকদের চলাচলের পথগুলো সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে নিরাপদ রাখা। চোর-ডাকাত ও শত্রুদের আনাগোনা থেকে

---

২২৯. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, মাদ্দাহ, برد, খ. ৩, পৃ. ৮৪।

২৩০. তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৭, পৃ. ৩৬৭। ইবনে হাজার আসকালানি, *আল-মাতালিবুল আলিয়া*, খ. ১১, পৃ. ৬৮৫ (২৬৮৫)।

২৩১. আবু দাউদ, হাদিস নং ২৭৫৮। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৮৭৭।

২৩২. যামাখশারি, *আল-ফায়িক ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল-আসার*, খ. ১, পৃ. ৪০৫; ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, মাদ্দাহ, برد, খ. ৩, পৃ. ৮৪।

তা সুরক্ষিত রাখা। গোয়েন্দাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। কারণ সীমান্তরক্ষীদের থেকে আসা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র তাদেরকেই বহন করতে হতো। প্রাদেশিক অঞ্চল থেকে আসা বার্তাগুলো তাদেরকেই পুরোপুরি আমানতের সাথে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত পথ ধরে শাসকদের কাছে পৌঁছে দিতে হতো। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্বাচন করতে হতো দ্রুতগামী বাহন ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের। পত্র বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ শাসকদের কাছে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দাদের মর্যাদা পেতেন। কারণ শাসকগণ যদি তাদের প্রতি শৈথিল্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহলে কিছুতেই বন্ধুমহল ও শত্রুপক্ষের সার্বিক খবরাখবর তিনি রাখতে পারবেন না। এসব ব্যক্তিবর্গের হাত ধরেই তার হস্তগত হতো পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সকল সংবাদ। ডাক যোগাযোগ বিষয়ে অনীহা প্রদর্শন করলে শাসকদের রাজনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং টের পাওয়ার আগেই তারা শত্রুপক্ষের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়বে।[২৩৩]

ডাকবিভাগের প্রধান দায়িত্বশীলের কাজ হতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিভাগের কাছে সকল সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করা। তারা ছিলেন সাংবাদিকের ভূমিকায়। রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শাসক শ্রেণির কাছে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের সকল অবস্থা এবং সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতির সংবাদ সরবরাহ করা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলমান সন্দেহজনক ষড়যন্ত্র, বড় কর্মকর্তা বা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় কোনো অঞ্চল স্বাধীন বা রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার চক্রান্তে লিপ্ত কি না এ জাতীয় সকল সংবাদ জানানোই ছিল এ বিভাগের দায়িত্বশীলদের মূল কাজ।[২৩৪]

ইসলামের সূচনালগ্নে পত্রবাহকদের দায়িত্ব ছিল শুধু খলিফাদের বার্তাগুলো প্রাদেশিক গভর্নর ও সরকারি দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের বার্তাগুলো খলিফার কাছে হস্তান্তর করা। ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়িত্বও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। শেষ-পর্যন্ত এ বিভাগের প্রধানকে খলিফার প্রধান গোয়েন্দা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তিনিই খলিফার আদেশ-নিষেধগুলো বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছে পত্রযোগে পাঠাতেন এবং তাদের কার্যক্রমের ওপর

---

২৩৩. তানুখি, *আল-ফারাজু বা'দাশ শিদ্দাতি*, খ. ১, পৃ. ৫০।
২৩৪. তারতুশি, *সিরাজুল মুলুক*, পৃ. ৪৯।

সবসময় সজাগ দৃষ্টি রেখে খলিফাকে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। তেমনই শত্রুদের গতিবিধির প্রতিও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। শত্রুদের হালচাল সম্পর্কে অবগত থাকতেন। তার দায়িত্ব ছিল অনেকটা বর্তমান সময়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা গোয়েন্দা শাখার মতো। সাহিব আলাউদ্দিন বলেন, তাদের মৌলিক কাজ ছিল আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিটি স্থানে ডাকঘর স্থাপন করা এবং যথাস্থানে ত্বরিত সংবাদ পৌঁছে দেওয়া।[২৩৫] পত্র আদান-প্রদান ও চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়টি প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে পরবর্তী সময় এই সেবাটি সর্বসাধারণের জন্য অনুমোদন করা হয়।[২৩৬]

মুসলিমগণ এই যোগাযোগব্যবস্থার কল্যাণে প্রথম একক পথ ও পয়েন্ট তৈরি করেন। প্রতিটি পয়েন্টে দ্রুতগামী অশ্ব ও সুদক্ষ দায়িত্বশীলগণ অবস্থান করতেন। তারা পালাক্রমে পত্র বহনের দায়িত্ব পালন করতেন। ইবনুত তিকতাকি বলেন, বেশ কিছু পয়েন্টে কিছু দ্রুতগামী ঘোড়া ও দায়িত্বশীল রাখা হতো। নিকটবর্তী পয়েন্ট থেকে কেউ বার্তা নিয়ে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কালক্ষেপণ না করে উক্ত পয়েন্ট থেকে অপর দায়িত্বশীল দ্রুত সংবাদ পৌঁছানোর লক্ষ্যে নতুন ঘোড়া নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটতেন। এভাবেই তারা পালাক্রমে পত্র বহন ও পৌঁছানোর কাজ করতেন।[২৩৭]

ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন

এটা সুস্পষ্ট যে, ডাকব্যবস্থা একটি প্রাচীন যোগাযোগ ব্যবস্থা। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যেও এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।[২৩৮] ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন পাওয়া যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরও এটি ছিল একটি প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বিষয়। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ইসলামের দাওয়াত প্রদানের লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দূত পাঠিয়ে পত্র আদান প্রদান করেছেন। বিষয়টি

---

২৩৫. ইবনুত তিকতাকি, *আল-ফাখরিয়্যু ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১০৬।
২৩৬. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৩৯।
২৩৭. ইবনুত তিকতাকি, *আল-ফাখরিয়্যু ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১০৬।
২৩৮. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪১২।

তিনি এতই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন যে, সুদর্শন ও সুন্দর নামের অধিকারী লোকদের এ কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। এরই ফলে পারস্যের সম্রাট খসরু, রোমসম্রাট কাইসার, মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিস, আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশির কাছে যেসব দূত পাঠিয়েছেন সবার মাঝেই এ বৈশিষ্ট্য সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। কারণ তিনি জানতেন একজন দূত হলেন একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। প্রেরকের আগ্রহ ও সিদ্ধান্তের প্রতিচ্ছবি। এর বিপরীত হলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। শূন্য হাতে ফিরে আসতে হবে দূতকে।[২৩৯]

তা ছাড়া বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সিল বা আংটি তৈরির নির্দেশ দেন। কারণ তৎকালীন সম্রাটগণ রাষ্ট্রীয় সিল ছাড়া কোনো পত্র গ্রহণ করতেন না এবং সিলমোহরকে তারা প্রাপকের সম্মান বলে মনে করতেন।[২৪০]

প্রথম যুগের মুসলিমগণ যুদ্ধ-জিহাদকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন, বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে অসংখ্য বিজয়ের বীরোচিত উপাখ্যান রচনা করে ইসলামি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করেন, তা ধরে রাখার জন্য এবং প্রাদেশিক গভর্নর ও সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তৎকালীন ইসলামি রাষ্ট্রের সৈনিকগণ জিহাদের গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পত্র বহন ও পৌঁছানোর দায়িত্বও সমানভাবে পালন করতেন। আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাপতিদের পক্ষ থেকে নিয়মিত চিঠি আসত। যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে আমিরুল মুমিনিন সবসময় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বরং প্রতিটি পদক্ষেপ ও ঘটনা

---

[২৩৯]. ইবরাহিম আলি আল-কাল্লা, *নুযুমুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৪।

[২৪০]. আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনারব জনগোষ্ঠী বরাবর পত্র লেখার ইচ্ছা করলে তাকে অবগত করা হলো যে, অনারবগণ সিল ছাড়া কোনো পত্র গ্রহণ করেন না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি (সিল হিসেবে ব্যবহারের জন্য) রুপার একটি আংটি তৈরি করেন যাতে লেখা ছিল الله، رسول، محمد। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বা আঙুলে সেই আংটি শোভা পেত। দেখুন, *বুখারি*, হাদিস নং ৬৫; *মুসলিম*, হাদিস নং ২০৯২।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে অবহিত করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। যেন তারা একাকিত্ব বোধ না করেন, সবসময় আমিরুল মুমিনিন ও মুসলিমবিশ্ব তাদের পাশে আছে, তাদের বিজয়াভিযান ও দুঃখ-কষ্ট তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে এই ধারণা যেন সবসময় তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। তা ছাড়া সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রতিকূল অবস্থায় সাহায্য প্রেরণ যেন সম্ভব হয়, যোগাযোগ রক্ষার পেছনে সেটিও ছিল আমিরুল মুমিনিনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

উমাইয়া শাসনামলে মুআবিয়া রা. ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদ ও বিধি প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা। আর এভাবেই মুআবিয়া রা. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এর জন্য স্বতন্ত্র কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে রোম ও পারস্য থেকে সুদক্ষ কর্মী নিয়ে আসেন।[২৪১]

এরপর আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এসে ডাকবিভাগের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে নতুন নতুন বিষয় তাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য তা আরও কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে ছিল প্রতিটি ভূখণ্ডের জন্য সীমা নির্ধারণ করা এবং দামেশক থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত বিস্তৃত স্বতন্ত্র চারটি পথ তৈরি করা। বাদশা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান দিনরাতের যেকোনো সময় পত্রবাহক এলে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে কোনো প্রকার বাধা না দিতে প্রধান প্রহরীকে আদেশ দেন। বর্ণিত আছে, তিনি রাজপ্রহরী ইবনুদ দোগাইদাগাকে ডেকে বলেন, চার প্রকার লোক ছাড়া আমার দরজায় যে-ই আসবে, অবশ্যই তুমি তাদের পরীক্ষা করবে : এক. মুয়াজ্জিন, কারণ সে হলো আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। তার ওপর কোনো বাধা চলে না। দুই. রাতের আগন্তুক। কারণ কঠিন বিপদে পড়েছে বলেই সে এসেছে। তা না হলে সে ঘুমিয়ে থাকত। তিন. পত্রবাহক। দিনরাতের যখনই সে আসবে, তাকে বারণ করবে না। কারণ বছরজুড়ে বিশৃঙ্খলায় পড়ে থাকা পুরো রাজ্যকে একটি সংবাদের মাধ্যমে মুহূর্তেই শান্ত করে দিতে পারেন একজন পত্রবাহক।

---

২৪১. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা ফি সিনাআতিল ইনশা*, খ. ১৪, পৃ. ৪১৩; কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৪-১০৫।

চার. খাবার। যখনই আসবে, দরজা খুলে দেবে। সবাইকে খাবারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেবে।[২৪২] বাদশা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে পত্রবাহকের কী পরিমাণ গুরুত্ব ছিল, এ ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিখ্যাত উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে অর্থনৈতিক ও নাগরিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার পরিধি আরও সম্প্রসারিত হয়। বিপুল পরিমাণ উট ও ঘোড়া বরাদ্দ করা হয় এ কাজের জন্য। রাষ্ট্রজুড়ে অনেকগুলো ডাকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়। তার আমলে ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার অসামান্য উন্নতি সাধিত হয়, এমনকি কনস্টান্টিনোপল থেকে দামেশক পর্যন্ত দীর্ঘ পথে দায়িত্বরত বাহনগুলোকে স্বর্ণখচিত আবরণ পরানো হয়। এরকম আচ্ছাদন কেবল বড় বড় মসজিদ, মক্কা, মদিনা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের দেয়ালগুলোতেই শোভা পেত।[২৪৩]

ডাকবিভাগের উন্নয়নে বিখ্যাত শাসক উমর ইবনে আবদুল আযিযও ব্যাপক অবদান রেখে যান। ডাকপয়েন্টগুলোর সম্প্রসারণ, বিশ্রামাগার তৈরি, এ কাজের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি সড়কে বাহনের পানের জন্য পানির হাউজ এবং খাদ্যশালা স্থাপন করেন। উমর ইবনে আবদুল আযিয ঘোষণা করে দেন, এই বাহনগুলো কেবল যেন মুসলিমদের সেবায় এবং পত্র বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কারণ বাহনগুলো ছিল রাষ্ট্রীয় সম্পদ। একবার তিনি সরকারি এক কর্মীকে তার এলাকা থেকে মধু নিয়ে আসতে বলেন। ওই কর্মী ডাকবাহনের পিঠে করে সেই মধু নিয়ে আসে। উমর ইবনে আবদুল আযিয জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে নিয়ে এসেছে? দরবারিগণ উত্তর দিলেন, ডাকবাহনের পিঠে করে। এ কথা শুনে তিনি ওই মধু বিক্রি করে তার মূল্য মুসলিমদের সাধারণ অর্থ তহবিলে জমা করার নির্দেশ দেন। আর ওই কর্মীকে বলেন, এই বাহনে করে এনে তুমি তোমার মধু নষ্ট করে ফেলেছ![২৪৪]

---

২৪২. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪১৩।

২৪৩. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪১৩।

২৪৪. ইবনুল জাওযি, *সিরাতু ওয়া মানাকিবু উমর*, পৃ. ২১০; আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ফাসাবি, *আল-মারিফাতু ওয়াত-তারিখু*, খ. ১, পৃ. ৩৩৭।

ইতিহাসে দেখা যায় আব্বাসি খলিফাগণও ডাকব্যবস্থার উন্নয়নকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তা প্রধান নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করেন। আবু জাফর মনসুর বলতেন, আমার ঘরে সবসময় চার প্রকার ব্যক্তির উপস্থিতি জরুরি। সবসময় তাদের দরকার হয় আমার। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা হে আমিরুল মুমিনিন? বললেন, তারা হলেন রাষ্ট্রের ভিত্তি। তাদের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র অচল। ঠিক যেমন চৌকাঠের খুঁটি থাকে চারটি। একটি যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে তা দুর্বল ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। এক. বিচারক, যিনি আল্লাহপ্রদত্ত বিচারব্যবস্থা কার্যকরে কারও হুমকি-ধমকির তোয়াক্কা করেন না। দুই. নিরাপত্তারক্ষী বা পুলিশ, যারা দুর্বল-সবল সবার প্রতি ন্যায্য আচরণ করেন। তিন. কর উসুলকারী, যিনি জনগণের ওপর জুলুম না করে সবার অবস্থা খতিয়ে দেখে কর আদায় করেন। এ ব্যাপারে কেউ জুলুম করলে আমি তা বরদাশত করব না। এরপর তিনি তিনবার দাঁতে শাহাদাত আঙুল চাপলেন। প্রতিবার তিনি আহ আহ বলে আওয়াজ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, চতুর্থ ব্যক্তিটি কে হে আমিরুল মুমিনিন? তিনি বললেন, পত্রবাহক বা সংবাদবাহক, যিনি সঠিকভাবে সকলের সংবাদ লেখেন।[২৪৫]

ভন ক্রেমার বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনের মূলে ছিলেন একজন ডাকবিভাগের কর্মী। গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ সম্পর্কে খলিফাকে অবহিত করাই ছিল তার দায়িত্ব। বরং প্রাদেশিক গভর্নরদের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি করার দায়িত্বও ছিল তার ওপর। এক কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন তারা। খলিফাগণ ডাকবিভাগের কার্যক্রমকে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করতেন। তাদের সাহায্যেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কি না তা শাসকগণ জানতে পারতেন।[২৪৬]

খলিফা হারুনুর রশিদ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান এবং বিভাগীয় গভর্নরদের উদ্দেশে ত্বরিত ফরমান জারি করার লক্ষ্যে পুরো মুসলিম সাম্রাজ্যকে নিখুঁত ডাক-যোগাযোগের আওতাভুক্ত করেন। এজন্য ত্বরিত

---

২৪৫. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৬, পৃ. ৩১৩।

২৪৬. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৪১।

ব্যবস্থা নেন। অনেকগুলো ডাকপয়েন্ট স্থাপন করেন, প্রতিটি পয়েন্টে স্বতন্ত্র কর্মী ও অশ্ব বরাদ্দের ব্যবস্থা করে তাদের জন্য খাদ্য, পানীয় ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।[২৪৭]

১৬৬ হিজরি/৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনাসমগ্র বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাসির রহ. বলেন, মক্কা, মদিনা ও ইয়ামেনের মাঝে উন্নত ডাকব্যবস্থা স্থাপনের নির্দেশ দেন খলিফা মাহদি। এর আগে অন্য কেউ এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না।[২৪৮]

মামলুক রাজবংশের শাসনামলেও ডাকব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বিশেষ করে সুলতান বাইবার্সের রাজত্বকালে। এ সময় স্থল ও সামুদ্রিক উভয় পরিমণ্ডলে ডাকপায়রার আনাগোনার জন্য তিনি সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন, যা ৫৭২ হিজরি/১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নির্মিত পশ্চিম কায়রোর জাবাল দুর্গকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো। সেখান থেকে তৈরি হয় চারটি স্থলকেন্দ্রিক পথ :

১। একটি পথ চলে যায় আফ্রিকা মহাদেশের সুদানে অবস্থিত কুসের দিকে। সেখান থেকে আসওয়ানের দিকে। এরপর সেখান থেকে সুদান ও ইথিউপিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে।

২। আরেকটি পথ চলে যায় কুস হয়ে লোহিত সাগরের তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর আয়যাব ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে।

৩। আরেকটি পথ চলে যায় আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে।

৪। চতুর্থ পথটি দিময়াত হয়ে গাজা শহর অভিমুখে।

সুলতান বাইবার্সের রাজত্বকালে প্রতি সপ্তাহে দুবার করে মিশরে ডাক আসত। আর ডাকবিষয়ক সকল-কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন রচনা বিভাগের প্রধান।[২৪৯]

ইসলামি সভ্যতায় ডাক ও ডাক পরিভাষা

ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থার বিচিত্র কিছু প্রকার ছিল, যা ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থার উন্নতি ও সামসময়িক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ

---

২৪৭. ইবরাহিম আলি আল-কাল্লা, *নুযুমুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৫-১০৬।

২৪৮. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১৫৮।

২৪৯. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৪৫।

তুলে ধরে। নিচে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ডাকব্যবস্থার কথা তুলে ধরছি :

১। স্থলপথে ব্যবহৃত ডাকব্যবস্থা

স্থলপথে ডাকসেবা পরিচালনায় যারা দায়িত্ব পালন করতেন তাদের ফুয়ুজ বা সুআত নামে ডাকা হতো। বিরতিহীন ভ্রমণ ও নিরলস পরিশ্রমে তারা ছিলেন সুপরিচিত। মুসলিমগণ সে যুগে ডাকসেবা পরিচালনায় ব্যাপকভাবে উট, ঘোড়া ব্যবহার করতেন। খচ্চরের প্রচলনও ছিল উল্লেখযোগ্য হারে। স্থলপথে অবস্থিত সকল শহর ও পয়েন্টে ডাকবাহন ও দায়িত্বশীলদের জন্য পৃথক পৃথক বিশ্রামাগার থাকত, সেখানে বাহনের খাবার ও বিশ্রামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হতো। প্রয়োজনে বাহন পালটে নতুন করে নেওয়ার মতো অনেক ঘোড়া ও গাধা সবসময় সেখানে প্রস্তুত থাকত।[২৫০] ডাকব্যবস্থায় 'শাহারা' নামক একপ্রকার দ্রুতগামী ঘোড়া ও 'নাজিব' নামক একপ্রকার দ্রুতগামী উট ব্যবহৃত হতো, যা অন্যসব ঘোড়া ও উট থেকে তুলনামূলক ক্ষিপ্র ও কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতির হতো।[২৫১]

ডাকব্যবস্থার পথ ও সীমা সুদূরপ্রসারী ও সুবিস্তৃত হওয়ায় নির্জলা মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তর দিয়ে গমন করা ছিল খচ্চরের জন্য কঠিন ও দুঃসাধ্য, ফলে যথাসম্ভব মরুপ্রান্তর এড়িয়ে যেসব অঞ্চলে পানি ও বৃক্ষরাজির অস্তিত্ব পাওয়া যায় সেসব নিরাপদ ও শক্ত মাটি বিশিষ্ট প্রান্তরকে ডাকপথ হিসেবে বেছে নেওয়া হতো।[২৫২]

২। জলপথে ব্যবহৃত ডাকব্যবস্থা

সমুদ্রপথে ডাক-যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো উন্নত ও অত্যাধুনিক সব নৌযান। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, সামুদ্রিক অঞ্চলে দ্রুত ও হালকা নৌযান ব্যবহৃত হতো ডাক বাহন হিসেবে।[২৫৩] প্রথম হাজ্জাজ

---

২৫০. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৩৭৭; জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরাবি কাবলাল ইসলাম*, খ. ৯, পৃ. ৩২০।

২৫১. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৬।

২৫২. জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরাবি কাবলাল ইসলাম*, খ. ৯, পৃ. ৩২০-৩২১।

২৫৩. হাসান ইবনে আবদুল্লাহ, *আসারুল উওয়াল ফি তারতিবিদ দুওয়াল*, পৃ. ৮৯; মুহাম্মাদ যয়ফুল্লাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৮ থেকে উদ্ধৃত।

ইবনে ইউসুফ সমুদ্রে আলকাতরার আবরণে তৈরি শক্ত কাঠ ও লোহার পেরেক দ্বারা নির্মিত দ্রুতগামী নৌযান পরিচালনা করেন।[২৫৪]

৩। আকাশপথে ব্যবহৃত ডাকব্যবস্থা

আকাশপথে ডাকব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হতো ডাকপায়রা। ক্ষুদেবার্তা আদান-প্রদানের জন্য এটি ছিল একটি কার্যকর ব্যবস্থা। বার্তাটি ডাকপায়রার পিঠে, বা পালকের নিচে, অথবা পায়ে বেঁধে দেওয়া হতো। আর তা নিয়ে সে গন্তব্যের দিকে রওনা হতো। এ ধরনের পায়রাকে ডাকা হতো হাদি (الهدي) নামে।[২৫৫]

মুসলিমগণ শুধু স্থল ও জলপথে ডাকসেবা নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হননি, বরং অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও উন্নত ডাকব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নানামুখী পদক্ষেপ ও প্রকল্প হাতে নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ছিল ডাকপায়রা।

ডাকপথে ব্যবহৃত কবুতরের অনেক কদর ছিল এবং সে সময় তা চড়া দামে বিক্রি হতো। বিশেষত বসরা নগরীতে মানুষ তা কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ডাকপায়রার জন্য সে সময় স্বতন্ত্র মার্কেট ছিল। এমনকি একটি পায়রার দাম সাতশ দিনার পর্যন্ত উঠত সেখানে। সুলতান নুরুদ্দিন যিনকির শাসনামলে এবং উবাইদি-ফাতেমি বংশের রাজত্বকালে এ ধরনের পায়রার ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। সুদূর বসরা থেকে কায়রো পর্যন্ত এবং কায়রো থেকে দামেশক পর্যন্ত পায়রাযোগে পত্র আদান-প্রদানের রীতি চালু ছিল। পায়রার বিরতি গ্রহণ ও অবতরণের জন্য তখন স্বতন্ত্র উঁচু টাওয়ার নির্মিত হয়। টাওয়ার থেকে টাওয়ারে গমন করতে করতে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট গন্তব্যের টাওয়ারে এসে অবতরণ করত ডাকপায়রা। দামেশকের টাওয়ারগুলোতে মিশরের পায়রা রাখা হতো এবং মিশরের টাওয়ারগুলোতে দামেশকের পায়রা রাখা হতো। সাধারণত একবার পত্র প্রেরণের জন্য দুটি চিঠি ও দুটি পায়রা প্রস্তুত করা হতো। একটি ওড়ানোর প্রায় দু-ঘণ্টা পর দ্বিতীয়টি ওড়ানো হতো। প্রথমটি পথ হারিয়ে ফেললে বা দুর্ঘটনায় মারা গেলে দ্বিতীয় পায়রাটি যেন গন্তব্যে পৌঁছে।

---

২৫৪. জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত-তিবয়ান*, পৃ. ৩৬৪।

২৫৫. মুহাম্মাদ যয়ফুল্লাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৮।

বৃষ্টির সময় বা বৈরী আবহাওয়ার কালে সাধারণত পত্র পাঠানো হতো না। পেটভরতি আহার না করিয়ে কখনো পায়রা ছাড়া হতো না।[২৫৬]

পায়রাযোগে পাঠানো পত্রগুলো হতো অতি সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতবহ ভাষায় লেখা। এ ধরনের বার্তা যুদ্ধের সময় বেশি পাঠানো হতো। ছোট্ট ও হালকা কাগজে সংক্ষিপ্ত করে লিখে বৃষ্টিবাদল বা ঝড় থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তা পায়রার পায়ে বা পালকের নিচে বেঁধে দেওয়া হতো। আর তাতে লেখা হতো খুবই চিকন ও হালকা অক্ষরে।[২৫৭]

এই ছিল আকাশপথে পরিচালিত মুসলিমদের ব্যবহৃত ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থা, যা স্থলীয় ডাকব্যবস্থা থেকে কোনো অংশে কম গুরুত্বের ছিল না।

৪। অগ্নিসংযোগ করে সতর্কবার্তা প্রদান

উল্লিখিত ডাকব্যবস্থা ছাড়াও মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত ছিল আগুন জ্বালিয়ে সতর্ক করার মতো ব্যবস্থাও। কালকাশান্দি বলেন, নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট ও স্থাপনা ছিল, যেখানে রাতেরবেলা অগ্নি প্রজ্বলন করা হতো এবং দিনেরবেলা ধোঁয়া উত্তোলন করা হতো। এর জন্য কোনো এলাকায় পাহাড়ের চূড়ায়, আবার কোনো এলাকায় উঁচু ভবনের ওপর জায়গা নির্ধারণ করা হতো। সরকারি কর্মকর্তা ও নিরাপত্তারক্ষীদের মাঝে এ ধরনের সংকেত আদান-প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। ইসলামি ভূখণ্ডের সর্বশেষ সীমান্ত এলভিরা ও রাহবা থেকে জাবাল দুর্গ পর্যন্ত এ সংকেতসীমা বিস্তৃত ছিল। ফলে ফুরাত নদীর তীরবর্তী এলাকায় (ইরাকে) কিছু ঘটলে রাতের মধ্যেই সে খবর মিশর পর্যন্ত চলে আসত। রাতে কিছু ঘটলে সকালের মধ্যেই সবাই তা জেনে যেতেন। বিচিত্র সাংকেতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আগুন প্রজ্বলন ও ধোঁয়া উত্তোলন করা হতো, যা দিয়ে শত্রুদের সর্বশেষ অবস্থা, তাদের গতিবিধি ও অপতৎপরতার খবর দেওয়া হতো, কখনো কখনো আক্রমণকারী শত্রুদের সংখ্যাও জানিয়ে দেওয়া হতো নানাভাবে আগুন জ্বালিয়ে।[২৫৮]

---

[২৫৬]. মুহাম্মাদ যয়ফুল্লাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৮-১৯৯; আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৪৬।

[২৫৭]. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৭-১০৮।

[২৫৮]. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪৪৫।

এসব বাতিঘরগুলো সমুদ্র উপকূলে নির্মিত হতো আর এতে দায়িত্বরত রক্ষীগণ সমুদ্রপথে শত্রুদের আগমন সম্পর্কে রাজধানীকে সতর্ক করার জন্য দিনরাত উপকূলীয় এলাকাগুলো পাহারা দিতেন। নিজেদের মধ্যে পরিচিত ভাষায় নানাভাবে আগুন জ্বালিয়ে সংকেত দিতেন। যখনই কোনো শত্রুপক্ষের আগমন টের পেতেন, রাতেরবেলা হলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে পার্শ্ববর্তী বাতিঘরে দায়িত্বরত রক্ষীদের সংকেত দিতেন। আর দিনেরবেলা হলে ধোঁয়া উৎক্ষেপণ করে সাবধান করতেন। এজন্যই বলা হতো, আলোকবার্তা সুদূর মরক্কোর টাঙ্গিয়ার থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত মাত্র এক রাতের ব্যবধানে পৌঁছে যেত। প্রতিরক্ষা দুর্গগুলোর মাঝে দ্রুততম উপায়ে সংবাদ আদান-প্রদানের লক্ষ্যে উপকূলীয় চৌকিগুলোর মসজিদের মিনার থেকে আলোক-সংকেত পাঠানো হতো। এই পদ্ধতি বিশেষভাবে চালু ছিল আফ্রিকার তিউনিসিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো সউসে শহরের মুনাস্তির[২৫৯] চৌকি।[২৬০]

কালকাশান্দি বাতিঘর সম্পর্কিত তার আলোচনার শেষে উল্লেখ করেন, সুবিশাল ইসলামি ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বশীলগণ যে প্রজ্ঞা ও কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, তা পরিমাপ করার মতো নয়। সংবাদ সরবরাহের ক্ষেত্রে তারা উন্নত ও আধুনিক সব ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন। কারণ শুরুতে বাহনে করে পত্র আদান-প্রদান ছিল সবচেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা। এর চেয়েও দ্রুত ডাকসেবা হয় পায়রা। এর চেয়েও আরও দ্রুত যোগাযোগ সেবা হয়ে ওঠে আলোক-সংকেত ব্যবস্থা। আপনি জেনে অবাক হবেন, ইরাক থেকে মিশর পর্যন্ত যেকোনো সংবাদ এক রাতের ব্যবধানে পৌঁছে যেত। কত দ্রুত ও উন্নত ডাকব্যবস্থা হলে এরকমটি সম্ভব![২৬১]

উপর্যুক্ত বৃত্তান্তের আলোকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, ইসলামি সভ্যতা সামসময়িক যুগের সবচেয়ে উন্নত ও আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন করেছে। এভাবে রাষ্ট্র সবসময় একজন নেতা বা খলিফার অধীনে পরিচালিত ছিল। তিনিই সবকিছু

---

২৫৯. মুনাস্তির শহরটি সউসে শহর থেকে ৩০ কি.মি দক্ষিণে অবস্থিত।

২৬০. দেখুন, সাদ যাগলুল গং, *দিরাসাত ফি তারিখিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৮০-৪৮১; কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৮।

২৬১. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪৪৭।

সম্পর্কে একের পর এক অবগত হতেন। আর এসব ব্যবস্থা ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীগুলো বহু যুগ ও বহু শতাব্দী পার হওয়ার পর আবিষ্কার করতে পেরেছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫. রাজকোষ বা অর্থ তহবিল

ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে স্বাধীন, নিরাপদ ও সুরক্ষিত অর্থব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সুসমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। কুরআনুল কারিমেও সেই উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত এসেছে,

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

(অর্থসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে) যেন ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে যায়।[২৬২]

এই আয়াতের লক্ষ্য পুরোপুরিরূপে বাস্তবায়নের স্বার্থে ইসলামি সভ্যতা অর্থ কেবল ধনীদের কাছে নয়, সর্বস্তরের মানুষের মাঝে এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে। কারণ, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাছে অর্থ সীমাবদ্ধ থাকলে মুসলিম সমাজে গোলযোগ ও বিপর্যয় এবং সমাজের একটি শ্রেণির কাছে মানুষের জিম্মি হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

বাইতুল মাল বা ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ তহবিল বলতে রাষ্ট্রীয় অর্থ যে তহবিলে জমা হয় এবং যে বিভাগ থেকে রাষ্ট্রের সকল চাহিদা পূরণ করা হয় সেই তহবিলকে বোঝায়। আর সেই অর্থ-তহবিলে হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে সরাসরি খলিফার বা তার নিযুক্ত গভর্নরের। তিনি মুসলিম উম্মাহর কল্যাণার্থে যুদ্ধ-জিহাদ পরিচালনায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সেই অর্থ ব্যয় করবেন।[২৬৩]

---

২৬২. সুরা হাশর : ৭।

২৬৩. মুনির হাসান আবদুল কাদির, *মুআসসাসাতু বাইতিল মাল ফি সাদরিল ইসলাম*, পৃ. ৪৭।

এই তহবিলে যেসব খাত থেকে অর্থ আসত, তা হলো: যাকাত, ভূমিকর, রাজস্ব, জিযয়া, গনিমত ও আওকাফ। যার মধ্যে আওকাফ ছাড়া বাকি সবই হলো সম্পদ, জমিন ও মানুষের ওপর ধার্যকৃত কর বা ট্যাক্স।[২৬৪]

বাইতুল মালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, স্বাভাবিকভাবে যে অর্থসম্পদ সাধারণ মুসলিমদের অধিকার এবং যার স্বত্বাধিকারী এখনো নির্ধারিত হয়নি সেটাই বাইতুল মালের অর্থ বলে গণ্য হবে। যে অর্থ মুসলিমদের কল্যাণে খরচ হওয়ার কথা তা বাইতুল মালে যাবে।[২৬৫] এই পারিভাষিক অর্থের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বাইতুল মাল হলো ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। মুসলিমদের সকল চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের একমাত্র তহবিল হলো বাইতুল মাল। যা অনেকটা বর্তমান সময়ের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো।

বাইতুল মাল থেকে ব্যয়ের খাতগুলো ছিল যথাক্রমে :

১। গভর্নর, বিচারক, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, কর্মচারী, সরকারি কর্মীদের বেতন। স্বয়ং আমিরুল মুমিনিন বা খলিফাও এ খাত থেকে বেতন গ্রহণ করতেন।

২। সেনাবাহিনীর বেতন।

৩। সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতকরণের যাবতীয় ব্যয়। যুদ্ধাস্ত্র তৈরি। ঘোড়া, উট ইত্যাদি ক্রয়।

৪। জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ করতে এবং তাদের অধিকার সমুন্নত রাখতে সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ ও সড়ক নির্মাণ। সরকারি কার্যালয়ের ভবন, বিশ্রামাগার ও মসজিদ নির্মাণ।

৫। সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। যেমন হাসপাতাল, জেলখানা ইত্যাদি।

৬। অনাথ, দরিদ্র, বিধবা ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ। সরকার তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পূর্ববর্তী অন্য সব সভ্যতাকে ছাপিয়ে সূচনালগ্নেই ইসলামি সভ্যতা অর্থ ব্যয়ের সূক্ষ্ম ও নিখুঁত খাতগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের মাঝে সুষ্ঠুভাবে

---

২৬৪. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৩১।
২৬৫. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২৭৮।

সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে। উপর্যুক্ত আয়-ব্যয়ের পরও আরও অনেক জরুরি খাত থেকে যায়, যেমন রাষ্ট্রে যদি দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ বা মহামারি দেখা দেয়, তাহলে সরকার ধনীদের কাছ থেকে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত দান-সদকা গ্রহণ করে সাধারণ মুসলিমদের জন্য তা খরচ করবে। ঠিক যেমন আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর শাসনামলে মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থে উসমান ইবনে আফফান রা. বিপুল পরিমাণ অর্থ সদকা করেন। তেমনই উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-ও বিশাল অঙ্কের অর্থ অনুদান দেন। ইসলামি ইতিহাসে এরকম হাজারও স্বতঃস্ফূর্ত দানের উদাহরণ পাওয়া যায়, যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামি অর্থ তহবিল অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থবিভাগরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[(২৬৬)]

মুসলিমগণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই বাইতুল মালের গোড়াপত্তন করেন। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বিভিন্ন এলাকায় সরকারি প্রতিনিধি ও প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাদের প্রধান কাজ ছিল সদকা, জিযয়া, কর ও রাজস্ব এবং গনিমতের একপঞ্চমাংশ উসুল করা। আবার কখনো শুধু আর্থিক বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতেন, যাদের দায়িত্ব থাকত শুধু সদকা, ভূমিকর, ট্যাক্স, উশর ইত্যাদি উসুল করে বাইতুল মালে হস্তান্তর করা। মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েই ইয়ামেনে পাঠান। তা ছাড়া আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-কে যখন বাহরাইনে পাঠান, তাকেও সেখানকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে কর উসুলের দায়িত্ব প্রদান করেন।[(২৬৭)]

নবীযুগে মুসলিমদের কল্যাণে বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূচনালগ্ন থেকেই ইসলাম অর্থব্যবস্থাকে সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই যুগচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের মূলনীতি ঠিক রেখে অর্থব্যবস্থার অনেক আধুনিকায়ন হওয়ার ফলে পরবর্তী সময় তা আরও সুন্দর ও নিখুঁত আকার ধারণ করেছে।

---

২৬৬. আলি ইবনে নায়েফ শুহুদ, *আল-হাযারাতুল ইসলামিয়্যা বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া আমালিল মুসতাকবিল*, পৃ. ২৫৭।

২৬৭. আবু উবাইদ, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ৪১।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে বিজিত হয় শাম, ইরাক, মিশর, আলজেরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, আরমেনিয়া, আযারবাইজান ও ইস্পাহান। আর উসমান ইবনে আফফান রা-এর শাসনামলে বিজিত হয় ইরানের কিরমান, সিজিস্তান, নিশাপুর, পারস্য অঞ্চল, তাবারিস্তান, হেরাত, খোরাসানের অবশিষ্ট এলাকা এবং আফ্রিকা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। অসংখ্য বিজয় মুসলিমদের পদচুম্বন করে। স্বাভাবিকভাবেই তখন প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলিমদের অধিকারে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানীতে এসে জমা হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ।[২৬৮]

বিজিত অঞ্চল থেকে মদিনায় আসা এসব গনিমতের মাল, বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রুপা, দামি দামি পাথর ও মণিমুক্তা, মিলিয়ন মিলিয়ন দিরহাম ও দিনার, অজস্র দাস ও মূল্যবান গালিচা দেখে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কাঁদতেন। এ কারণেই দেরি না করে তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা করে সুষ্ঠু ও সঠিক খাত খুঁজে বের করে এসব অর্থ কাজে লাগাতে। খলিফার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত ব্যয়ের খাতগুলো নির্ণীত হয়। অনুদান বিভাগের আলোচনায় আমরা ইতিমধ্যে সে সম্পর্কে জেনে এসেছি।[২৬৯]

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সবসময় বাইতুল মালে অর্থ জমা করে রাখার বিপক্ষে ছিলেন। প্রকৃত অধিকারী ও প্রয়োজনগ্রস্তদের মাঝে পর্যায়ক্রমে অর্থ বিতরণ করে দিতেন। ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, বছরে একবার বাইতুল মাল খালি করার নির্দেশ দিতেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.।[২৭০] অর্থাৎ প্রকৃত অধিকারীদের মাঝে সকল অর্থসম্পদ বিতরণ করে বছরে একবার বাইতুল মাল শূন্য করার জন্য বলতেন। কোনো সন্দেহ নেই, এরকম দানশীলতা ও মহানুভবতার পরিচয় ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য অবদান। ইসলামি রাষ্ট্র সবসময় তার যাবতীয় অর্থ প্রজা ও জনগণের স্বার্থে ব্যয় করেছে। অভাবগ্রস্তদের সঙ্গে সকল অর্থ-রাজস্ব ভাগ করে নিয়েছে। আবার তা শতাব্দীতে একবার নয়, বরং

---

২৬৮. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫।

২৬৯. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৫১৯।

২৭০. ইবনুল জাওযি, *মানাকিবু আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনিল খাত্তাব*, পৃ. ৭৯।

কোনোপ্রকার কালক্ষেপণ ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই প্রতি বছর! এটাই ছিল ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক ও জনগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির অপরূপ উদাহরণ।

এ ব্যাপারে আলি ইবনে আবু তালিব রা. ছিলেন আরও একধাপ এগিয়ে। অর্থের প্রাচুর্যকে কেন্দ্র করে যেন শাসকশ্রেণি ও জনগণের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি না হয়, সেজন্য প্রতি শুক্রবার তিনি বাইতুল মালের সমুদয় অর্থ বণ্টন করে দিতেন। যেন কোনো অর্থই রাজকোষে জমা না থাকে।[২৭১] এরই ধারাবাহিকতায় একদিন তিনি বাইতুল মালে প্রবেশ করে দেখেন, তাতে প্রচুর স্বর্ণ-রুপা জমা হয়ে আছে। তা দেখে তিনি বললেন, হে হলুদ স্বর্ণ, তুমি যতই আকর্ষণীয় হও; হে শুভ্র রুপা, তুমি যতই লোভনীয় হও; তুমি তোমার সৌন্দর্য আমি ছাড়া অন্যদের সামনে প্রকাশ করো। তোমার মধ্যে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।[২৭২]

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রশাসন ও অর্থব্যবস্থাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে, সমস্যা এড়াতে এবং কর্তৃত্বমুক্ত রাখতে মুসলিম খলিফাগণ সবসময়, এ দুটোকে আলাদা রেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন কুফার শাসনকর্তা হিসেবে আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে পাঠান, তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বাইতুল মালের প্রধান দায়িত্বশীল ও উযির হিসেবে তার সঙ্গে প্রেরণ করেন।[২৭৩]

উমাইয়া শাসনামলে বাইতুল মালে জমা হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। ইবনে আবদুল হাকাম (মৃ. ২৫৭ হি.) বর্ণনা করেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর শাসনামলে মিশরের গভর্নর মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ রা. যে পরিমাণ অর্থ পাঠান, সরকারি সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন, তাদের পরিবারের ভাতা, সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সহকারীদের সম্মানী, বিভিন্ন প্রদেশে কর্মরত সরকারি দায়িত্বশীল ও লিপিকার এবং হেজায অঞ্চলে খাদ্য রপ্তানির কাজে নিয়োজিতদের যথাযথ প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার পরও তা থেকে ছয় লাখ দিনার অবশিষ্ট থেকে যায়।[২৭৪] মুসলিমদের অধিকৃত একটিমাত্র অঞ্চল মিশর থেকেই এত বিপুল পরিমাণ

---

২৭১. আবুল আব্বাস আন-নাসিরি, *আল-ইসতিকসা*, খ. ১, পৃ. ১১২।

২৭২. ইবনুল ওয়ারদি, *তারিখু ইবনিল ওয়ারদি*, খ. ১, পৃ. ১৫৭।

২৭৩. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৫৫।

২৭৪. ইবনে আবদুল হাকাম, *ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ১১৭।

অর্থ স্থানান্তর থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, অন্যান্য অঞ্চল থেকে কী পরিমাণ অর্থ এসে জমা হতো বাইতুল মালে। এত বিশাল পরিমাণ অর্থ আসার ঘটনা থেকে আমরা বাইতুল মালের গুরুত্ব এবং ইসলামি খিলাফতের বড়ত্ব অনুমান করতে পারি।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, উমাইয়া শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে বাইতুল মালের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল দামেশকে। তবে প্রত্যেক প্রদেশে বাইতুল মালের শাখা ছিল। ওই শাখার কার্যালয় থেকে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও আঞ্চলিক সকল প্রয়োজন পূরণ করা হতো। এসব ব্যয় পরিপূর্ণরূপে শেষ হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকত, তা খিলাফতের রাজধানীতে বাইতুল মালের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থানান্তর করা হতো।

অপরদিকে প্রতিটি অঞ্চলের স্থানীয় মুসলিমদের অধিকার ছিল খিলাফতের রাজধানীতে স্থানান্তরিত হতে যাওয়া এসব অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার। স্থানীয় সকল মুসলিমের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে-কেউ যেকোনো সময় তদন্ত করার অধিকার রাখতেন। মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে মিশরে এমন ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার মিশরের বাইতুল মালের অবশিষ্ট অর্থ রাজধানী দামেশকের বাইতুল মালে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে মিশর থেকে রাজস্ববাহী উটের বহর যাত্রা শুরু করে। কিন্তু বারাহ ইবনে হাসকাল আল-মাহরি নামক মিশরীয় এক ব্যক্তি পথিমধ্যে বাধ সেধে বসে। উটের বহর দেখে বলতে থাকে, কী হলো, আমাদের দেশের অর্থ কী করে দেশের বাইরে যাচ্ছে? এ বহর ফিরিয়ে নাও। এরপর তা ফিরিয়ে মসজিদের কাছে আনা হলে লোকটি সমস্বরে মানুষের উদ্দেশে ঘোষণা করে, আপনারা কি আপনাদের নিজেদের ও কর্মচারীদের সব বেতন-ভাতা ও অধিকার এবং আপনাদের পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত যাবতীয় দান-অনুদান গ্রহণ করেছেন? সবাই বলল, হ্যাঁ..।[২৭৫] সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ সবাই নিজ নিজ প্রাপ্য ও অধিকার যথাযথরূপে বুঝে পেয়েছে নিশ্চিত হওয়ার পর বারাহ সেই উটের বহর দামেশকে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেন। কোনো সন্দেহ নেই, খিলাফতের অধীনে জনসাধারণ কী

---

২৭৫. ইবনে আবদুল হাকাম, *ফুতুহ মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ৩৪৫।

পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন, এই ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খলিফাতুল মুসলিমিন ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক (মৃ. ৯৬ হি.)-এর ব্যাপারেও এমন একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। অযথা খরচ করে মুসলিমদের সম্পদ নষ্ট করছেন এরকম একটি অভিযোগ তার ব্যাপারে ছড়িয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব মানুষকে মসজিদে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেন। সবাই মসজিদে সমবেত হলে মিম্বরে উঠে তিনি ঘোষণা দেন, আমি জানতে পেরেছি, আপনারা বলাবলি করছেন, ওয়ালিদ বাইতুল মালের সব অর্থ অযথা ব্যয় করে ফেলেছেন। এরপর তিনি একজনকে লক্ষ করে বলেন, হে আমর ইবনে মুহাজির, যাও! বাইতুল মালের সব অর্থ এখানে নিয়ে এসো। এরপর বাইতুল মালে জমা থাকা যাবতীয় অর্থসম্পদ তিনি অনেকগুলো খচ্চরে করে মসজিদে নিয়ে আসেন। এরপর আন-নাসর গম্বুজের নিচে অনেকগুলো চামড়ার মাদুর বিছিয়ে সেখানে সব স্বর্ণ-রুপা ঢেলে রাখেন। এভাবে সবগুলো ঢালা শেষ হলে তা বিরাট স্তুপে পরিণত হয়। যা ছিল তখনকার সময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ। এরপর পাল্লা এনে তা পরিমাপ করা হয়। গুনে দেখা হয়, এই অর্থ পরবর্তী তিন বছরের জন্য পুরো রাজ্যের মানুষের জীবিকার জন্য যথেষ্ট। অন্য বর্ণনামতে, মানুষের যদি আর কোনো উপার্জন নাও থাকে, তবুও তা পরবর্তী ষোলো বছরের যাবতীয় ব্যয়ের জন্য এই অর্থ যথেষ্ট হবে। এরপর খলিফা ওয়ালিদ মানুষের উদ্দেশে বলেন, আল্লাহর শপথ! এই মসজিদের নির্মাণকাজে আমি বাইতুল মাল থেকে এক দিরহামও গ্রহণ করিনি, যা ব্যয় হয়েছে সবই ছিল আমার নিজস্ব অর্থ। ওয়ালিদের এ কথা শুনে মানুষ যারপরনাই আনন্দিত হয়। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেয়। এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে খলিফার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে বাড়ি ফেরে।[২৭৬]

বাইতুল মাল থেকে যেকোনো সময় যেকোনো মুসলিম ঋণ গ্রহণ করতে পারতেন। এ ব্যাপারে কে সরকারি কর্মকর্তা আর কে সাধারণ নাগরিক তা বিবেচনা করা হতো না। একবার উসমান ইবনে আফফান রা. বাইতুল মাল থেকে এক লাখ রৌপ্যমুদ্রা ধার নেন। সেজন্য ঋণগ্রহণ চুক্তিনামা

---

২৭৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ১৭০-১৭১।

লেখেন আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম। সাক্ষী হিসেবে ছিলেন আলি ইবনে আবু তালিব, তালহা, যুবাইর, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। এরপর উসমান রা. সময়মতো সে ঋণ বাইতুল মালে পরিশোধ করে দেন।[২৭৭]

উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর শাসনামলে বাইতুল মালের অবকাঠামোতে কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়। তখন বাইতুল মালের আয়ের খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে: যাকাত, জিযয়া, ভূমিকর, উশর ও গনিমতের এক পঞ্চমাংশ। এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিয জনগণের ওপর ভাতা-অনুদান বৃদ্ধি করে নতুনভাবে অর্থনৈতিক ব্যয়প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। লুণ্ঠিত ও অপহৃত ব্যক্তিদের জন্য তিনি বাইতুল মাল থেকে বরাদ্দ রাখেন। যার ফলে অল্পদিনের মধ্যে ইরাকের বাইতুল মাল শূন্য হয়ে যায়। যার কারণে তিনি শাম থেকে অর্থ গ্রহণ করেন।[২৭৮]

বাইতুল মালের যাবতীয় আয়ের উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করার মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উমর ইবনে আবদুল আযিযের শাসনামলে অভাবনীয়ভাবে সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে। যার ফলে এসব অর্থসম্পদ ব্যয়ের জন্য তিনি অভিনব সব পদ্ধতি ও খাত আবিষ্কার করেন, যার মাধ্যমে তিনি রাজ্যের অনেক বিপদ ও সংকট দূর করতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ইরাকের গভর্নর আবদুল হামিদ ইবনে আবদুর রহমানকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান, মানুষের সকল অধিকার ও বেতন-ভাতা বুঝিয়ে দাও। আবদুল হামিদ উত্তরে লেখেন, সব মানুষের বেতন-ভাতা ও যাবতীয় সম্মানী বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও বাইতুল মালে অনেক অর্থ রয়ে গেছে। এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিয বাইতুল মালে বেঁচে যাওয়া অর্থ থেকে সকল ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, নির্বুদ্ধিতা ও অপচয় না করে যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে, তাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও। এরপর আবদুল হামিদ পত্র লেখেন, তাদের ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও বাইতুল মালে অনেক অর্থ রয়ে

---

২৭৭. বালাজুরি, *আনসাবুল আশরাফ*, খ. ৬, পৃ. ১৭৩।
২৭৮. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা*, পৃ. ৩৩৬।

গেছে। এরপর যেসব যুবক-যুবতী অর্থের অভাবে বিয়ে করতে পারছে না, উমর ইবনে আবদুল আযিয বাইতুল মালের অর্থ থেকে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে চায়, বাইতুল মাল থেকে মোহরের ব্যবস্থা করে তাদের বিয়ে দিয়ে দাও। এরপর আবদুল হামিদ লেখেন, আমরা এরকম বিয়ে করতে আগ্রহী সকল যুবকের বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তারপরও বাইতুল মালে অনেক অর্থ রয়ে গেছে।

এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিয বাইতুল মালকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ভূমিকায় এনে সেখান থেকে কৃষকদের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র ও বিপর্যস্ত কৃষকদের জন্য অগ্রীম ঋণ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ভূমিকর আদায় করার ফলে জমি আবাদ করে যেসব কৃষক অভাবে পড়ে গেছে, পুনরায় জমি আবাদের জন্য বাইতুল মাল থেকে তাদের ঋণ প্রদান করো। কারণ আমরা শুধু এক বছর বা দু-বছরের জন্য তাদের কাছ থেকে কর আশা করি না।[২৭৯]

তৎকালীন বাইতুল মাল ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের এক প্রতিরক্ষা দুর্গের মতো, বিপদ ও দুর্যোগের মুহূর্তে মুসলিম সরকার সে দুর্গে আশ্রয় নিত। হিজরি ১৮ সনে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের সময় খলিফা উমর রা. বাইতুল মাল থেকে জনসাধারণকে খাদ্য ও অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেন। এমনকি জনগণের মাঝে খাদ্য ও অর্থ বিতরণ করতে করতে একসময় রাজকোষ পুরোপুরি শূন্য হয়ে যায়।[২৮০]

স্পেনের উমাইয়া শাসনামলের সময় আবু জাফর মনসুর (মৃ. ১৫৮ হি.) খলিফাতুল মুসলিমিন হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার গৃহীত অর্থনীতি ছিল খুবই নিয়ন্ত্রিত ও যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার অজান্তে বাইতুল মাল থেকে একটি কানাকড়িও বের হতে পারত না। তার এই কঠোর ব্যয়নীতির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব পড়া শুরু করে। এমনকি তাকে কৃপণ বলেও অনেকে আখ্যায়িত করতে থাকে। মনসুরের পর তার পুত্র মাহদি খলিফা হলে পিতার ব্যয়নীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে আসেন। তার চিন্তাধারা ছিল, অর্থ জমা রেখে

---

২৭৯. ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ৪৫, পৃ. ২১৩।
২৮০. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ১০৩।

মুসলিম জনসাধারণকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে জনকল্যাণে তা ব্যয় করে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করাটাই অধিক মঙ্গলজনক। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে খলিফা হিসেবে শপথ নেওয়ার পরপরই তিনি পিতার আমলে বাইতুল মালে জমা করা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রুপা বের করে মানুষের মাঝে বিতরণ করে দেন। পরিবার ও একান্ত অনুগতদের জন্য সেখান থেকে কিছুই রাখেননি, বরং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে মাসিক পাঁচশ দিরহাম করে বেতন ধার্য করেন। অথচ পিতার নীতি ছিল যথাসম্ভব বাইতুল মালে অর্থ সঞ্চিত রেখে তহবিল সমৃদ্ধ করা। ধনীদের এই অর্থ থেকে প্রতি বছর তিনি দুই হাজার দিরহাম খরচ করতেন।[২৮১]

বিশিষ্ট খলিফাগণ ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করার ফলে তাদের আমলে বাইতুল মাল বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে প্রতি বছর সাত হাজার পাঁচশ কিনতার[২৮২] পরিমাণ অর্থ জমা হতো বাইতুল মালে।[২৮৩] অপর আব্বাসি খলিফা মুতাযিদ বিল্লাহর (মৃ. ২৭৯ হি.) ইনতেকালের সময় বাগদাদের অর্থ তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ জমা ছিল, ইবনে কাসিরের মতো আরও কিছু ইতিহাসবিদের বর্ণনা অনুযায়ী তার পরিমাণ ছিল সতেরো মিলিয়ন বা এক কোটি সত্তর লক্ষ দিনার।[২৮৪] ওই সময়ের হিসাবে এটি ছিল বিশাল অঙ্ক। কারণ তখন এক দিনার ছিল ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণের সমান।

যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিপদ-দুর্যোগের সময় পুরো রাষ্ট্র যখন চাপের মুখে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাহিদা যখন তীব্র, ঠিক তখনও আমরা দেখি বিশিষ্ট আমির ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ অক্ষম, দরিদ্র ও আলেমদের জন্য অর্থ প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। মূলত তখন বাইতুল মালের প্রধান ভূমিকা ছিল দুটি: যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা এবং যোগ্য দাবিদারদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা। বিখ্যাত মুসলিম শাসক নুরুদ্দিন মাহমুদ যিনকির রাজসহচরগণ যখন দেখলেন যে, তিনি প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করছেন এবং এই যুদ্ধ ও জিহাদের জন্য রাষ্ট্রকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে

---

২৮১. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১৬৩।

২৮২. অধিকাংশ আলেমের কাছে কিনতারের পরিমাণ হলো : ১৪৩.৮ কিলোগ্রাম।

২৮৩. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ১৮১।

২৮৪. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ১০৬।

হচ্ছে, তখন তারা তাকে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার এই বিশাল রাজ্যে অনেক কার্যালয় ও বিভাগ আছে। এই রাজ্যে ফকিহ, দরিদ্র, সুফি, দরবেশ ও কারিদের জন্য অনেক অর্থ বরাদ্দ আছে। এই সময়ে যদি আপনি সেই অর্থ থেকে কিছু অংশ কেটে রাখেন, তাহলে ভালো হয়। সহচরদের এ প্রস্তাব শুনে তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার এসব যুদ্ধাভিযানের বিজয় ওই ফকিহ, সুফি দরবেশ ও কারিদের দোয়া ও ভালোবাসা ছাড়া আশাই করতে পারি না। এমনকি রাজদরবারে আপনাদের রিযিকের ব্যবস্থা হয় সেইসব অভাবী ও দুর্বল লোকদের কারণেই। আরামদায়ক রাজবিছানায় আমি ঘুমিয়ে থাকি, আর সেই দুর্বল লোকেরা আমার জন্য দোয়া-কান্নাকাটি করে থাকে। আর আল্লাহর কাছে তাদের এই কাকুতিমিনতি কখনো লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার নয়। আপনারা বলছেন, তাদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ আমি ওইসব লোকদের দিয়ে দেবো, যারা যতক্ষণ আমাকে দেখে ততক্ষণই আমার হয়ে যুদ্ধ করে, যাদের ধনুকের তির লক্ষ্য ভেদ করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। অবশ্যই সেই শ্রেণির জন্য বাইতুল মাল থেকে সবসময় অর্থ বরাদ্দ থাকবে। তাদের এই অধিকার আমি অন্য কাউকে দিতে পারি না।[২৮৫]

স্পেনের ইসলামি সভ্যতায় বাইতুল মাল ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। পাশ্চাত্যের সুসমৃদ্ধ এই অর্থ তহবিলের প্রাণকেন্দ্র হতো জামে মসজিদ। বাইতুল মালের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশেষ করে এই প্রক্রিয়া বিরাজমান ছিল স্পেনের উমাইয়া শাসনামলজুড়ে।[২৮৬]

মামলুকি রাজবংশের শাসনামলে বাইতুল মাল থেকে যেসব খাতে ব্যয় করা হতো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি খাত ছিল দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য নির্মাণ, যেগুলো আজ পর্যন্ত কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন সুলতান আয-যাহির বাইবার্স মসজিদ, মাদরাসা ও কালাউন হাসপাতাল, সুলতান আন-নাসির মসজিদ, কাইতাবায়ি দুর্গ, সুলতান কনসুওয়া ঘুরি মসজিদ ইত্যাদি।[২৮৭]

---

[২৮৫]. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ৪৬৩।

[২৮৬]. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, খ. ২, পৃ. ২৩০।

[২৮৭]. বায়ুমি ইসমাইল, *আন-নুযুমুল মালিয়্যা ফি মিসর ওয়াশ-শাম যামানা সালাতিনিল মামালিক*, পৃ. ২৬৪।

মামলুকি আমিরগণ বাইতুল মালে সবসময় বড় বড় ফকিহ ও বিদ্বানদের দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ দিতেন, যারা যোগ্যতা ও জ্ঞান উভয় দিক থেকেই ছিলেন সমৃদ্ধ। যেমন বিখ্যাত ফকিহ ইযযুদ্দিন ইবনে জামাআ। তিনি ৭৩১ হিজরি সনে আহমাদ ইবনে তুলুন মসজিদ সংলগ্ন বাইতুল মালের দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।[২৮৮]

মোটকথা, বাইতুল মাল বা ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ তহবিল ছিল একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান, যা রাষ্ট্রীয় সকল কাজে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেছে। সকল চাহিদা ও প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই বাইতুল মাল অত্যন্ত নিখুঁত ও সুনিপুণভাবে এই সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে অসামান্য অবদান রেখেছে।

---

২৮৮. মাকরিযি, *আস-সুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১৪৬।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

পুলিশ প্রশাসন

পুলিশ প্রশাসন ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে গণ্য হয়। পুলিশ প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব হলো সকল পর্যায়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। বিশেষত ব্যক্তি ও সমাজজীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর এ কাজের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গ হবেন এমন সুশৃঙ্খল বাহিনী, যারা ব্যক্তি ও সমাজের যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে আদালতের দেওয়া বিচারিক নির্দেশগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করবেন। মানুষের জানমাল, ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করবেন।

মুসলিমগণ সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। যদিও এখনকার মতো এতটা পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত রূপে ছিল না। *সহিহুল বুখারিতে* বর্ণিত আছে, একজন বাদশার যেমন পুলিশ প্রধান থাকে, কাইস ইবনে সাদ রা.-ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ঠিক সেরকম ছিলেন।[২৮৯]

রাতেরবেলা নগরীর অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেওয়া এবং শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখার যে নিয়ম, তা প্রথম চালু করেন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তিনি রাতেরবেলা মদিনায় টহল দিতেন। জনগণকে পাহারা দিতেন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন।[২৯০]

বলা যায়, খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে বড় পরিসরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠিত হয়। এরপর উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফাদের যুগে তা আরও সমৃদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়। শুরুলগ্নে এ বাহিনীর কাজ ছিল কেবল দণ্ড ও বিচার বাস্তবায়ন। আদালতের পক্ষ থেকে যে বিচার ও

---

২৮৯. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৩৬।

২৯০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৫৬৭।

দণ্ডের নির্দেশ হতো, সেগুলোই তারা কার্যকর করতেন। এরপর ধীরে ধীরে তাদের কর্মতৎপরতা আরও সমৃদ্ধ হয়। ফলে এক সময় পুলিশদের কাঁধে আসে অপরাধ তদন্ত করার দায়িত্বও। প্রতিটি শহরে এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। তারা ছিল পুলিশ মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর পুলিশ মহাপরিচালকের অধীনে থাকত অনেক ডেপুটি, তারা ব্যবহার করত বিশেষ ধরনের পোশাক ও ছোট্ট বর্শা। পদ অনুযায়ী তাদের পোশাকে থাকত নানা প্রতীক। পোশাকের গায়ে সবার নাম ও পদবি লেখা থাকত। রাতেরবেলা দায়িত্ব পালনের সময় তারা ফানুস বা মশাল ব্যবহার করতেন। প্রশিক্ষিত কুকুরও সঙ্গে রাখতেন।[২৯১]

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এই পুলিশ বাহিনীকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করেন। ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর পদ সৃষ্টি করেন। ইসলামি ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তিগত দেহরক্ষী গ্রহণ করেন।[২৯২] কারণ, তার আগে ইসলামি রাষ্ট্রের তিন তিনজন রাষ্ট্রনায়ক উমর রা., উসমান রা. ও আলি রা. দুর্বৃত্তদের হাতে শাহাদতবরণ করেন।

উমাইয়া শাসনামলে পুলিশ বিভাগই ছিল রাষ্ট্রীয় সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নকারী বিভাগ। কখনো কখনো পুলিশ প্রধান পদোন্নতি পেয়ে আমির বা গভর্নরের পদেও উন্নীত হতেন। যেমন ১১০ হিজরিতে বসরার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন পুলিশ প্রধান খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ।[২৯৩]

উমাইয়া শাসনামলে খলিফাগণ পুলিশ প্রধানের পদকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেন। আইন প্রয়োগে এই পদের তাৎপর্য ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে পুলিশ প্রধানের কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তা রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যিয়াদ ইবনে আবিহি বলেন, পুলিশ প্রধানকে হতে হবে সদা সতর্ক ও দাপটের অধিকারী। নিরলস। নিরাপত্তারক্ষীদের প্রধানকে হতে হবে সচ্চরিত্র ও বিশ্বস্ত, যাকে চাইলেও অপবাদ দেওয়া যায় না।[২৯৪]

---

[২৯১]. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

[২৯২]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ১৫৬।

[২৯৩]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ১৩৬।

[২৯৪]. ইয়াকুবি, *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ২৩৫।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে ইরাক ও হেজাযের গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুফা নগরীর জন্য একজন যোগ্য পুলিশ প্রধান অনুসন্ধানে রাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী ও মান্যবর মহলের পরামর্শ কামনা করলে তারা জিজ্ঞেস করেন, কী ধরনের ব্যক্তি চান আপনি? উত্তরে হাজ্জাজ বলেন, আমি এমন একজন ব্যক্তি চাই, যে হবে চরম ধৈর্যশীল ও বিশ্বস্ত। যার বিরুদ্ধে বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস ভঙ্গের প্রমাণ নেই। কারও সামান্য অধিকারও হেলার চোখে দেখেন না। ক্ষমতা প্রয়োগ ও সত্য প্রতিষ্ঠায় কোনো ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির সুপারিশের তোয়াক্কা করেন না। এরপর সবাই পরামর্শ দিলেন আবদুর রহমান ইবনে উবাইদ তামিমিকে এ পদের জন্য নিয়োগ দিতে। এরপর হাজ্জাজ পুলিশ প্রধানের পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য তার কাছে লোক পাঠান। তাদের প্রস্তাব শুনে তিনি হাজ্জাজকে বলে দেন, আপনার পরিবার, সন্তান ও রাজদরবারের লোকদের বলুন, আমার দায়িত্ব বাস্তবায়নে তারা যেন কখনো অন্তরায় না হয়। হাজ্জাজ তার গোলামকে বললেন রাজদরবারে ঘোষণা করে দাও, আবদুর রহমানের কাছে তারা যদি কোনো সুপারিশ করে বা কিছু দাবি করে, তবে আবদুর রহমান সেই সুপারিশ ও দাবি বাস্তবায়ন থেকে মুক্ত থাকবে।[২৯৫] সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় তার যোগ্যতা ও সফলতা দেখে শাবি বলেন, এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, চল্লিশ রাত তিনি অতিবাহিত করেছেন, তার কাছে কারও বিচার আসেনি আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তার অসামান্য সফলতা দেখে হাজ্জাজ কুফার পাশাপাশি বসরার পুলিশ প্রশাসনও তার কাছে হস্তান্তর করেন।[২৯৬]

এ কারণেই উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইবনে খালদুন লেখেন, বাগদাদের আব্বাসি শাসনামলে, আন্দালুসে উমাইয়া শাসনামলে এবং মিশর ও মরক্কোয় ফাতেমিদের রাজত্বকালে অপরাধ তদন্ত করা এবং দণ্ড প্রয়োগ করা, এগুলো ছিল ধর্মীয় অন্যান্য কর্তব্যের পাশাপাশি একটি শরয়ি গুরুদায়িত্ব। ধীরে ধীরে এ দায়িত্বগুলো সম্প্রসারিত হয়। ফলে

---

২৯৫. ইবনে কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার*, খ. ১, পৃ. ৭; ইবনে হামদুন, *আত-তাযকিরাতুল হামদুনিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৯১; আবু ইসহাক কায়রাওয়ানি, *যাহরুল আদাব ওয়া সামারুল আলবাব*, খ. ২, পৃ. ৩৮১।

২৯৬. ইবনে কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার*, খ. ১, পৃ. ১৬।

অপবাদ আরোপের মামলাও সেখানে স্থান পায়। আর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে সেখানে প্রাথমিক শাস্তির বিধান স্থির করা হতো। অপরাধ প্রমাণিত হলে তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হতো। কেসাস বা রক্তের বদলাও বাস্তবায়ন করা হতো। কোনো আসামী অপরাধ থেকে বিরত না হলে তাকে সাবধান করা বা সৎ পথে আনার চেষ্টাও করা হতো।[২৯৭]

আর এভাবেই খিলাফতে রাশেদার সময় থেকে নিয়ে উমাইয়া শাসনকালের সূচনালগ্ন পর্যন্ত পুলিশ প্রধানের ওপর রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশ কার্যকরের যে দায়িত্ব ছিল তা সমৃদ্ধ হতে হতে একপর্যায়ে অপরাধ তদন্ত করা এবং দণ্ড কার্যকর করা পর্যন্ত পৌছায়। এ কারণেই অপরাধীদের আবদ্ধ রাখতে এবং দুর্বৃত্ত ও বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে কারাগার নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয় ইসলামি রাষ্ট্র। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ তাবারির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, যিয়াদ ইবনে আবিহি অনেক বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করেন। বিশেষ করে কুখ্যাত ইবনুল আশআসের সহচরদের। তাদের মধ্যে বিশেষ করে কাবিসা ইবনে যুবাইআ আসদিকে আটক করেন।[২৯৮]

বাইতুল মালের অর্থায়নে এসব কারাগার নির্মিত হয়। সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের অনিষ্ট হতে জনগণকে নিরাপদ রাখতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শুধু তাই নয়, কারাবন্দিদের যাবতীয় খরচ ও দেখাশোনার সকল ব্যয়ভার বহন করে ইসলামি রাষ্ট্র। এমনকি আসামিদের জন্য দুধরনের পোশাক সরবরাহ করতে খলিফা হারুনুর রশিদকে প্রস্তাব করেন কাযি আবু ইউসুফ। গরমে আরামদায়ক সুতি কাপড়ের পোশাক এবং শীতে পশমের মোটা পোশাক।[২৯৯] কারণ দণ্ড কার্যকরের পাশাপাশি বন্দিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাও ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আব্বাসীয় খলিফাগণ পুলিশ প্রধান পদে সবসময় জ্ঞানী, ধার্মিক ও দণ্ড কার্যকরে কোনো ভয় ও হুমকি-ধমকি প্রশ্রয় না দেওয়া ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিতেন। *তাবসিরাতুল হুক্কাম* গ্রন্থে ইবনে ফারহুন লেখেন, বিখ্যাত পুলিশ প্রধান ইবরাহিম ইবনে হুসাইন ইবনে খালেদ একবার মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা

---

২৯৭. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২২।

২৯৮. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ২২৪-২২৫।

২৯৯. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ১৬১।

এক আসামিকে রাজদরবারের পশ্চিম পাশের মধ্যবর্তী ফটকের সামনে দাঁড় করিয়ে চল্লিশটি চাবুক মারেন। শাস্তিস্বরূপ তার[৩০০] দাড়ি মুণ্ডন করেন। মুখে কালি মেখে দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো বার তাকে প্রদক্ষিণ করান। প্রতিবার ঘোষণা করা হয়, এই হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার শাস্তি। এই পুলিশ প্রধান ছিলেন একজন ন্যায়বান, সৎ, জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তি। ছিলেন ফকিহ ও তাফসির বিষয়ক আলেম। ষষ্ঠ আব্বাসি খলিফা আল-আমিন মুহাম্মাদের আমলে তিনি পুলিশ মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম মালেক রহ.-এর উস্তাদ মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহর সামসময়িক ছিলেন তিনি। মুতাররিফ থেকে বর্ণিত একাধিক হাদিস *মুআত্তায়* বর্ণিত আছে।[৩০১]

আব্বাসীয় শাসনামলে অনেক সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। তেমনই একজন হলেন বিখ্যাত সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে তাহের ইবনে হুসাইন। যুদ্ধাভিযান পরিচালনা এবং তাতে অসামান্য বিজয় অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের পুলিশ মহাপরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করেন খলিফা মামুন।[৩০২]

অপরদিকে যেসব পুলিশ প্রধান সীমালঙ্ঘন করেছে, জনগণের সঙ্গে অবিচার করেছে, মাত্রাতিরিক্ত দণ্ড প্রয়োগ করেছে, প্রমাণ ছাড়া ধরপাকড় করেছে, তাদের পদচ্যুত করতে কালক্ষেপণ করেনি খিলাফত কার্যালয়। যেমন চারিত্রিক অবনতি ও অবিচারে জড়িত থাকার অভিযোগে বাগদাদের পুলিশ প্রধান মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুতকে পদচ্যুত করে সরকারি দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেন আব্বাসি খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ।[৩০৩]

ওই যুগে নানাবিধ দায়িত্ব ছিল পুলিশ প্রধানের। সকল ইসলামি প্রদেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা; সামাজিক বিধিনিষেধ রক্ষা করার জন্য তারা নানা কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। মিশরের গভর্নর মুযাহিম ইবনে খাকান (মৃ. ২৫৩ হি.) পুলিশ প্রধান আযজুর আত-তুর্কির উদ্দেশে

---

৩০০. দাড়ি মুণ্ডন একটি গর্হিত অপরাধ। দাড়ি মুণ্ডন করে শাস্তি প্রদান করা শরিয়ত সমর্থিত না। তবে ইবরাহিম ইবনে হুসাইন ইবনে খালেদ এর বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট না।-সম্পাদক

৩০১. ইবনে ফারহুন, *তাবসিরাতুল হুক্কাম*, খ. ৫, পৃ. ৩১৯।

৩০২. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ৪৫৫।

৩০৩. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ১৬৬।

কিছু নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশে নারীদেরকে বেপর্দায় চলাফেরা এবং কবরস্থান যিয়ারত থেকে বারণ করতে বলা হয়। নারীসুলভ আচরণকারীদের মারধর করা এবং লাশের ওপর পড়ে বিলাপকারী নারীদের প্রহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তা ছাড়া পুলিশ প্রধান গানবাদ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং মদ্যপান নির্মূল করেন।[৩০৪]

এ ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন নগরীতে কর্মরত পুলিশ প্রধানদের মধ্যে কেউ দায়িত্ব পালনে অলসতা করলে খলিফাগণ প্রতিকারস্বরূপ দ্রুত ভুল সংশোধন করতে তাদের বাধ্য করতেন। কারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিজেই যদি আইন ভঙ্গ করে, তবে তার কুপ্রভাব জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আব্বাসি খলিফার অধীনে থাকা একজন পুলিশ প্রধানের সংকটকালে চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার বিবরণ দিতে গিয়ে *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা* গ্রন্থে ইবনুল কাইয়িম রহ. লেখেন, একবার খলিফা মুকতাফি বিল্লাহর আমলে একদল চোর বিপুল অঙ্কের অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়। যে করেই হোক চোরদের গ্রেফতার করতে অথবা অর্থের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পুলিশ প্রধানকে দায়িত্ব দিলেন খলিফা। খলিফার নির্দেশ পালনে জড়িতদের ধরার জন্য তিনি একা তদন্তে বের হলেন। রাতদিন নগরীর অলিগলিতে একা বাহনে চড়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন শহরতলির একটি নির্জন গলির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সন্দেহজনক কিছু একটা দেখতে পেয়ে গলিতে ঢুকলেন। দেখলেন সেখানে একটি বাড়ির সামনে বড় বড় মাছের অনেক কাঁটা ও পিঠের হাড্ডি স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। তা দেখে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে যে পরিমাণ মাছের কাঁটা ও হাড় দেখা যায়, সেই পরিমাণ মাছের মূল্য কত হতে পারে? উত্তরে লোকটি বলল, প্রায় এক দিনার। তা শুনে তদন্তকারী পুলিশ প্রধান বললেন, মরুভূমির পাশে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরতলির দারিদ্র্যপীড়িত গলির বাসিন্দা এত বেশি পরিমাণ মাছ কেনার সামর্থ্য রাখে না। তা ছাড়া গলিটিও মরুভূমির সাথে লাগোয়া, তাই কারও কাছে মূল্যবান কিছু থাকলে, অথবা এমন বড় ধরনের খরচের মতো অর্থ থাকলে সে এখানে থাকতে পারে না, স্বাভাবিকভাবে এটি তার জন্য হুমকিস্বরূপ, বিষয়টি সন্দেহজনক মনে

---

৩০৪. নাসির আল-আনসারি, *তারিখু আনযিমাতিশ শুরতাতি ফি মিসর*, পৃ. ৪৬।

হচ্ছে। তদন্ত করা দরকার। লোকটি তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার চিন্তা অনেক গভীর। পুলিশ প্রধান বললেন, স্থানীয় কোনো নারীকে ডাকুন, তার সাথে আমি কথা বলব। তখন মাছের হাড় স্তূপ করে রাখা গলিটির একটি বাড়িতে নক করে পানি চাওয়া হলে সেখান থেকে একজন দুর্বল বৃদ্ধা নারী বেরিয়ে এলেন। সেই নারীর কাছ থেকে একের পর এক পানি চাচ্ছিলেন। তিনি সময় নিয়ে তা পান করছিলেন আর গলির লোকদের সম্পর্কে বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করছিলেন। বৃদ্ধা সরল মনে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাছের হাড়ের স্তূপ রাখা বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন, কে থাকে ওই বাড়িতে? বৃদ্ধা বলল, পাঁচজন শক্তিশালী যুবক। দেখতে তাদের ব্যবসায়ী মনে হয়। এক মাস হলো তারা এসেছে। দিনের বেলায় খুব বেশি তাদের দেখা যায় না। তাদের কেউ যদি কোনো সময় বের হয়, দ্রুত কাজ সেরে এসে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সারাদিন তারা ঘরে একসঙ্গে থাকে। খায়দায়-ঘুমায় আর দাবা-পাশা খেলে। অল্পবয়স্ক এক কিশোর তাদের সেবা করে। কারখ শহরে তাদের বাড়ি, রাতের বেলায় ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কিশোরকে রেখে তারা ওখানে চলে যায়। ভোর রাতে তারা ফিরে আসে, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি বিধায় তা টের পাই না। এরপর বৃদ্ধা নিজেই বলতে লাগল, এগুলো তো চোরের স্বভাব। পুলিশ প্রধান বললেন, অবশ্যই। তৎক্ষণাৎ তিনি পুলিশ ফোর্স ডাকলেন। দশজন পুলিশ চলে এলো। তাদের তিনি পাশের ঘরগুলোর ছাদে অবস্থান নিতে বললেন। এরপর তিনি সন্দেহজনক বাড়ির দরজায় নক করলে ওই কিশোর এসে দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সদস্যরা সেখানে ঢুকে সবাইকে গ্রেফতার করলেন। কেউ আর পালানোর সুযোগ পেল না। পরে তদন্তে প্রমাণ হলো, এরাই সেই অর্থ চুরি করেছিল।[৩০৫] বাগদাদের পুলিশ প্রধানের কী পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা ও সৎসাহস ছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে খলিফার নির্দেশ পালনে তাদের কী পরিমাণ আন্তরিকতা ছিল এই ঘটনা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর এ কারণেই শক্তিশালী লোকদের নয়, বরং মুসলিম সরকার পুলিশ প্রধান পদে সবসময় বুদ্ধিমান, সচেতন ও দূরদর্শী লোকদের নিয়োগ

---

৩০৫. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা*, পৃ. ৬৫।

দিতেন। নিচের ঘটনা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এক পুলিশ প্রধানের কাছে একবার চুরির অপবাদে দুজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলে পুলিশ প্রধান একমগ পানি আনতে বললেন। মগটি হাতে নিয়ে তিনি সজোরে ছুড়ে মারলেন, এতে মগটি ভেঙে গেল। এই দৃশ্য দেখে একজন ভয় পেয়ে গেল আর দ্বিতীয়জন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, যেন কিছুই হয়নি। যে ভয় পেয়েছে তাকে ডেকে পুলিশ প্রধান বললেন, তুমি চলে যাও। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, চুরির অর্থ কোথায় রেখেছ, বের করো! জিজ্ঞেস করা হলো, কী করে বুঝলেন এই লোকটিই চুরি করেছে? উত্তরে তিনি বললেন, চোরের মন সবসময় শক্ত হয়। খুব সহজে সে ভয় পায় না। আর নির্দোষ ও সরল লোকেরা ঘরে ইঁদুর নড়াচড়া করলেই ভয় পেয়ে যায়। যদি ইঁদুরের আওয়াজ শুনে ভয় পায়, তাহলে সে চুরি করবে কীভাবে?![৩০৬]

বেশিরভাগ অঞ্চলেই পুলিশ প্রধানের উপস্থিতি ছিল। অঞ্চলভেদে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হতো। আফ্রিকায় পুলিশ প্রধানকে বলা হতো হাকেম। মামলুক বংশের রাজত্বকালে বলা হতো ওয়ালি। আর মিশরে এই পদটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ। সেখানে পুলিশ প্রধান ছিলেন রাষ্ট্রীয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। গভর্নরের অনুপস্থিতিতে তিনিই নামাযের ইমামতি করতেন। দান-সদকা ও সরকারি অনুদান বিতরণসহ অনেক কাজ তিনিই সম্পাদন করতেন। মিশরে পুলিশ কার্যালয় ছিল জামে আল-আসকার নামক জামে মসজিদের পাশেই। এ পদের নাম ছিল الشرطة العليا (পুলিশ মহাপরিচালক)।[৩০৭] সেখানে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, পুলিশ প্রধান প্রতিনিধিদের থেকে নিত্যদিনের সংবাদপ্রবাহ জানতেন। রাষ্ট্রে কেউ নিহত হয়েছে কি না, বড় কোনো অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে কি না সে সম্পর্কে প্রতিনিধিগণ পুলিশ প্রধানকে অবহিত করতেন। এরপর সুন্দরভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে প্রতিদিন সকালে সুলতানের কাছে পৌছানো হতো আর তিনি অবগত হতেন।[৩০৮]

---

৩০৬. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা*, পৃ. ৬৭।
৩০৭. মাকরিযি, *আল-খুতাতুল মাকরিযিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৮৪০-৮৪১।
৩০৮. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৪, ৬১ পৃ.।

শুধু তাই নয়, পুলিশ প্রধানগণ সে আমলে কোমরের দিকে বিশেষ এক ধরনের লম্বা তরবারি বহন করতেন। বিশেষ এই তরবারির নাম ছিল তাবারযিন।[৩০৯]

অপরদিকে আন্দালুসিয়ার ইসলামি রাষ্ট্রে পুলিশ প্রধানের দুটি পৃথক বিভাগ ছিল। একটি বিভাগকে বলা হতো الشرطة الكبرى (উর্ধ্বতন পুলিশ বিভাগ)। সুলতানের নিকটস্থ বন্ধু, দরবারি, রাজবংশীয়, সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা ছিল এই বিভাগের দায়িত্ব। এই বিভাগের পক্ষ থেকে রাজদরবারের প্রধান ফটকে একটি আসন (চেকপোস্ট) থাকত। শুধু উযির বা হাজিবদেরকেই (দারোয়ান) রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেওয়া হতো। কোনো সন্দেহ নেই, এ ধরনের পৃথক বিভাগ গঠন প্রমাণ করে যে, ইসলামি সভ্যতা সবসময় শরিয়তের সংবিধান এবং সামাজিক রীতিনীতি ও ন্যায়বিচারকে যথাযথ মর্যাদা দান করতে সক্ষম হয়েছে। এতে কে গরিব, কে ধনী, কে রাজা, কে প্রজা তা পৃথক করে দেখেনি। আর দ্বিতীয় বিভাগকে বলা হতো الشرطة الصغرى (অধস্তন পুলিশ বিভাগ)। এই বিভাগটি ছিল জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের মাঝে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার দায়িত্বে। আন্দালুসে পুলিশ প্রধানের উপাধি ছিল সাহিবুল মাদিনা।[৩১০]

ইসলামি সভ্যতা একটি আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ গঠনমূলক সভ্যতা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পুলিশ প্রধানের পদ আগেও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান ছিল। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সর্বত্র ও সবসময় এই পদের বিকল্প নেই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জটিলতা নিরসনের এই পদ যেকোনো ক্ষেত্রে ও মুহূর্তে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, কিন্তু ইসলামি সভ্যতায় পরিচিত এই পুলিশ প্রধানের পদ ছিল সমকালীন পারস্য ও রোম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিমগণ নিত্যনতুন পদ্ধতি ও কৌশল আবিষ্কার করে ও শরয়ি বিধিবিধান জুড়ে দিয়ে এই পদকে আধুনিক ও প্রগতিশীল করেছেন।

---

৩০৯. অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি*, খ. ২, ২৭৫ পৃ.।

৩১০. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২৫১; শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

আল-হিসবাহ

খিলাফতের অধীনে দৈনন্দিন সমাজজীবনে মানুষের ব্যস্ততা ও জীবনোপকরণ বৃদ্ধির ফলে বিচারবিভাগের পাশাপাশি আরেকটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে ওঠে, যার নাম আল-হিসবাহ। ধর্মীয় এ বিভাগের মূল কার্যক্রম ছিল মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ও সচেতন করা। মুসলিম জনসাধারণের শাসনভার গ্রহণকারী ব্যক্তির ওপর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। আর এ কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করাও তার একটি বড় দায়িত্ব। অন্যদের ওপর যদিও এ দায়িত্বটি ফরযে কেফায়ার পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু গোটা জনসাধারণের শাসনভার গ্রহণের কারণে তার ওপর এ দায়িত্বটি ফরযে আইন হিসেবে বর্তায়।[৩১১] কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

> আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎ কর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[৩১২]

এই বিভাগের কার্যক্রম ও কর্মসূচি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমদের জন্য এ বিভাগে অনেক কল্যাণকর বাস্তবিক কার্যধারার সূচনা হয়। সামাজিক আরও অনেক বিষয় এ বিভাগের দায়িত্বে যুক্ত হয়। যেমন সড়ক ও জনপথ পরিচ্ছন্ন রাখা, কোনো নিরীহ পশুর ওপর সাধ্যাতীত

---

৩১১. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২৫।
৩১২. সুরা আলে-ইমরান : ১০৪।

কোনো বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে তার প্রতি রহম করা, পাত্র ঢেকে রাখার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, শিক্ষাপ্রদান করতে গিয়ে শিক্ষকগণ যেন কোমলমতি শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত প্রহার না করেন তা নিশ্চিত করা, কেউ মদের দোকান খুলেছে কি না, মদ পান করেছে কি না, নারীরা বেপর্দায় বের হচ্ছে কি না সে বিষয়ে নজরদারি করা। মোটকথা, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা, চারিত্রিক স্খলন প্রতিরোধ করা এবং সামাজিক উন্নতি-অগ্রগতি বজায় রাখাই ছিল এ বিভাগের প্রধান কাজ। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে নজরদারি করাও ছিল এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। কারণ ইসলামি রাষ্ট্র সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি শহরের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে মুসলিম সাম্রাজ্যে নানা পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী শ্রেণির আনাগোনা। এই বিভাগের মৌলিক দায়িত্ব ছিল কর্ম, শিল্পব্যবসা ও লেনদেনে প্রতারণা প্রতিরোধ করা। বিশেষত ওজন ও মাপদণ্ডের পরিমাপ ও বিশুদ্ধতা যাচাই করা।[৩১৩]

ইসলামি সভ্যতার প্রাক ও সমকালীন কোনো যুগে অন্য কোনো সমাজে এ ধরনের কোনো উদ্যোগের ইতিহাস পাওয়া যায় না। অথচ এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা জনগণের চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনে নজরদারি করে। একটি বিষয় সবাই জানেন যে, ইসলামি সভ্যতা মূলত দুটি মৌলিক ইস্যুকে সামনে রেখে কাজ করে থাকে। একটি হচ্ছে বাহ্যিক, অপরটি হচ্ছে আত্মিক। এর মধ্যে আত্মিক উন্নতি ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যেই আল-হিসবাহ বিভাগ ইসলামের চিরন্তন সত্য ও সুন্দর চরিত্রকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিয়েছে।

ইসলামি সভ্যতায় প্রথম এ কাজের সূচনা করেন স্বয়ং বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বাজারে একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় খাবারের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দেখেন ভেতরে ভেজা। তা দেখে তিনি বললেন, হে খাদ্যওয়ালা, ভেতরে এগুলো কী? উত্তরে সে বলল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে হে আল্লাহর

---

৩১৩. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২১১ ও এর পরের পৃষ্ঠাগুলো; ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২৫; আবদুন মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ৫৭।

রাসুল। তারপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেন তুমি ভেজা খাদ্যগুলো ওপরের দিকে রাখোনি, তাহলে তো মানুষ খাদ্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারত। মনে রেখো, যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩১৪]

প্রথম যখন একটি স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হয়, তখনই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম মক্কা বিজয়ের পর ইতিহাসে প্রথম মুহতাসিব (হিসবার দায়িত্বশীল) হিসেবে মক্কা নগরীর বাজারে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।[৩১৫] তার নাম সাইদ ইবনে সাইদ ইবনুল আস রা.। ইসলামের সূচনালগ্নেই এরকম কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত হয়।

মজার বিষয় হলো, নবীযুগে অনেক নারী সাহাবিও এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইবনে আবদুল বার লেখেন যে, সামরা বিনতে নাহিক আল-আসাদিয়া রা. নামক একজন নারী সাহাবি, তিনি মহানবীর সাক্ষাৎ পান এবং দীর্ঘায়ু লাভ করেন। তিনি বাজারে যেতেন এবং মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করতেন ও অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করতেন। তার সঙ্গে একটি চাবুক থাকত, কেউ অসৎ কিছু করছে দেখতে পেলেই তাকে চাবুক দিয়ে পেটাতেন।[৩১৬] এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাকে বাজারের মুহতাসিবাহ হিসেবে বহাল রাখেন। ইবনুল জাওযির বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, উমর রা. যখনই বাজারে যেতেন, ওই নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।[৩১৭] অর্থাৎ মহিলার বাড়িতে নয়, বরং বাজারে তিনি যেখানে বসতেন, সেখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাজারের খোঁজখবর নিতেন। এখানে মহিলার কাছে গেছেন শুনে পাঠকদের সন্দেহ করার কিছু নেই।[৩১৮]

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নিজেও মুহতাসিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ

---

৩১৪. *মুসলিম*, হাদিস নং ১০২; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৪৫২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩১৫; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২২২৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ৭২৯০।

৩১৫. ইবনে আবদুল বার, *আল-ইসতিআব*, খ. ১, পৃ. ১৮৫।

৩১৬. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬৩।

৩১৭. ইবনুল জাওযি, *সিরাতু উমর ইবনুল খাত্তাব*, পৃ. ৪১।

৩১৮. যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি*, খ. ২, পৃ. ৫৯২।

থেকে নিষেধ করতেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে মানুষকে উৎসাহ দিতেন। ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বারণ করতেন ও সাবধান করতেন। বাজারে গেলে একটি চাবুক বা লাঠি সাথে করে নিয়ে যেতেন। প্রতারণা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িতদের ওই লাঠি বা চাবুক দিয়ে শাসন করতেন।[৩১৯]

এরকম নজরদারি ও হিসবার কর্মসূচি খুলাফায়ে রাশেদিন এবং উমাইয়া শাসনামলে বিদ্যমান ছিল, তবে মুহতাসিব নামে নয়। এই নামটি প্রসিদ্ধি পায় আব্বাসীয় শাসনামলে। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর শাসনামলে বসরার বাজারে প্রথম মুহতাসিব নিয়োগ করেন সেনাপ্রধান যিয়াদ ইবনে আবিহি।[৩২০]

আব্বাসীয় যুগ থেকেই মুহতাসিবের পদ ও দায়িত্ব নতুনভাবে পরিচিতি পায়। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মনসুরের শাসনকাল থেকেই এ পদটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই সমাজের পুনর্বিন্যাস ও মুহতাসিবদের জন্য সুষ্ঠুরূপে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আবু জাফর মনসুর বাগদাদ ও আল-মাদিনাতুশ শারকিয়্যার বাজারগুলো কেন্দ্রীয় শহর ও সরকারি কার্যালয় থেকে দূরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে স্থানান্তর করে দেন। এরই ফলে বাবুল কারখ এবং বাবুশ শাইর শহরদুটিতে বাজার স্থানান্তরিত হয়। সেখানে নিযুক্ত হয় পৃথক পৃথক মুহতাসিব। বাজারে সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং মার্কেটের ত্রুটিপূর্ণ বিষয়গুলো সংস্কারের দায়িত্ব ছিল এসব মুহতাসিবের ওপর।[৩২১]

শুরুতে বাজারের পরিমাপ ও ওজন নির্ণয় করা, পণ্য মজুদ করা থেকে মানুষকে বারণ করা, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা, এগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল মুহতাসিবের দায়িত্ব। কিন্তু আব্বাসীয় যুগে মুহতাসিবের দায়িত্ব আরও সম্প্রসারিত হয়। ফলে মার্কেট ও মসজিদ পরিচ্ছন্নতার ওপর নজরদারি করা, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সময়মতো দায়িত্ব পালন করছেন কি না তা তদন্ত করা, এমনকি মুয়াজ্জিনগণ সময়মতো আযান দিচ্ছেন কি না তাও যাচাই

---

[৩১৯]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৫৭৮।
[৩২০]. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৩১৫।
[৩২১]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৪৮০।

করার দায়িত্ব ছিল মুহতাসিবদের ওপর। শুধু তাই নয়, কাযি ও বিচারকগণ সময়মতো এজলাসে বসছেন কি না তাও খতিয়ে দেখার দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল মুহতাসিবের। শুনে অবাক হতে হয়, এমনকি নানা পেশার মানুষ যথাযথ যোগ্যতা নিয়ে কাজে বসছেন কি না, তাও তদন্ত করার অধিকার ছিল মুহতাসিবদের। যেন সাধারণ মানুষ তাদের কাছে এসে প্রতারিত না হয়। একবার আব্বাসি খলিফা মুতাযিদ (মৃ. ২৭৯ হি.) প্রধান ডাক্তার সিনান ইবনে সাবিতকে নির্দেশ দেন বাগদাদের সকল ডাক্তারের পরীক্ষা নিতে। সর্বমোট ডাক্তারদের সংখ্যা ছিল ৮৬০ জন। অপরদিকে মুহতাসিবকে নির্দেশ দেন পরীক্ষায় টিকতে না পারলে কোনো ডাক্তারকে যেন চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া না হয়।[৩২২]

অনেক মুহতাসিব দণ্ড কার্যকর করতেন। আইন অমান্যকারী সরকারি আমলা ও সুলতানদের ওপর সাধারণ মানুষদের মতো শাস্তি প্রয়োগ করতেন। *সিয়ারুল মুলুক* গ্রন্থে নিজামুল মুলক লেখেন, একবার সেলজুক সুলতান মাহমুদ ইবনে মালিকশাহ রাজ সঙ্গীসাথি ও সরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে রাতভর মদ্যপানে লিপ্ত ছিলেন। ওই রাতে সেখানে দুজন সেনাপতি ও সুলতানের একান্ত কাছের ব্যক্তি আলি ইবনে নৌশতিকিন এবং মুহাম্মাদ আল-আরাবিও উপস্থিত ছিলেন। তারাও সুলতান মাহমুদের সঙ্গে সারা রাত মদ্যপানে লিপ্ত ছিলেন। ভোর হওয়ার সাথে সাথে আলি ইবনে নৌশতিকিনের মাথায় নেশা চড়ে যায়। রাতভর নির্ঘুম থাকা ও অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার চেহারায়। এই অবস্থায় তিনি সুলতানের কাছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সুলতান মাহমুদ তাকে বলেন, দিনের আলোতে মানুষের সামনে দিয়ে এরকম মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরা তোমার ঠিক হবে না। এখানে থাকো। আসর পর্যন্ত কোনো কামরায় বিশ্রাম নাও। নেশা চলে গেলে বাড়ি যেয়ো। এখন গেলে আমার আশঙ্কা, বাজারে দায়িত্ব পালনরত মুহতাসিব তোমাকে দেখে ফেলবে। আর এই অবস্থায় তুমি মুহতাসিবের সামনে পড়লে নিশ্চিত তোমাকে গ্রেফতার করে তোমার ওপর মদ্যপানের দণ্ড প্রয়োগ করবেন। তোমার মানসম্মান সব ধুলায় মিশে যাবে। আমিও টেনশনে পড়ে যাব, মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারব না। কিন্তু আলি ইবনে নৌশতিকিনের

৩২২. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবায়ি ফি তাবাকাতিল আতিব্বায়ি*, খ. ১, পৃ. ১১২।

হাতের ইশারায় পরিচালিত হতো পঞ্চাশ হাজার বলিষ্ঠ বীর সেনা। তিনি একাই এক হাজার মানুষের সমান বলে লোকমুখে প্রসিদ্ধি ছিল। তার কল্পনায়ও আসেনি যে, একজন মুহতাসিব তাকে গ্রেফতার করে তার ওপর মদ্যপানের শাস্তি প্রয়োগের দুঃসাহস দেখাবেন। তাই নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন ও সুলতানের পরামর্শ না শুনে তিনি মাতাল অবস্থায়ই বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। সুলতান রক্ষীদের বললেন, তাহলে নিজের মতেই চলবে, ঠিক আছে, তাকে যেতে দাও। এরপর আলি ইবনে নৌশতিকিন তার সেনা, কর্মচারী ও সেবকদের নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। আল্লাহর কী ইচ্ছা, ঠিক সে সময় মুহতাসিব অশ্বারোহী ও পদাতিকদের সমন্বয়ে একশ সঙ্গী নিয়ে বাজারে টহল দিচ্ছিলেন। সেনাপতি আলিকে মাতাল অবস্থায় দেখে তাকে ঘোড়া থেকে নামানোর নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমতো সেনাপতি নিজেই ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। এরপর তার সঙ্গী একজনকে বললেন আলির মাথায় চেপে বসতে। আরেকজনকে বললেন তার পা চেপে ধরে বসে যেতে। এরপর বাজারের মাঝখানে কোনোরকম দয়াপ্রদর্শন ছাড়া তার গায়ে শক্তভাবে চল্লিশটি চাবুক মারেন। চাবুকের আঘাতে তার দাঁত গিয়ে মাটির সঙ্গে লেগে যায়। অপরদিকে সেনাপতির ওপর দণ্ড প্রয়োগের দৃশ্য দেখছিলেন তার সহযোদ্ধা ও সঙ্গীসাথিরা। প্রতিবাদ করবে তো দূরের কথা, মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ উচ্চারণ করার সাহস পর্যন্ত পায়নি কেউ।[৩২৩]

এটিই সেই ইসলামি সভ্যতা যার দৃষ্টিতে, হাতের ইশারায় পঞ্চাশ হাজার সেনাকে পরিচালনায় সক্ষম সেনাপতির মাঝে ও মাত্র একশ জনবলের অধিকারী মুহতাসিবের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উপরন্তু মুহতাসিব সেনাপতির ওপর শুধু শাস্তিই প্রয়োগ করেননি, বরং প্রয়োগ করেছিলেন তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে। কিন্তু নীরবতা ভঙ্গ করে সামান্য টুঁ শব্দটুকুও করার কারও সাধ্য ছিল না। কারণ সত্য তো সচেতন মুহতাসিবের পক্ষেই ছিল, যিনি সেনাপতির ওপর শাস্তি প্রয়োগ করে শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছেন।

এ কারণেই খলিফা, আমির ও সুলতানগণ সবসময় মুহতাসিব পদের জন্য যোগ্য, জ্ঞানী ও সাহসী মানুষদের নিয়োগ দিতেন। *নিহায়াতুর রুতবা*

---

৩২৩. নিজামুল মুলক, *সিয়াসাতনামা*, পৃ. ৮০-৮১।

গ্রন্থে ইবনুল ইখওয়া বলেন, দামেশকের সুলতান আতাবেক তুগতেকিন একবার মুহতাসিব খোঁজ করলে তাকে একজন বিজ্ঞ ও সাহসী মানুষের সন্ধান দেওয়া হলো। তিনি তাকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত করতে বললেন। তিনি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলে সুলতান তাকে বললেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য মুহতাসিব হিসেবে আমি আপনাকে নিয়োগ দিচ্ছি। তা শুনে তিনি বললেন, তাই যদি হয় তবে আপনার এই তোষক থেকে উঠে দাঁড়ান এবং ওই দামি গদি অপসারণ করুন। কারণ উভয়টি রেশমের তৈরি। আপনার হাতের ওই আংটি খুলে ফেলুন। কারণ তা স্বর্ণের। স্বর্ণ ও রেশমের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ حَرامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»

> রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। তবে নারীদের জন্য হালাল।[৩২৪]

এ কথা শোনামাত্রই সুলতান তোষক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। গদি সরিয়ে নিতে বললেন। হাত থেকে আংটি খুলে ফেললেন। বললেন, এ দায়িত্বের পাশাপাশি এখন থেকে পুলিশদের ওপর নজরদারি করার দায়িত্বও আপনাকে দেওয়া হলো। সে সময়ে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী মুহতাসিব।[৩২৫]

এ কারণেই মুহতাসিবের পদটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় গোলযোগ, বিপর্যয় ও মূল্যস্ফীতির সময়। ৩০৭ হিজরি সনে একবার বাগদাদে জিনিসপত্রের দাম লাগামহীনভাবে বেড়ে যায়। জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়ে। মিম্বরগুলো ভেঙে ফেলে। মসজিদে গিয়ে নামায পড়া বর্জন করে। ব্রিজ ও কালভার্টগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে।[৩২৬] তৎকালীন মুহতাসিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ইবরাহিম ইবনে বাতহা তখন বিদ্রোহ দমনে জরুরি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। এক কোর (২,৩৫৪.৮৩ কেজি প্রায়) পরিমাণ আটার দাম

---

[৩২৪]. তাহাবি, *মুশকিলুল আছার*, হাদিস নং ৪২০৯।

[৩২৫]. ইবনুল ইখওয়া, *নিহায়াতুর রুতবাতি ফি তলাবিল হিসবাতি*, পৃ. ৭৮।

[৩২৬]. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক আল-হামাযানি, *তাকমিলাতু তারিখিত তাবারি*, পৃ. ২১।

বেঁধে দেন পঞ্চাশ দিনার। যার ফলে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা অনেকটাই কমে যায়।[৩২৭]

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই পদের জন্য যাদের নিয়োগ দেওয়া হতো, তাদের জন্য এটি অপমানজনক বা বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ছিল না। কারণটি সবাই জানেন, ইসলামি সভ্যতা সবসময় অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং সাধ্যমতো অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো মহান আদর্শের ওপরই সকল মুসলিমকে গড়ে তুলেছে। এর চেয়েও আরও মহত্ত্বের দিক হচ্ছে, আমাদের এই চিরন্তন সভ্যতা প্রতিটি মুসলিমকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুহতাসিবের দায়িত্ব প্রদান করেছে। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে ইমাম ইবনে কাসির রহ. লেখেন, একবার আবুল হুসাইন নুরি নামক এক ব্যক্তি একটি নৌযানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তাতে মদ বোঝাই করা অনেকগুলো বড় মাটির পাত্র। নাবিককে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? এগুলো কার? উত্তরে নাবিক বলল, এগুলো বাদশা মুতাযিদের জন্য আমদানি করা মদ। এ কথা শোনামাত্রই ওই ব্যক্তি নৌযানে উঠে একটি ছাড়া বাকি সব পাত্র নিজ হাতে থাকা লাঠির আঘাতে ভেঙে দিলেন। শেষের পাত্রটি ভাঙার জন্য নাবিকের সহযোগিতা চাইলেন। ততক্ষণে সেখানে পুলিশ এসে হাজির। তাকে গ্রেফতার করে বাদশা মুতাযিদের সামনে উপস্থিত করা হলো। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি মুহতাসিব। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে মুহতাসিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন? তিনি বললেন, যে আপনাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছেন! এ কথা শুনে বাদশা মুতাযিদ মাথা নিচু করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ তুমি কেন করেছ? তিনি বললেন, আপনার ওপর এহসান করার জন্য। আপনার থেকে অনিষ্ট দূর করার জন্য। তা শুনে বাদশা আবারও মাথা নিচু করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে একটি পাত্র বাকি রেখেছ কেন? উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমে আমি সব পাত্র ভেঙেছি একমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশকে সম্মান দেখিয়ে। কাউকে পরোয়া করিনি। কিন্তু শেষ পাত্রটি যখন ভাঙতে যাব তখন আমার মনে একপ্রকার

---

৩২৭. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক আল-হামাযানি, *তাকমিলাতু তারিখিত তাবারি*, পৃ. ২১।

গর্ববোধ চলে আসে যে, বাদশার নিজস্ব কোনো বস্তু ভেঙে আমি মস্ত বড় বাহাদুরি করে ফেলেছি। যার ফলে আমি তা ভাঙিনি। লোকটির এ উত্তর শুনে মুতাযিদ বললেন, তাহলে যাও। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। যেসব অন্যায় ও অপরাধে বাধা দিতে চাও, বাধা দাও। তা শুনে তিনি বললেন, এখন আর আমি কোনো অপরাধে বাধা দেবো না। বাদশা বললেন, কেন? বললেন, এর আগে আমি এ কাজ করতাম একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে। আর এখন আমি বাধা দেবো মুক্তির শর্ত পূরণের জন্য। বাদশা বললেন, তোমার কোনো প্রয়োজন থাকলে বলতে পারো। তিনি বললেন, শুধু নিরাপদে আমাকে এখান থেকে যেতে দিন, ব্যস, এটুকুই। এরপর তাকে নিরাপদে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে বললে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে বসরায় চলে আসেন। কেউ তাকে ব্যবহার করে মুতাযিদের কাছে কিছু প্রার্থনা করতে পারে এই আশঙ্কায় বসরায় তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর বাদশা মুতাযিদের ইনতেকাল হয়ে গেলে আবার তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন।[৩২৮]

মুহতাসিব অবস্থা অনুপাতে নিজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী নম্রতা ও কঠোরতা অবলম্বন করার ক্ষমতা রাখতেন। অপাত্রে বিনয়ের ব্যবহার বা কড়াকড়ি আরোপ তার করণীয় ছিল না। এ কারণেই খলিফা মামুন একজন কঠোর মুহতাসিবকে দেখে বলেছিলেন, শুনে রাখুন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদেরকে আমার চেয়েও নিকৃষ্ট একজনের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং মুসা আ. ও হারুন আ.-কে বলেছিলেন,

﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾

> এরপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে।[৩২৯]

ইসলামি সমাজের প্রতি একজন মুহতাসিবের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ দিতে গিয়ে সমকালীন একজন গবেষক বলেন, আমাদের বর্তমান সময়ে বিভিন্ন শহরে যে পৌরসভা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা কসাই, রুটিওয়ালা, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর হয়তো নজরদারি

---

৩২৮. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৮৯।

৩২৯. সুরা তহা : ৪৪।

করে থাকে। চিকিৎসাবিভাগও কখনো নজরদারি করে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যবাজার যাতে বস্ত্র, নির্মিত পণ্য ও উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করা হয় তার ওপর এসব পৌরসভার কোনো প্রভাব আছে বলে আমার মনে হয় না। অপরদিকে স্বাধীন পেশার মানুষ যারা আছেন, বিশেষ করে ডাক্তার, অ্যাডভোকেট, উকিল, ফার্মাসিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, প্রভাষক; তাদের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করার কোনো অধিকার পৌরসভার নেই বললেই চলে। এ কারণেই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ইসলামি সভ্যতায় একজন মুহতাসিবের ক্ষমতা ও আধিপত্য নিশ্চিতভাবে বর্তমান সময়ের একজন পৌর মেয়র বা গভর্নরের ক্ষমতার চেয়ে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল।[৩৩০]

মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণে সচেষ্ট ছিলেন মুহতাসিবগণ। এ ব্যাপারে অনেক রচনা ও পুস্তকও সংকলন করা হয়েছে। এর চেয়েও আকর্ষণীয় বিষয় হলো, কিছু সূক্ষ্ম বিষয়, যেগুলো সাধারণত কারও চোখে পড়ে না, কেউ গুরুত্ব দেয় না সেসব বিষয়কেও মুহতাসিবগণ গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিয়েছেন। যার মাধ্যমে আমাদের এই চিরন্তন সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষের দিকটি ফুটে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশিষ্ট লেখক জিয়াউদ্দিন ইবনুল ইখওয়া (মৃ. ৭২৯ হিজরি) একজন মুহতাসিব যেসব নিয়ম ও বিধান সমাজে প্রয়োগ করবেন সে বিষয়ে একটি সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতিপূর্বে এরকম দিক-নির্দেশনা অন্য কারও লেখায় পাওয়া যায়নি। খাদ্যসামগ্রী ও রুটি প্রস্তুতকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারি করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, মুহতাসিব নির্দেশ দেবেন তারা যেন চুলার ওপরে ছাদ খোলা রাখে। যাতে ধোঁয়া বের হওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। প্রতিবার রুটি তৈরির আগে রান্নাঘর ঝাড়ু দেবে এবং পরিষ্কার রাখবে। আটা বা ময়দা মাখার পাত্রটি প্রতিবার ধৌত করবে এবং সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখবে। সেজন্য খেজুরগাছের পাতা দিয়ে তৈরি একপ্রকার ছোট চাটাই ব্যবহার করবে, তার মাঝে প্রতিটি খামিরা মাখার পাত্রের জন্য স্থাপিত থাকবে দুটি শক্ত কাঠ। পায়ের সাহায্যে বা হাঁটু মাড়িয়ে বা কনুই দিয়ে কেউ যেন খামিরা তৈরি না করে। কারণ এতে খাদ্যদ্রব্যের অপমান হয়। এরকম

---

৩৩০. আজলানি, *আবকারিয়্যাতুল ইসলাম ফি উসুলিল হুকমি*, পৃ. ৩৪৩; তিনি বর্ণনা করেছেন কুসাই আল-হুসাইনের লেখা *মিন মাআলিমিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৪।

করলে বগলের নিচের বা শরীরের যেকোনো জায়গা থেকে সেখানে ঘাম পড়তে পারে। খামিরা তৈরির সময় যেন আস্তিন ছাড়া জামা ব্যবহার করে। যাতে আস্তিন ঝুলে গিয়ে খামিরা স্পর্শ না করে। আর খামিরা যেন আবৃত থাকে। কেউ হাঁচি দিলে বা কথা বললে নাক বা মুখের ময়লা বা থুথু গিয়ে যেন সেখানে না পড়ে। আর খামিরা তৈরির সময় অবশ্যই মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে নেবে, যেন মাথার ঘাম খামিরায় না পড়ে। দুই হাতের পশম মুণ্ডন করে রাখবে, সেখান থেকেও যেন খামিরাতে কিছু না পড়ে। দিনের বেলায় খামিরা তৈরি করলে পাশে অবশ্যই একজন লোক রাখতে হবে, যে মাছি তাড়ানোর যন্ত্র দিয়ে মাছি তাড়াবে।[৩৩১]

একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামি সভ্যতা সকল পেশার মানুষের ওপর নজরদারি অব্যাহত রেখে মুসলিমদের কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করেছে। যার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এই সভ্যতা জনকল্যাণ ও মানবাধিকার রক্ষা করেছে। জনগণের সুখ ও শান্তির জন্য সকল উপকরণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ইবনুল ইখওয়ার দেওয়া এসব জোরালো নির্দেশনা হালের অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের জনসেবাতেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। বরং আজকাল আমরা পরিচ্ছন্নতার ও শিষ্টাচারের সকল কায়দাকানুন গ্রহণ করেছি ইউরোপীয় কৃষ্টি ও পশ্চিমা সভ্যতা থেকে। অপরদিকে ভুলে গেছি যে, ইসলামি সভ্যতা একজন মুসলিমের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মুহতাসিবদের সমন্বয়ে নিরাপত্তামূলক নীতিমালা নির্ধারণের অনিবার্যতা বিষয়ে উজ্জীবিত করেছে। যারা কঠোরভাবে সেসব নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে। *মাআলিমুল কুরবাতি ফি তলাবিল হিসবাতি* গ্রন্থটি মুহতাসিবের দায়িত্ব ও সামাজিক নীতি-আদর্শ রক্ষার আলোচনাধর্মী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্বকোষ বলা চলে। এ গ্রন্থটি আমলে নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে সেখানে বর্ণিত সকল নিয়মকানুন অনুসরণ করা সময়ের দাবি। কারণ এগুলো বাস্তবায়ন করে বহু দেশের বহু যুগের বহু সমাজের সংস্কার সাধন সম্ভব।

মরক্কো এবং স্পেনেও খিলাফতের সূচনালগ্ন থেকে মুহতাসিবের পদ বিদ্যমান ছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সেখানকার মুহতাসিবগণ শিশু ও দাসীদের সাহায্যে ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ীদের খুঁজে বের করতেন। যেমন

---

৩৩১. ইবনুল ইখওয়া, *মাআলিমুল কুরবাতি ফি তলাবিল হিসবাতি*, পৃ. ১৫০।

একজন ব্যবসায়ীর কাছে একজন শিশু বা দাসীকে পাঠাতেন কিছু পণ্য কেনার জন্য। এরপর পরীক্ষা করতেন, সেই পণ্যের মাপ ও ওজন যথাযথ কি না। এভাবেই অন্য মানুষের সঙ্গে তার বিশ্বস্ততা ও লেনদেনের বিষয়টি অনুমান করে নিতেন। হেরফের হলে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করতেন। একাধিকবার প্রতারণার বিষয়টি প্রমাণিত হলে এবং বারবার প্রহার ও বাজারে লোকদের সামনে লজ্জিত করার পরও সংশোধন না হলে তাকে শহর থেকে বিতাড়িত করতেন। ফকিহগণ যেভাবে ফিকহের বিধিবিধান নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করতেন, মুহতাসিবগণও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করতেন। কেননা, হিসবা লেনদেনসহ নানা বিষয়ের (যার আলোচনা সময়সাপেক্ষ) সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখে।[৩৩২]

স্পেনের মুহতাসিবগণ মর্যাদার যে সুউচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন, তার পুরস্কারস্বরূপ মালাগার নবনিযুক্ত মুহতাসিব মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম আশ-শুদাইদের উদ্দেশে করে একটি অভিবাদন ও সতর্কতামূলক পত্র লেখেন আন্দালুসের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও জ্ঞানী লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিব। চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

> হে পবিত্র ও গুণধর মুহতাসিব, আপনাকে আপনার কাঙ্ক্ষিত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় সাদর সম্ভাষণ। আপনাকে মিছে প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়া থেকে সতর্ক করছি। এমন এক সময়ে আপনাকে পত্র লিখছি যখন বিক্রেতারা আপনার বাহন ঘিরে উপচে পড়েছে, আপনার আনুগত্য সকলে মেনে নিয়েছে, আপনাকে তোষামোদ করতে মানুষের লালসা বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি কালক্ষেপণ না করে সকল প্রতারক ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করেছেন। তাদের উঠবস করাচ্ছেন। আপনার প্রভাব প্রবল বাতাসতুল্য। আপনার সামনে আছে সরল এক দাঁড়িপাল্লা। মনে রাখবেন, আপনার শত্রুপক্ষ কখনোই বসে থাকবে না। তারা ফাঁদ পাতবে। বিত্তশালীরা আপনার বিরোধিতায় নানা চক্রান্ত করবে। আপনি যদি নির্লোভ থাকতে পারেন তাহলে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ থাকবে আর যদি তাদের জালে পা দিয়ে ফেঁসে যান, আর সম্পদের পাহাড় গড়ে

---

৩৩২. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ২১৯।

তোলেন, তাহলে আপনি আপনার ক্ষমতাকে বিসর্জন দিয়ে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন।[৩৩৩]

মামুলক রাজবংশের শাসনামলেও মুহতাসিবের অনেক কদর ছিল। উপর্যুক্ত বর্ণিত সকল দায়িত্বের সাথে সেখানে যুক্ত ছিল সকল প্রকার ফেতনা ও গোলযোগ দমন করার মতো কঠিন কাজও। তা ছাড়া মানুষের মাঝে বিভেদ তৈরি করে এমন সব গুজব ও প্রোপাগান্ডা নির্মূল করাও ছিল সে আমলের মুহতাসিবদের অন্যতম দায়িত্ব। ৭৮১ হিজরি সনে সুলতান বারকুকের শাসনকালে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যায়। একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, একটি প্রাচীর থেকে একজন মানুষের কণ্ঠ ভেসে আসছে। এই ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর মানুষ ফেতনায় পড়ে যায়। রজব ও শাবান এ দুই মাস এভাবেই প্রোপাগান্ডা চলতে থাকে। মানুষ ভাবতে থাকে, ভেতর থেকে কোনো জিন বা ফেরেশতা কথা বলছে। কেউ কেউ বলছিলেন, হায় আল্লাহ! আমাদের রক্ষা করুন, প্রাচীর কথা বলছে। এ সম্পর্কে ইবনুল আত্তার একটি কবিতাও রচনা করেন,

يا ناطقا من جدار وهو ليس يرى ☆ اظهر وإلا فهذا الفعل فتان

لـم تسمع الناس للحيطان ألسنة ☆ وإنـمـا قيل للحيـطان آذان

প্রাচীরের ভেতর থেকে ভেসে আসা অদৃশ্য হে বক্তা, তুমি প্রকাশ হও। তা না হলে এটি বিরাট ফেতনা বয়ে আনবে। কারণ প্রাচীরের মুখ আছে এ কথা কখনো মানুষ শোনেনি। তবে প্রসিদ্ধি আছে যে, দেয়ালেরও কান থাকে।

ঘটনার বাস্তবতা জানার জন্য অনুসন্ধান ও তদন্তে নামেন মুহতাসিব জামালুদ্দিন। প্রথমে তিনি ওই বাড়িতে ঢুকে সেখানে দেয়াল থেকে আওয়াজ শুনতে পান। এরপর একজন সেনাকে সেখানে টহল দিতে বলেন ও তার গোলামকে বাড়ি বিরান করতে নির্দেশ দেন আর তাই করা হয়। কিছুদিন পর সেই প্রাচীর থেকে আবার কণ্ঠ ভেসে আসতে থাকে। ফলে আবার তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রাচীরকে সম্বোধন করে এ কথা বলার আদেশ করেন, আর কতদিন তুমি মানুষকে ফেতনায় ফেলবে? প্রাচীরের ওপাশ থেকে উত্তর আসে, আজকের পর আর করব না। এ কথা

৩৩৩. ইবনুল খতিব, *আল-ইহাতাতু ফি আখবারি গারনাতাহ*, খ. ১, পৃ. ৪১৩।

শুনে মুহতাসিব চলে যান। কিছুদিন পর শুনতে পান পুনরায় সেখান থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে। এবার তার ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ঘটনাটি পরিকল্পিত, তাই আবারও তিনি কোমর বেঁধে ঘটনার তদন্তে নামেন। শেষ পর্যন্ত রহস্য উন্মোচিত হয় যে, এখানে রুকনুদ্দিন উমর নামক এক ব্যক্তি আহমাদ আলফিশি নামক অপর ব্যক্তির সঙ্গে মিলে এই কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন। তারা দুজনে মিলে আহমাদ আলফিশির স্ত্রীকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দেন, আর ওই নারী প্রাচীরের ওপাশ থেকে লাউয়ের খোলে অদ্ভুত কণ্ঠে সেগুলো বলতে থাকে। যা শুনতে একদম মানুষের আওয়াজের মতো নয়। সুলতান বারকুক এ ঘটনা জানতে পেরে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ওই দুই ব্যক্তিকে চাবুক দিয়ে পেটানোর এবং ওই নারীর পায়ের নিচে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। কারণ তাদের কারণে দীর্ঘদিন অনেক মানুষের প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে।[৩৩৪] আর এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সুলতান মুহতাসিব জামালুদ্দিনকে সম্মানসূচক পোষাক পরিয়ে দেন।

উপর্যুক্ত ঘটনাটি ইতিহাসের একটি রসাত্মক ও মজাদার ঘটনা হতে পারে, কিন্তু ইসলামি সভ্যতা সবসময় মানুষের স্বাভাবিক নীতি-আদর্শ বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত কোনো পরিবর্তন সাধন হওয়ার আশঙ্কা করলে তাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনায় প্রথমে সবাই ভাবতে শুরু করে, এখানে জিন বা কোনো ফেরেশতা কথা বলছে। এই ফিতনা নির্মূলের জন্য মুহতাসিব বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখি করেন। কারণ এরকম আওয়াজ করে তারা মানুষের কাছ থেকে টাকা চাইত। যার ফলে এ ঘটনাটি সরাসরি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করে। মানুষের অর্থ চুরি করার একটি অভিনব কৌশল তারা আবিষ্কার করে। আর মানুষ না জেনে না বুঝে নিজেদের বিশ্বাসকে বিক্রি করে তাদেরকে টাকা দিতে শুরু করে। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের সুদক্ষ ও বিজ্ঞ মুহতাসিবগণ ঠিকই প্রায় দুই মাস ধরে চলমান এ ফেতনা ও অস্থিরতা মূলোৎপাটন করে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছেন।

---

৩৩৪. ইবনে হাজার আসকালানি, *ইনবাউল গুমর বি আবনায়িল উমর ফিত-তারিখ*, খ. ১, পৃ. ৩০৯-৩১০।

এমনকি মহামারি ও দুর্যোগেও মুহতাসিবদের দায়িত্ব ছিল অসামান্য। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মাকরিযি লেখেন, ৮২২ হিজরি সনে একবার মিশরের কায়রো ও পল্লি অঞ্চলগুলোতে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে মুহতাসিবের পক্ষ থেকে ৮ রবিউস সানি বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয় সবাই যেন পরবর্তী ১৫ রবিউস সানি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনটি রোযা রাখে। শেষদিন ১৫ রবিউস সানি বৃহস্পতিবার সবাই সুলতানের নেতৃত্বে উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরে জড়ো হয়ে মহামারি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। এরপর পুনরায় আবার ঘোষণা করা হয় যে, আগামীকাল থেকে রোযা পালন করতে হবে। এইরকম সুন্দর ও অভিনব উদ্যোগের ফলে ঠিকই মানুষের মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে কমে যায়।[৩৩৫]

মুহতাসিবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধের সময় সড়ক ও অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে জিহাদে অংশ নিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। তারা আমির বা সুলতানের সাথে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতেন। শামের সীমান্তবর্তী তারাসুস শহরের মুসলিমগণ কীভাবে জিহাদের জন্য বের হতেন, সেই বিবরণ উঠে এসেছে বিখ্যাত লেখক ইবনুল আদিম[৩৩৬] রচিত *বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালাব* গ্রন্থে। সে সময়ের মুহতাসিবের কর্মতৎপরতার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লেখেন, মুহতাসিব তার পায়দল লোকবল নিয়ে সকল ছোটখাটো সড়ক প্রদক্ষিণ করতেন। দিনের বেলায় হলে অনেক শিশু-কিশোর তার দলে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে মানুষকে জিহাদে বের হওয়ার আহ্বানে তাকে সহযোগিতা করত। অনেক সময় জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমাণ যোদ্ধার প্রয়োজন হতো জিহাদের জন্য। তখন বাজারের লোকদেরকেও জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো। যেদিকেই হোক, যত দূরেই হোক, সেখানে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো।[৩৩৭]

---

৩৩৫. মাকরিযি, *আস-সুলুক*, খ. ৬, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬।

৩৩৬. পুরো নাম উমর ইবনে আহমাদ ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবি জারাদাহ আল-উকাইলি (৫৮৮-৬৬০ হি./১১৯২-১২৬২ খ্রি.)। আলেপ্পোয় তার জন্ম। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে দামেশক, ফিলিস্তিন, হেজায ও ইরাক সফর করেন। শেষ পর্যন্ত তার ইনতেকাল হয় কায়রোয়। তার অন্যতম গ্রন্থ *বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালাব*। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৪০।

৩৩৭. ইবনুল আদিম, *বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালাব*, খ. ১, পৃ. ৮৪।

এরকম কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মুহতাসিবের দায়িত্ব ছিল অসামান্য। কারণ জিহাদের জন্য সৈন্যদলে যোগদান সে সময় জোরপূর্বক ছিল না। মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদে শরিক হতে চাইত, কেবল তাদেরকেই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এ কারণেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজটি তখন খুব সহজ ছিল না। এজন্য মানুষের ঘরবাড়ি ও বাজার সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন ছিল। এ সত্ত্বেও এ সময় একজন মুহতাসিব তার মূল দায়িত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ঘোষকের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে ওঠা শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে তাদের উৎসাহিত করতেন।

সব মুহতাসিব যে সাধু ও ভালো ছিলেন, তা কিন্তু নয়। কিছু মুহতাসিব দণ্ড প্রয়োগে সীমালঙ্ঘন করেছে। অবৈধভাবে করারোপ করেছে, অন্যায়ভাবে অর্থ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামি সরকার তাদের বিন্দুমাত্রও ছাড় দেয়নি। দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে লাগামহীনভাবে তাদের ছেড়ে দেয়নি। কায়রোতে এরকমই একজন মুহতাসিব ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে শাবান আশ-শামস। একসময় তিনি মানুষের ওপর জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন চাপিয়ে দেন। কিছু সহচরকে নিযুক্ত করেন দরিদ্র ও ব্যবসায়ীদের থেকে চাঁদা ওঠানোর জন্য। মামলুক সুলতান আল-মুআইয়াদ শেখ (৮১৫-৮২৪ হি.) এ ঘটনা জানতে পেরে সেই মুহতাসিবকে গ্রেফতার করে সুলতানের সামনেই তিনশবারের অধিক লাঠিপেটা করে তাকে চাকরিচ্যুত করার নির্দেশ দেন।[৩৩৮]

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মধ্যযুগে বিশেষ করে ক্রুসেড যুদ্ধের সময় মুসলিমদের অনুসৃত আল-হিসবাহ নীতি মুসলিমদের থেকে গ্রহণ করে ইউরোপ। প্রাচ্যের যেসব নগরী ক্রুসেডাররা দখল করে সেসব নগরীতেও তারা মুহতাসিবের পদ বহাল রাখে এমনকি ইউরোপের বিভিন্ন শহরে তা প্রচলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকার করার পর ক্রুসেডারদের কর্তৃক সেখানকার বিচারিক নীতিমালা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে এর নাম দেওয়া হয় *আন-নুযুমুল কাযায়িয়্যা লি-বাইতিল মুকাদ্দাস*। এই বিচারিক নীতিমালা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মুহতাসিব শপথ

---

৩৩৮. ইবনে হাজার, *ইনবাউল গুমর বি আবনায়িল উমর ফিত-তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১১০।

করবেন যে, সবসময় তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। বাদশার অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করবেন। মুহতাসিবের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে বাজারে গিয়ে মাংস বিক্রয়ের দোকান ও নানা খাদ্যসামগ্রী ও পানীয়ের বিপণীগুলোতে গিয়ে অনুসন্ধান করবেন। সাধারণ বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালারা তাদের পণ্যে কোনো ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে কি না তা তদন্ত করবেন। মার্কেটে রুটির দোকানগুলোতে গিয়ে দেখবেন রুটিগুলো পর্যাপ্ত পরিমাপে আছে কি না। এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপের সঙ্গে রুটির ওজনের মিল আছে কি না।[৩৩৯]

জনগণের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রশান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ও নানা সংকট, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত রাখতে আগ্রহী এবং সমাজকে আধ্যাত্মিক, শিষ্টাচার ও বস্তুগত দিকসীমা ও শর্তের উর্ধ্বে (তবে নিরাপত্তাধর্মী ও বৈধ রুচিগত সীমা তো মেনে নিতেই হবে) ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত করতে আগ্রহী দূরদর্শী একজন শাসকের চিন্তার চূড়ান্ত ফসল ইসলামের 'হিসবাহ' ব্যবস্থা হতে পারে বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের কোনো শাসক এমন নেই যিনি, হিসবাহ ও মুহতাসিবের মতো সুনির্দিষ্ট কোনো পদের আদলে জনগণের সুরক্ষার এমন কোনো কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নের সৎসাহস রাখেন।[৩৪০]

ইসলামি সভ্যতায় এভাবেই বিচারবিভাগ এবং তার অধীনে থাকা সকল পদ ও দায়িত্বের লোকজন ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় অবিরাম কাজ করে গেছেন। জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। যার নজির পূর্বের ও সমকালের যেকোনো সভ্যতা ও জনগোষ্ঠীর মাঝে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে।

---

৩৩৯. *আল-হিসবা ওয়াল-মুহতাসিব*, পৃ. ৩৯-৪১; যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি*, খ. ২, পৃ. ৬১২-৬১৩।

৩৪০. মুস্তাফা আশ-শাকআ, *মাআলিমুল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮৪।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

সামরিক বিভাগ

আরবি ভাষায় (الجيش) জাইশ শব্দটি সৈন্যবাহিনী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত একদল সশস্ত্র যোদ্ধা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। একটি মতে, কোনো যুদ্ধ সংঘটিত করার জন্য অথবা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে সশস্ত্র অংশগ্রহণের জন্য যে সামরিক বাহিনী তৈরি করা হয় তাকেই বলা হয় জাইশ। ইসলামের সূচনালগ্নে সেনাবাহিনী গঠন ও বিন্যাসের বিষয়টি ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। কিন্তু সময় যতই গড়িয়েছে, ততই তা আরও আধুনিক ও সুসংগঠিত হয়েছে। সেজন্য স্বতন্ত্র সামরিক নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম আগমনের পূর্বে আরবদের সুসংগঠিত কোনো সামরিক নীতিমালা ছিল না। সবাই অস্ত্র বহন করতে পারত। যখনই যুদ্ধের ডাক আসত, নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করার জন্য সকলেই তির, তলোয়ার, ধনুক নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। গোত্রের একজন যুদ্ধপ্রিয় দুর্ধর্ষ ও সাহসী যোদ্ধা তাদের নেতৃত্ব দিতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি হতেন গোত্রাধিপতি।[৩৪১]

ইসলাম আসার পর মুসলিমদের জন্য আল্লাহর পথে কিতাল ও জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়। সে হিসেবে প্রতিটি মুসলিমই একেকজন সেনা। ধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও অসামান্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর পথে শহিদ হওয়ার বাসনাই তাদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।[৩৪২]

---

৩৪১. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৫০।

৩৪২. প্রাগুক্ত।
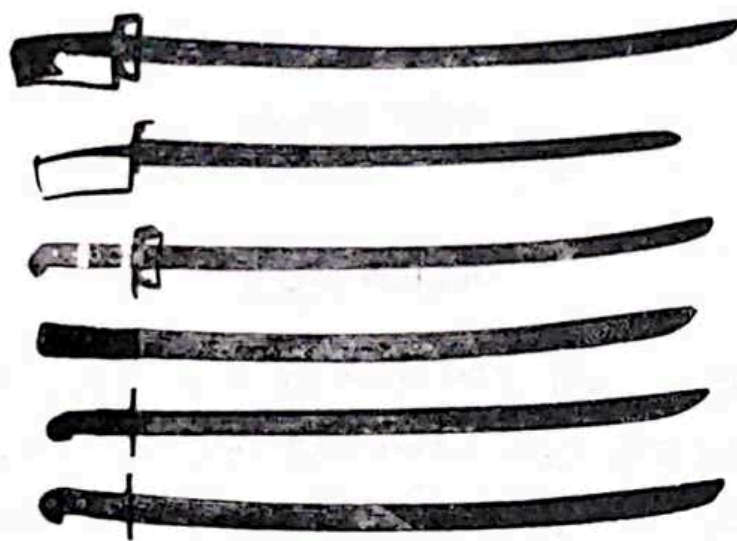
চিত্র নং-২
তরবারি

অপরদিকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ছিলেন মুসলিম সেনাপ্রধান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর যখন ইসলাম আরব উপদ্বীপ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হতে থাকে, যুদ্ধের পটভূমি বাড়তে থাকে, নানা অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য একাধিক সেনাদল তৈরি হয়ে যায়, তখন স্বয়ং খলিফার একার পক্ষে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করা কঠিন ও দুষ্কর হয়ে পড়ে। ফলে এই পদের জন্য যোগ্য, সাহসী, দূরদর্শী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও সুসমন্বয়কারী একজনকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেন। সকল যোদ্ধার ওপর আবশ্যক ছিল সেই সেনানায়কদের দিক-নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা। প্রস্তুতি ও যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষার লক্ষ্যে প্রতিটি যুদ্ধের আগে এবং প্রতিবার শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে সেনাপতিগণ সৈনিকদের কুচকাওয়াজ করাতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাই করতেন। আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেনাপতির দায়িত্ব ছিল সেনাদের প্রস্তুতি, ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র আরও নিখুঁত ও কার্যকর করা এবং আরও বেশি উন্নত করা।[৩৪৩]

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সৈনিকদের কল্যাণের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি স্বতন্ত্র

৩৪৩. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৫৩।

সামরিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। যার বিবরণ আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। সৈনিকদের নাম, পদবি, দায়িত্ব, ভাতা ইত্যাদি আলাদা করে রেজিস্ট্রেশন করা এবং সেনাদের সকল বিষয় সুবিন্যস্তরূপে সম্পাদন করাই ছিল ওই বিভাগের কাজ। এরপর যখন একের পর এক মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হতে থাকে, খিলাফতের রাজধানীতে যুদ্ধলব্ধ অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য ঘটতে থাকে, পুরো পৃথিবীজুড়ে মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন শহরে মুসলিমগণ স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন, তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আশঙ্কা করেন যে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় সকল যোদ্ধা জিহাদ থেকে হাত ধুয়ে বসে পড়বে, অবসর গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন ও বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে যাবে। ফলে তিনি সবাইকে আবারও জিহাদের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। সৈনিকদের পরিবারের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভাতার ব্যবস্থা করেন। কোনো যোদ্ধা বিনা অজুহাতে জিহাদ বর্জন করলে তাকে তিরস্কৃত করতেন।

তা ছাড়া শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়া মুজাহিদ বাহিনীর বিশ্রামের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিভিন্ন প্রদেশের নির্দিষ্ট পয়েন্টে পয়েন্টে বড় বড় দুর্গ ও সেনানিবাস স্থাপন করেন। বিভিন্ন শহর স্থাপন করেন। যেমন বসরা, কুফা, ফুসতাত। এগুলো সেনাবাহিনীর বিশ্রামের পাশাপাশি শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখত।

সৈনিকদের কল্যাণের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যে অবদান ছিল, উমাইয়া শাসনামলে তাতে আরও অনেক বিষয় যুক্ত হয়। সামরিক বিভাগকে তারা আরও বিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেন। দেশ বিজয়ের পর অনেক সেনা অবসর গ্রহণ করলে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনী গঠন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন।[৩৪৪]

ঠিক তেমনই মুসলিমগণ আবিষ্কার করেন নানা সামরিক কৌশল এবং যুদ্ধবিদ্যার নানা পদ্ধতি। জাহিলিয়া যুগে আরবদের মাঝে যুদ্ধবিদ্যার সুবিন্যস্ত কোনো রূপরেখা ছিল না। অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। ইসলামের আগমনের পর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো,

---

৩৪৪. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৫০-১৫১।

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾

> আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।[৩৪৫]

তখন মুসলিমগণ সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন। বিশেষ করে যখন ক্রমান্বয়ে বিজয় অর্জিত হতে থাকে এবং পারসিক ও রোমানদের মতো সুবিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন হয়, যাদের সেনাবাহিনী ছিল পূর্ব থেকেই সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত।

চিত্র নং-৩
সামরিক পোশাক (বর্ম)

যুদ্ধের সারি ও কাতার প্রস্তুত করতে মুসলিমগণ পরিচিত হন ইউনিট ব্যবস্থার সঙ্গে। যার ফলে যেকোনো যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে প্রধানত পাঁচটি ইউনিটে ভাগ করা হতো। সেগুলো ছিল যথাক্রমে, অগ্রবর্তী সেনাদল, ডানদিকের সেনাদল, বাঁ দিকের সেনাদল, মধ্যবর্তী সেনাদল এবং একেবারে পেছনে পশ্চাৎবর্তী সেনাদল।[৩৪৬]

ইয়ারমুক, কাদেসিয়া, আজনাদিন এই যুদ্ধগুলো ছিল সেনাবাহিনী গঠন ও শ্রেষ্ঠ কমান্ডিং বিবেচনায় মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে আদর্শ যুদ্ধ। ইয়ারমুক যুদ্ধে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. যে সমরপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং

---

৩৪৫. সুরা সফ : ৪।

৩৪৬. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৬৭।

যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঠিক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে ইউরোপীয় মিত্রবাহিনী।[৩৪৭]

মুসলিম যোদ্ধাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্রসহ যাবতীয় যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করত ইসলামি রাষ্ট্র। দু-ধরনের সৈনিকদের মাধ্যমে সেনাবাহিনী গঠিত হতো, অশ্বারোহী ও পদাতিক। তাদের অস্ত্র ছিল একাধিক। ব্যক্তিগতভাবে সবার সঙ্গেই থাকত তরবারি, তির, ধনুক ও বর্শা। পাশাপাশি সম্মিলিত ব্যবহারের জন্য ছিল ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ। যেমন মানজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) ও ট্যাংক। ট্যাংকের ভেতরে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হয়ে সৈনিকগণ যুদ্ধ পরিচালনা করত। তা ছাড়া শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তাদের ছিল নানা অস্ত্র। যেমন শিরস্ত্রাণ, বর্ম, ঢাল ইত্যাদি। রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল মুসলিমদের মাঝে। গ্রিক পদ্ধতিতে গোলা ব্যবহারেও মুসলিমগণ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং আরও আধুনিকায়ন করে এই পদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর করে তোলেন। সেজন্য তারা আবিষ্কার করেন বিস্ফোরকদ্রব্য। সে সময় ইসলামি সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ছিল ঘোড়া, সেজন্য ঘোড়া প্রতিপালন ও যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত করার বিষয়টি তারা গুরুত্বের সঙ্গে নেন। যুদ্ধের সময় ঘোড়াগুলোর সুরক্ষার প্রতিও তারা মনোযোগী থাকতেন। শত্রুদের আক্রমণ ও আঘাত থেকে রক্ষা করতে অশ্বগুলোকে তাজফিক নামক বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরিয়ে নিতেন।[৩৪৮]

---

[৩৪৭]. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৫৯।
[৩৪৮]. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিল নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭২-১৭৭।

চিত্র নং-৪
শিরস্ত্রাণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই মুসলিমগণ বিশেষ এক ধরনের ট্যাংক ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। এই যুদ্ধযানটি সাধারণত দুর্গের প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ছিদ্র করার জন্য ব্যবহৃত হতো। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে ইবনে কাসির রহ. বলেন, একদল সাহাবি ট্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করে তায়েফবাসীর প্রাচীর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য দুর্গে আক্রমণ করেন।[৩৪৯]

বনু উমাইয়ার শাসকগণ মানজানিক (ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ) আবিষ্কার ও আধুনিকায়নকে গুরুত্বের সঙ্গে নেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 'আরুস' নামক বিশেষ এক ধরনের মানজানিক আবিষ্কার করেন, যা তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করতে পাঁচশ যোদ্ধার প্রয়োজন হতো। ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমকে[৩৫০] এ ধরনের কয়েকটি মানজানিক দিয়ে এশিয়া অভিযানে পাঠান। ৮৯ হিজরি সনে সেই অভিযানে তিনি দেবল (করাচি)-সহ সিন্ধু উপত্যকার বেশ কয়েকটি শহর জয় করেন।[৩৫১]

---

৩৪৯. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৯।

৩৫০. পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাকাম ইবনে আবু উকাইল আস-সাকাফি (৬২-৯৮ হি./৬৮১-৭১৭ খ্রি.) সিন্ধু এলাকার পার্শ্ববর্তী নগরগুলো বিজয় করে সেখানে ইসলামের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ৩৩৪।

৩৫১. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৬২।
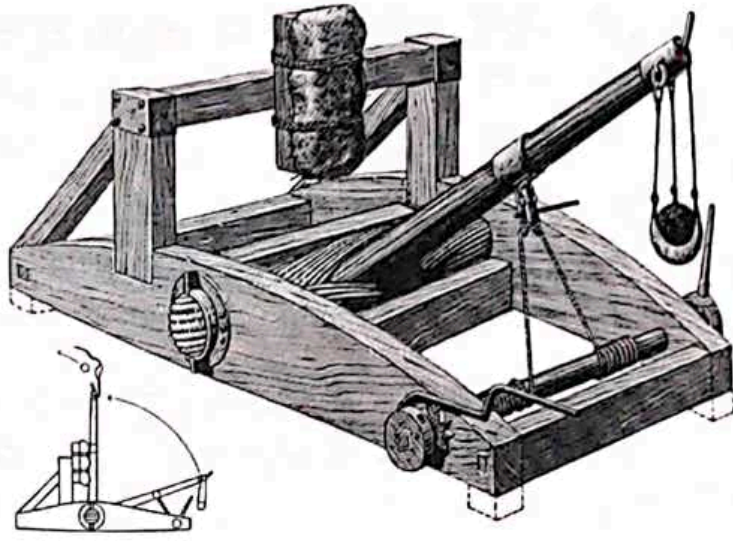
চিত্র নং-৫
ক্ষেপণাস্ত্রের নমুনা

মুসলিম সামরিক শক্তি 'নাফফাতা' নামক বিশেষ এক বাহিনী গঠন করে, যারা রণাঙ্গনে ঘোড়ার ওপর থেকে জ্বালানি বিস্ফোরক ব্যবহার করতেন। অথবা বিশেষ এক পাত্রে জ্বালানি ভরতি করে তা শত্রুদের উদ্দেশে ছুড়ে মারতেন। আব্বাসীয় শাসনামলে এই নাফফাতা বাহিনী বিরাট কদর পায়। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই বাহিনীর ওপর নির্ভরতা এবং তাদের কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে যায়। ৫৮৬ হিজরির ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাসির রহ. বলেন, বিশিষ্ট আব্বাসি খলিফা আন-নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ (মৃ. ৬২২ হি.) সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সাহায্যার্থে বেশ কিছু জ্বালানি ও বর্শা বোঝাই করা যুদ্ধযান প্রেরণ করেন। সাথে জ্বালানি ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং সুড়ঙ্গ তৈরিতে দক্ষ একদল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা পাঠান।[৩৫২]

এর চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মুসলিম বাহিনীই প্রথম বারুদের ব্যবহার নিশ্চিত করেন। পশ্চিমাদের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই মুসলিমগণ বারুদ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক প্রাচ্যবিদের ধারণা ছিল, ইউরোপ মুসলিমদের আগে বিভিন্ন যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এ ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রথম বারুদের ব্যবহার ঘটে মিশরে। কারণ প্রাকৃতিকভাবেই মিশরে বিপুল পরিমাণ ন্যাট্রনের অস্তিত্ব

---

৩৫২. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ৪০৯।

ছিল। ৭২৭ হিজরি সনের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মাকরিযি বলেন, মিশরের বিখ্যাত সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ ইবনে কালাউনের কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠানে জ্বালানি দ্রব্যের পাশাপাশি বারুদের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। তিনি বলেন, আমির কাজলিস দুর্গে বারুদ ও জ্বালানি দ্রব্যের একটি টাওয়ার নির্মাণ করেন।[৩৫৩]

মোটকথা, ওই সময়ের আরও বহু আগে থেকেই মুসলিমগণ বারুদের সঙ্গে পরিচিত। ইবনে খালদুন বর্ণনা করেন, মরক্কোয় মারিনি সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধে বারুদ ব্যবহার করেছিলেন। বিশেষ করে সিজিলমাসা নগর বিজয়ের সময়। তিনি লেখেন, মারিনি সুলতান ইয়াকুব ইবনে আবদুল হক নগরের প্রাচীর ধ্বংস করতে খাঁটি জ্বালানি দ্রব্যভরতি কামান স্থাপন করেন, যার ভেতর থেকে গোলা ছোড়া হতো। বারুদের সাহায্যে প্রজ্বলিত আগুন থেকে উৎপাত হতো গোলা। যা লক্ষ্যভেদ করতে এবং শত্রুদের কোণঠাসা করতে দারুণ কার্যকর ছিল।[৩৫৪]

এটি ছিল ৬৭২ হিজরি সনের ঘটনা। এ থেকে বোঝা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমগণ সপ্তম শতাব্দী থেকেই কামানের সঙ্গে পরিচিত। তখন থেকেই রণক্ষেত্রে বারুদ থেকে উৎসারিত বোমার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল মুসলিম বাহিনী। এ কারণেই ইবনে খালদুন তা বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

মামলুক রাজবংশের শাসনামলেও প্রচুর পরিমাণে কামানের ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। তারা নানা শক্তির, নানা বৈশিষ্ট্যের কামান আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এর মধ্যে কিছু ছিল ছোট প্রকৃতির, আর কিছু বড় প্রকৃতির কামান। *সুবহুল আ'শা* গ্রন্থে কালকাশান্দি রহ. সেই কামান ও বারুদের ব্যবহার সম্পর্কে লেখেন, জ্বালানি দ্রব্য পরিচালিত কামান ছিল নানা প্রকৃতির। কিছু কামান থেকে বড় আকারের তির বা গোলা ছোড়া হতো। যা পাথরকে পর্যন্ত ভেদ করে ছাড়ত। আর কিছু কামান থেকে মিশরে প্রচলিত রিতিল মতে দশ রিতিল থেকে শুরু করে একশ রিতিল পরিমাণ ওজনের লৌহধাতু নিক্ষেপ করা হতো। আশরাফি সাম্রাজ্যের

---

৩৫৩. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১০১।

৩৫৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ৭, পৃ. ১৮৮।

বিখ্যাত আমির সালাহুদ্দিন ইবনে আরামের সহযোগী শাবান ইবনে হুসাইনের শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়ায় তামা ও সিসা দিয়ে বিশেষ এক ধরনের কামান তৈরি করা হয়, যা লোহার শিকল দিয়ে বেষ্টিত ছিল। একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে তা থেকে বিশাল আকারের ভারী গোলা ছোড়া হতো যা আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত বাবুল বাহার নামক কবরস্থানের বাহিরে অবস্থিত বাহরুস সিলাসিলা নামক সাগরের একেবারে গভীরে গিয়ে পড়ত। যার দূরত্ব নেহাত কম ছিল না।[৩৫৫]

কালকাশান্দির উক্ত বিবৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি, সে সময় দু-ধরনের কামানের প্রচলন ছিল। একপ্রকার কামান থেকে বিশাল আকারের তির ছোড়া হতো যা ক্ষিপ্র গতিতে লক্ষ্যভেদ করত। আরেক প্রকার কামান থেকে জ্বলন্ত লৌহ ধাতুর গোলা নিক্ষেপ করা হতো। উভয় প্রকার কামানই তীব্র গতিতে দূরবর্তী গন্তব্যে আঘাত হানত। কালকাশান্দি নিজে ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ৭৭৫ হিজরি সনে। এ থেকেই বোঝা যায়, মুসলিমগণ নানা যুদ্ধ সরঞ্জাম ও ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করে সেগুলো প্রয়োগ করে আসছেন বহু আগে থেকেই।

মুসলিমগণ শক্তি-সামর্থ্য ও সেনাবাহিনীর সংখ্যার বিচারে এগিয়ে থাকা অনেক সামরিক শক্তিকে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে তাদের নামনিশানা মুছে দিয়েছে। মুসলিমজাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজয়ের উপাখ্যান সম্পর্কে যারা অবগত আছেন এ বিষয়টি তারা ভালোভাবেই জানেন। এখান থেকেই অনুমান করা যায়, বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় রক্ষা, দূরদর্শী পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামরিক প্রস্তুতি ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র উদ্ভাবনের বিচারে ইসলামি সভ্যতায় মুসলিম সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল ছিল।

যুদ্ধবিষয়ক নতুন তত্ত্ব

অন্য সব সামরিক শক্তি থেকে মুসলিম সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। ইসলামপূর্ব পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো সভ্যতার সমরকৌশলেও নব্যসভ্যতার সামরিক শক্তিতে সেই বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি পাওয়া যায় না। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যোদ্ধাদের ঈমানি শক্তি। আল্লাহর পথে জিহাদ ও

---

৩৫৫. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ২, পৃ. ১৫৩।

সংগ্রামের জন্য তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। এ বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যত দামি ও মূল্যবান বস্তুই হোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা প্রদান করতে কুরাইশ গোত্রের প্রায় সকল নেতা একমত হয়ে তাকে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার থেকে বিরত হওয়ার প্রস্তাব করেন। তাদের এই প্রস্তাব শুনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবু তালিবকে বলেন, চাচাজান, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তারা সূর্যকে আমার ডান হাতে আর চাঁদকে আমার বাঁ হাতে এনে দিয়ে বলে, এই নাও, এখন থেকে এ দুটোই তোমার। তুমি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিচালনা করবে। কিন্তু এর বিনিময়ে তুমি তোমার এ বাণী প্রচার থেকে বিরত থাকো, তারপরও কিছুতেই আমি এ বাণী প্রচার থেকে বিরত হব না।[৩৫৬]

তেমনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর কিছু মুসলিম যাকাত প্রদানে অস্বীকার করলে তৎকালীন খলিফা আবু বকর রা. ঠিক একই ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এখন যদি কেউ আল্লাহর রাসুলের কাছে আদায় করা একটি রশিও যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। যাকাত অবশ্যই সম্পদের অধিকার। নামায ও যাকাত এ দুটোকে যে আলাদা করে দেখবে আমি তারও বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব।[৩৫৭]

এরকম ইস্পাতকঠিন মনোবল এবং বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি নিয়েই মুসলিম সেনানীরা ইসলামের বিজয়ইতিহাস রচনা করেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা ছিল তাদের জীবনের সর্বোচ্চ বাসনা। প্রায় সকল সামরিক অভিযানে বিজয় অর্জনের পেছনে এটিই ছিল তাদের মূল চালিকাশক্তি। তাদের মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত ছিল যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। মহান আল্লাহই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ﴾

---

৩৫৬. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৩, পৃ. ১০১।

৩৫৭. আবু রবি আন্দালুসি, *আল-ইকতিফাউ বিমা তাযমানুহু মিন মাগাযি রাসুলিল্লাহ ওয়াস-সালাসাতিল খুলাফা*, খ. ৩, পৃ. ৭।

আর বিজয় একমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই।[৩৫৮]

ইসলামি সভ্যতায় যুদ্ধ কখনো শত্রুতা ও বিদ্বেষবশত ছিল না। হত্যা, লুণ্ঠন, অপহরণের উদ্দেশ্যে ছিল না। ছিল না তাতে জাগতিক কোনো অভিসন্ধিও। বরং জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার পেছনে তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা। এ কারণেই পর্বতসম সকল দুঃসাধ্য কাজও মুজাহিদদের জন্য সহজ হয়ে যেত। তাদের সুউচ্চ মনোবলের সামনে কঠিন ও শক্ত পাথরও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

আর লড়াই করো আল্লাহর জন্য তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৩৫৯]

এই উন্নত অভিলাষ এবং অসীম মনোবলই বিজয়ের সবচেয়ে বড় নিয়ামকের কাজ করেছে মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে। এ কারণেই কিবতি সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপী সম্রাট মুকাওকিসের সামনে বিশিষ্ট সাহাবি ও মুসলিম সেনাপতি উবাদা ইবনে সামিত রা. উচ্চারণ করেছিলেন,

আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জন্য জিহাদ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়া। আল্লাহর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা জাগতিক কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে লড়াই করি না। এ পৃথিবীতে শুধু অর্থের প্রাচুর্য ঘটানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে হ্যাঁ, মহান আল্লাহ সেই অর্থ আমাদের অধিকারে এনেছেন। সুতরাং যুদ্ধে আমরা যে সম্পদ লাভ করি তা আমাদের জন্য হালাল। আমাদের মাঝে কে স্বর্ণের অট্টালিকা তৈরি করে ফেলল আর কে শুধু এক দিরহাম নিয়ে পড়ে থাকল এতে কারও কিছু যায় আসে না। সেদিকে আমাদের

---

[৩৫৮]. সুরা আলে-ইমরান : ১২৬।

[৩৫৯]. সুরা বাকারা : ১৯০।

বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। এ পৃথিবীতে ক্ষুধা নিবারণের জন্য যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন, শরীর ঢাকার জন্য যতটুকু কাপড়ের প্রয়োজন, এর বাইরে আমরা কিছুই আশা করি না। ওইটুকু ছাড়া যদি আর কিছু আমাদের না থাকে, তাহলে সেটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের কারও যদি অঢেল সোনা-রুপা থাকে, তবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করে নিজের জন্য যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। আর পৃথিবীতে যে অর্থ তার অধিকারে আসার কথা, সেটি কোনো-না-কোনোভাবে তার অধিকারে আসবেই, এ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর ধনসম্পদ প্রকৃত ধনসম্পদ নয়। পৃথিবীর ভোগবিলাস আসল ভোগবিলাস নয়। প্রকৃত ধনসম্পদ ও ভোগবিলাস আখেরাতে। আর আখেরাতের সেই চিরস্থায়ী ধনসম্পদ ও ভোগবিলাস অধিকার করতেই মহান আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকেই আমাদের পথনির্দেশ করেছেন। ঠিক যতটুকু হলে আমাদের ক্ষুধা নিবারণ হয় এবং শরিয়ত নির্ধারিত সতর পরিমাণ দেহ আবৃত হয়, এর চেয়ে বেশি অর্জন করা যেন আমাদের উদ্দেশ্য না হয়; আমাদের যেন একমাত্র লক্ষ্য হয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন করে আমৃত্যু শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবিচল থাকা; এ বিষয়ে তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। মহান আল্লাহ যেন শাহাদত নসিব করেন, আর যেন বাড়ি ফিরে যেতে না হয়, দেশে প্রত্যাবর্তন করতে না হয়, পরিবার ও সন্তানদের কাছে ফিরে যেতে না হয়, আমাদের এ বাহিনীর সবাই সকাল-সন্ধ্যা শুধু এ প্রার্থনাই করে থাকেন। পেছনে কী রয়ে গেছে সেদিকে আমাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পরিবার ও সন্তানদের আমরা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি, তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছি। আমরা শুধু সামনের দিকে তাকাই। আখেরাতের দিকে চেয়ে থাকি।[৩৬০]

৩৬০. ইবনে তাগরি বারদি, *আন-নুযুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল-কাহিরা*, খ. ১, পৃ. ৪।

ইসলামি সেনাবাহিনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের মাঝে সমন্বয় ও একতা বজায় ছিল। আর মুসলিম সমাজের প্রতিটি নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব হলো সেই ঐক্য সুরক্ষা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৩৬১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ»

ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর পক্ষেই আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়।

বদর যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গীদের নিয়ে প্রথমে বদর কূপের সন্নিকটে এক স্থানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবি হুবাব ইবনুল মুনযির রা.-এর কাছে বিষয়টি মনঃপূত হয়নি। যেহেতু মুসলিমদের অবস্থানকৃত জায়গাটি শত্রুদের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে না বলে তার মনে হচ্ছিল। তিনি গিয়ে মুসলিম সেনাপতি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আল্লাহর আদেশে এ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন, এখানে কিন্তু সামনে-পেছনে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই, নাকি রণকৌশল হিসাবে আপনি এই জায়গাটি পছন্দ করেছেন? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা স্রেফ রণকৌশল। এ কথা শোনার পর হুবাব রা. বললেন, এই জায়গায় অবস্থান করাটা আমি সমীচীন মনে করছি না। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। কুরাইশ বাহিনীর অবস্থানের সবচেয়ে নিকটবর্তী কূপ আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য কূপগুলো বন্ধ করে দেবো। তাহলে ফল দাঁড়াবে এই, যুদ্ধ শুরু হলে আমরা পানি পান করতে পারব আর কুরাইশ বাহিনী পানির অভাবে ছটফট করবে। হুবাব রা.-এর এই সুপরামর্শ আল্লাহর রাসুলের দারুণ পছন্দ হলো। তিনি খুশি হয়ে বললেন, তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ। এরপর তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে চললেন।

---

৩৬১. সুরা আলে-ইমরান : ১০৩।

মাঝরাতে শত্রুদের অবস্থানের কাছাকাছি কূপের কাছে পৌঁছে তাঁবু খাটালেন। এরপর সাহাবিগণ হাউজ বানালেন, তাতে পানি ভরতি করে পানি উত্তোলনের সহজতার জন্য তাতে পাত্র ফেলে রাখলেন এবং বাকি সব কূপ বন্ধ করে দিলেন।[৩৬২]

তাবুক যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় মদিনায় যে অভাব ও দুর্ভিক্ষ চলছিল, সেই জটিল ও কঠিন মুহূর্তে মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামরিক মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থসম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার যে নজির মুসলিমগণ স্থাপন করেন তার নজির অন্য কোনো সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য সেনাপ্রধান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে নিজ নিজ সাধ্য অনুপাতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। সাহাবিগণ আল্লাহর পথে ধনসম্পদ বিলিয়ে দিতে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। ঠিক সে সময় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় পাঠানোর জন্য দুইশ উট প্রস্তুত করেছিলেন উসমান ইবনে আফফান রা.। কিন্তু জিহাদের পথে খরচের ডাক আসায় সেই দুইশ উট সাজসরঞ্জামসহ আল্লাহর পথে সদকা করে দেন। এরপর অনুরূপ আরও একশ উট দান করেন। এরপর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এনে আল্লাহর রাসুলের সামনে পেশ করেন। এরপর আরও দান করেন, আরও সদকা করেন। শেষ পর্যন্ত একা উসমান ইবনে আফফান রা.-এর দেওয়া দানের পরিমাণ দাঁড়ায় নয়শ উট, একশ সামরিক অশ্ব। নগদ অর্থের কথা আলাদা। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. (প্রায়) দুইশ উকিয়া চব্বিশ হাজার চারশ চুরানব্বই গ্রাম রৌপ্য দান করেন। আবু বকর রা. তার অধিকারে থাকা সমুদয় অর্থ আল্লাহর রাসুলের সামনে উপস্থাপন করেন, যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। পরিবারের জন্য শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে আসেন। তার দানটাই ছিল প্রথম। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার পুরো অর্থের অর্ধেক দান করেন। আব্বাস রা. প্রচুর দান করেন। তালহা, সাদ ইবনে উবাদা, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. প্রমুখ সাহাবিও দানের জন্য প্রচুর অর্থ নিয়ে আসেন। আসেম ইবনে আদি রা. প্রদান করেন নব্বই ওয়াসাক (সতেরো টন ছয়শ

---

৩৬২. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ২৬০; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৪০২; সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ৩, পৃ. ৬২; তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৯।

আটান্ন গ্রাম প্রায়) খেজুর। এ ছাড়াও সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করেন। কেউ অল্প, কেউ অধিক, এভাবে সবাই দানে শরিক হন। এমনকি অনেকে সামর্থ্যের অভাবে এক মুদ (৮১৭.৬৫ গ্রাম প্রায়), দুই মুদ (১৬৩৫.৩০ গ্রাম প্রায়) পরিমাণও দান করেন। নারী সাহাবিগণও নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী সুগন্ধি, বালা, অলংকার, পায়ে পরিধানের গহনা, কানের দুল, আংটি, জমানো মুদ্রার থলে ইত্যাদি দান করে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।[৩৬৩]

মুসলিম সামরিক বাহিনীতে সেনাপ্রধান ও সৈনিকদের মাঝে যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আস্থার সম্পর্ক ছিল, তা যুদ্ধাভিযানে মুসলিমদের বিজয় রচনায় বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় যোদ্ধাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। প্রিয় নাম ধরে সবাইকে সম্বোধন করতেন। আবু উবাইদা রা.-এর উদ্দেশে তিনি বলেন,

«لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»

প্রত্যেক জাতির মাঝে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। এই উম্মতের সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।[৩৬৪]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর উদ্দেশে বলেন,

«لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ»

প্রত্যেক নবীর কিছু একান্ত সহযোগী থাকে, আমার সেই সহযোগী যুবাইর।

রণক্ষেত্রে শত্রুদের আক্রমণ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে একজন সেনাপ্রধান হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। আহযাব তথা খন্দকের যুদ্ধে এমনটিই আমরা দেখতে পাই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর যারা মুসলিমদের শাসক হয়েছেন, নেতা হয়েছেন, সেনাপ্রধান হয়েছেন সৈনিকদের সঙ্গে নম্রতা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখার আন্তরিক অভিপ্রায় তাদের মাঝেও আমরা দেখতে পাই। এ কারণেই কিবতি সম্রাট

---

৩৬৩. ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৪, পৃ. ৬ (সামান্য পরিমার্জনসহ)।

৩৬৪. *বুখারি*, হাদিস নং ৪১২১।

মুকাওকিসের পাঠানো দূতের বিবৃতিতে মুসলিমদের পরিচয় খুব ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, আমি এমন এক জনগোষ্ঠী দেখে এসেছি, যাদের কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা বেশি প্রিয়। মর্যাদার অধিকারী হওয়ার চেয়ে বিনম্র থাকা যাদের ভূষণ। জাগতিক বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ-অভিলাষ নেই। তারা মাটিতে বসেন। হাঁটুর ওপর ভর করে তারা খাবার আহরণ করেন। তাদের নেতা তাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। তাদের মাঝে কে উচ্চমর্যাদার আর কে সাধারণ, কে নেতা আর কে দাস তা বোঝার কোনো উপায় নেই।[৩৬৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের যত উদ্ভাবন

সমরাস্ত্র আবিষ্কারের মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগে মুসলিম বাহিনীর রয়েছে বিরাট সাফল্য। ঐতিহাসিক কাদেসিয়ার ঘটনাটি সামরিক কৌশল উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। ময়দানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিনই মুসলিমগণ এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। পারসিক বাহিনীর সম্মুখভাগে হস্তিবাহিনী দেখে মুসলিমগণ কিছুটা বিচলিত হয়ে যান। মুসলিমদের ঘোড়াগুলো হাতির বিশালাকার দেহ ও বিকট আওয়াজে ভয় পেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাহস না হারিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সেনাপতিগণ রণপরিকল্পনা পালটে হাতিগুলোকে পরাস্ত করার নিখুঁত প্ল্যান তৈরি করেন। সেজন্য সাদ রা. আসেম ইবনে আমর তামিমি রা.-এর কাছে লোক পাঠান। তখন আসেম ইবনে আমর রা. তামিমি গোত্রের লোকদের নিকট গিয়ে ঘোষণা করেন, হে তামিম গোত্রের মুসলিম, উট ও অশ্ব চালনায় তোমরাই তো আরবের বিখ্যাত গোত্র! এই হাতিগুলো দমনে তোমাদের কাছে কি কোনো কৌশল নেই? তারা উত্তরে বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আছে। এরপর নিজ গোত্রের সুদক্ষ ধনুর্বিদদের সামনে ঘোষণা করেন, হে তিরন্দাজ দুঃসাহসী যোদ্ধাগণ, প্রচণ্ড তিরের আক্রমণে শত্রুবাহিনীর সম্মুখভাগে থাকা হস্তি আরোহীদের তোমরা বিচ্ছিন্ন করে দাও। আরেকদল দুর্ধর্ষ যোদ্ধার উদ্দেশে তিনি ঘোষণা করেন, হে দুর্ধর্ষ মুজাহিদগণ, তোমরা হাতিগুলোর পিছু ধাওয়া করে তাদের বন্ধনীগুলো কেটে দাও। যেন তাতে সংযুক্ত সৈনিকবাহী কাঠের বাক্সগুলো মাটিতে পড়ে যায়। এরপর তাদেরকে

---

৩৬৫. ইবনে তাগরি বারদি, *আন-নুযুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল-কাহিরা*, খ. ১, পৃ. ১১।

উদ্দীপ্ত করতে তাদের সাথে তিনি নিজেও আক্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। অদূরেই অবস্থান করছিল ডানদিকের ও বাঁ দিকের সেনাদল। আসেম রা.-এর সঙ্গীরা এসে হাতিগুলোর ওপর আক্রমণ করেন। হাতির লেজ কর্তন করেন। এরপর দ্রুত হাতির পিঠে বহন করা কাঠের বক্সগুলোর সকল বাঁধন কেটে দেন। এতে করে হাতিগুলো প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকে। সকল হাতিই সেদিন আহত হয়ে চিৎকার করতে থাকে এবং হস্তীসৈনিক সকলে নিহত হয়।[৩৬৬]

ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমদের উদ্ভাবিত অত্যাধুনিক আরও একটি যুদ্ধপরিকল্পনা ও কৌশল আমরা দেখতে পাই বিখ্যাত উসমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কনস্টান্টিনোপল অভিযানে। বিশাল আকারের কামানবাহী রণতরীগুলো নিয়ে তিনি কনস্টান্টিনোপল অভিযান শুরু করেন। দার্দানেলিস প্রণালি পর্যন্ত এসে দেখেন, নৌপথে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে বাইজান্টাইন বাহিনী দুই উপকূলের মাঝে মজবুত ও বিশাল আকারের লোহার শিকল স্থাপন করেছে। কিন্তু তাতেও দমে যাননি মহান সেনাপতি সুলতান মুহাম্মাদ। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসাধ্য যুদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ও নৌবহর বহনের সিদ্ধান্ত নেন। স্থলপথে কাঠ দিয়ে পথ তৈরি করে লোহার শিকল দিয়ে সেই পথে রণতরীগুলো টেনে এনে অপর প্রান্তে থাকা সমুদ্রের পানিতে অবতরণ করানোর মতো অকল্পনীয় ও দুরূহ কাজটি করে মুসলিম সেনাবাহিনী। মুসলিম সেনাদের এ অভিনব উদ্ভাবন ও রণকৌশল দেখে বাইজান্টাইন বাহিনী ভড়কে যায়। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোনো সেনাপতি স্থলপথে রণতরী টেনে আনার ও সেই রণতরীগুলো শিকল দিয়ে পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত টেনে ওঠানো, এরপর সেগুলো নিখুঁতভাবে পানিতে অবতরণ করানোর মতো দুঃসাধ্য কাজটি সাধন করলেন। সেই রণতরীগুলো হালকা ছিল না, বরং তাতে বোঝাই ছিল যুদ্ধসরঞ্জাম, বিশাল আকৃতির কামান ও গোলা। এর ফলাফলও হাতেনাতে পায় মুসলিম বাহিনী। খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পুরো কনস্টান্টিনোপল শহর মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে।[৩৬৭]

---

৩৬৬. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৪১২।

৩৬৭. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যা আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত*, পৃ. ৮৮।

এই ছিল ইসলামি সামরিক শক্তির উদ্ভাবিত কিছু রণকৌশলের নমুনামাত্র। যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি সভ্যতা সমকালীন সকল সভ্যতাকে ছাপিয়ে এক অনন্য আসন তৈরি করেছিল। বিশ্বের বুকে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করেছিল।

নৌপথে মুসলিমদের অভিযান

ইসলাম আগমনের পূর্বে ও তার সূচনালগ্নে নৌপথে ভ্রমণ এবং সামুদ্রিক অভিযানের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত ছিল না আরবরা। কারণ মরুভূমিতে বসবাসে অভ্যস্ত আরবদের ব্যবসাবাণিজ্য সবই ছিল স্থলপথকেন্দ্রিক। বিশিষ্ট সাহাবি আলা ইবনুল হাযরামি রা. উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে প্রথম নৌপথে অভিযান পরিচালনা করেন। পারস্যে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে হিজরি ১৭ সনে বাহরাইনের অধিবাসী মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানান। তারা তার আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয়। এরপর তাদেরকে নিয়ে তিনি পারস্য অভিযানে বের হন। খলিফা উমর রা.-এর অনুমতি ছাড়াই তিনি তাদেরকে নিয়ে নৌযানে করে আরব উপসাগর পাড়ি দেন। এরপর পারস্য আক্রমণ করে সেখান থেকে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে বসরায় ফিরে আসেন। কিন্তু নৌযানগুলো আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। বিষয়টি খলিফা উমর রা.-কে বেশ পীড়া দেয়। শুরু থেকেই তিনি নৌপথে অভিযানের বিরোধী ছিলেন। এ কারণে আলা ইবনুল হাযরামি রা.-কে তিনি গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহিত প্রদান করেন।[৩৬৮]

এরপর যখন আরব উপদ্বীপের চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়তে থাকে, একের পর এক দেশ মুসলিমদের অধিকারে আসতে থাকে, সিরিয়া বিজয় হয়, মিশর বিজয় হয়, তখন রোমানদের মতো নৌপথকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের উপকূলগুলো সুরক্ষিত করা এবং রোমানদের আক্রমণ থেকে তীরবর্তী অঞ্চল ও অন্যান্য বিজিত অঞ্চলসমূহ নিরাপদ রাখার প্রতি মনোযোগ দেন মুসলিম বাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় হিমসে অবস্থানরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. নৌপথে রোম আক্রমণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে পত্র লেখেন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে। কিন্তু উমর রা. তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন

---

৩৬৮. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ৯৬-৯৭।

করেন। উমর রা.-কে এ ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য অনুনয়বিনয় করে মুআবিয়া রা. দ্বিতীয়বার পত্র লেখেন, হিমসের একটি গ্রামে বসবাসরত মানুষ রোমানদের এত কাছাকাছি যে, সেই এলাকা থেকে কুকুর আওয়াজ করলে, মোরগ ডাক দিলে এই গ্রাম থেকে শোনা যায়। মুসলিম সাম্রাজ্যে বাস করা লোকজন এতটাই নিকটে যে, যেকোনো সময় রোমানদের আক্রমণের মুখে পড়তে পারে। পত্রের মাধ্যমে খলিফাকে এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল মুআবিয়া রা.-এর। এইবার উমর রা. বিষয়টি একটু গভীরভাবে নেন। আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে পত্রযোগে সমুদ্র অভিযানের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে আমর উত্তরে লেখেন, আমি মনে করি বিশাল সমুদ্রের বুকে তুলনামূলক ছোট বাহিনী নিয়ে অভিযানে বের হওয়ার মাঝে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি। সেখানে শুধু পানি ও আকাশ, তৃতীয় কোনো উপায় নেই। সাগর শান্ত হলে বাহিনীটি আতঙ্কিত হবে আর অশান্ত হলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। নৌপথে নিরাপদে ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আশঙ্কা প্রবল। সেখানে অভিযানে নামলে সেটা হবে বিশাল কাঠের টুকরায় ছোট্ট পোকার মতো। একটু উনিশ-বিশ হলেই পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা গুরুতর। আর যদি বেঁচে ফেরে, তবে সেটা হবে এক অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার।[৩৬৯] আমর ইবনুল আস রা.-এর এ প্রত্যুত্তর পেয়ে খলিফা উমর রা. মুআবিয়া রা.-কে উত্তর দেন, ওই সত্তার শপথ! যিনি মুহাম্মাদকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, নৌপথে অভিযানের জন্য কোনো মুসলিমকে আমি অনুমতি দেবো না। আমি তো সমুদ্র অভিযানের বিষয়ে আমার অসম্মতির কথা আপনাকে পূর্বেই জানিয়েছি। আল্লাহর শপথ! পুরো রোম সাম্রাজ্যের তুলনায় একজন মুসলিমের জীবনের নিরাপত্তা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার এ সিদ্ধান্ত জানানোর পর দ্বিতীয়বার আপনি আর আমাকে নৌপথে অভিযানের প্রস্তাব দেবেন না। আমি তো সমুদ্র অভিযানের বিষয়ে আমার সম্মতির কথা আপনাকে পূর্বেই জানিয়েছি। অনুমতি ছাড়া আলা ইবনুল হাযরামি সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করে যে বিচারের মুখোমুখি হয়েছে, নিশ্চয় আপনি তা জানেন। তাকে কিন্তু আমার অসম্মতির কথা পূর্বে জানাইনি।[৩৭০]

---

৩৬৯. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ২, পৃ. ১৩০।
৩৭০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ৩১৬।

এর ফলে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলের শেষ পর্যন্ত মুসলিমগণ নৌপথে কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। তিনি বাইজান্টাইনদের আক্রমণ ইস্যুতে সবসময় প্রতিরক্ষামূলক নীতি অবলম্বনের পক্ষে ছিলেন। সীমান্ত ও উপকূলীয় এলাকায় অনেক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং পাহারা জোরদার করেছিলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাহাদাতের পর যখন উসমান ইবনে আফফান রা. খলিফা হন, তখন মুআবিয়া রা. খলিফা উসমান রা.-এর কাছেও সেই বিষয়টি উত্থাপন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত উসমান রা. নৌপথে অভিযানের অনুমতি প্রদান করেন। তবে তিনি মুআবিয়া রা.-কে বলে দেন, আপনি নিজের মতো করে মানুষকে নির্বাচন করবেন না। নৌপথে অভিযানে যোগদানের জন্য লটারি করবেন না। তাদের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণ করতে চায়, তাদেরকেই শুধু আপনার সঙ্গে নিন ও তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করুন। খলিফা উসমান রা.-এর নির্দেশনামতো তিনি তাই করেন।[৩৭১]

এরপর যখন মুসলিমদের বিজয়ার্জন হয়, তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সবাই মুসলিমদের সামনে নতি স্বীকার করে, সকল-কিছুর উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং শিল্প ঘটতে থাকে মুসলিমদের কেন্দ্র করে, খ্যাতিমান ও সুদক্ষ নাবিকদের ব্যবহার করতে থাকে সামুদ্রিক প্রয়োজনে, নৌপথে যুদ্ধ পরিচালনা ও বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানির ব্যাপক ব্যবহার ঘটতে থাকে, নৌ-বিদ্যা ও চর্চায় উৎকর্ষ হতে থাকে তখন মুসলিমগণ পরিপক্ব নাবিক তৈরিতে মনোনিবেশ করেন, নৌপথে জিহাদ পরিচালনায় মনোযোগ দেন, বড় বড় নৌযান ও রণতরী তৈরি করেন। সামুদ্রিক অভিযানের জন্য নৌবাহিনী ও বিশেষ অস্ত্রে সজ্জিত নৌবহর উদ্ভাবন করেন। সমুদ্রপথে অভিযানের জন্য সাগরপাড়ের যোদ্ধা ও সৈন্যরাই নৌবহরকে যাত্রার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেন। সিরিয়া, আফ্রিকা, মরক্কো, স্পেন ইত্যাদি সমুদ্রবর্তী অঞ্চল এবং উপকূলে বাস করা বিজ্ঞ যোদ্ধারাই বিশেষত কাজটি আঞ্জাম দেন।[৩৭২]

---

৩৭১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৭।

৩৭২. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ২৫৩।

মুসলিমদের পরিচালিত প্রথম নৌ অভিযানগুলো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। কুবরুস অভিযান এবং ৩৪ হি./৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত 'যাতুস সাওয়ারি' অভিযান মুসলিমদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এই অভিযানগুলোর পর নৌ ইতিহাসের গতি পালটে যায়, ভূমধ্যসাগরের পুরো নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার মুসলিমদের হাতে চলে আসে। পৃথিবীর বুকে মুসলিম নৌবাহিনী নতুন এক অদম্য পরাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে ভূমধ্যসাগরকে সবাই 'রোম সাগর' বা 'রোম উপসাগর' নামে চিনত, এরপর থেকে তার নাম হয়ে যায় 'ইসলামি উপসাগর'। এরপর মুসলিমগণ যখন স্পেন বিজয় করেন, তখন এই অঞ্চলের সমুদ্রসীমানায় মুসলিম নৌবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে সিরিয়া, মিশর, পশ্চিমে স্পেনের নৌপথগুলো মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে ওঠে।

জলযান তৈরি

যখন থেকে মুসলিমগণ সামুদ্রিক অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করেন, বিশেষত 'যাতুস সাওয়ারি' (Battle of the Masts) অভিযানে বিজয় অর্জন করেন, তখন থেকেই তারা নানাপ্রকার যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ কারখানা তৈরি শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৫৪ হি./৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের 'আর-রাওযা' দ্বীপে প্রথম যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের জন্য বিশেষ কারখানা তৈরি করে তার নাম দেওয়া হয় دَارُ الصِّنَاعَةِ। তেমনই বিশেষ রণতরী নির্মাণের জন্য সিরিয়ার ভূমধ্যসাগর আক্কা (বর্তমানে এটি ভূমধ্যসাগর ও ফিলিস্তিনের উত্তর বা পশ্চিমাংশে ও বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ১৮১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) এবং সুর অঞ্চলেও কারখানা নির্মিত হয়। এরপর একে একে আফ্রিকা এবং স্পেনেও এরকম বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান আবদুর রহমান নাসিরের শাসনামলে স্পেনের নৌবহরে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা দুইশতে গিয়ে পৌঁছে। আফ্রিকার নৌবহরেও প্রায় সমান সংখ্যক রণতরী যুক্ত হয়।[৩৭৩]

যুদ্ধের নৌবহর নির্মাণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক নৌবহর তৈরিতেও মনোযোগ দেন মুসলিমগণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অঙ্গনে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত

---

৩৭৩. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ২৫৩।

হওয়ার পর মুসলিমগণ পশ্চিম ও দক্ষিণের সামুদ্রিক অঞ্চলে বাণিজ্যিক যাতায়াত বৃদ্ধি করেন। সমুদ্র ও নৌপথের প্রয়োজন বুঝে নানা ধরনের ইসলামি বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজ নির্মিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিমগণ একে একে তৈরি করেন শাওনা, হারবাকা, (এক প্রকার জাহাজ, যাতে অগ্নি নিক্ষেপের অনেকগুলো জায়গা থাকত, যেগুলো থেকে সমুদ্রে শত্রু পক্ষকে অগ্নি নিক্ষেপ করা হতো), বাতসা, গুরার, শালানদিয়া, হামমালা, তরিদা। একেকটির ধরন, প্রকৃতি ও গতি ছিল একেকরকম। الشونة (শাওনা) নামক রণতরী ছিল আকারে সবচেয়ে বিশাল। তাতে ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সেনাবাহিনী অবস্থান করত। সবচেয়ে ছোট নৌযান ছিল الطريدة (তরিদা) যা দ্রুত চলাচল করত। আর সামুদ্রিক অভিযানে ব্যবহৃত বিশেষ অস্ত্রের মধ্যে ছিল كلاليب (কালালিব), যাতুস সাওয়ারি অভিযানে মুসলিমগণ তাদের রণতরীগুলো রোমানদের যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে বেঁধে রাখার কাজে ব্যবহার করেন। তা ছাড়া মুসলিমগণ النفاطة (নাফফাতা) নামক দাহ্য পদার্থ মিশ্রিত বিশেষ এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতেন। জাহাজের সম্মুখভাবে একটি খুঁটি স্থাপিত হতো, সেখান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হতো। একে গ্রিক আগুন নামেও ডাকা হতো। উপর্যুক্ত এ যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম ব্যবহার হতো কেবল সামুদ্রিক অভিযানে। এ ছাড়াও স্থলপথে ব্যবহারের প্রচলিত অন্যান্য অস্ত্রও ছিল।[৩৭৪]

নৌশিল্পে মুসলিমদের যে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অসামান্য অবদান, এই বিষয়ে লেখা মুসলিম মনীষীদের গ্রন্থের তালিকা থেকেও বড় ধারণা পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হলো, *আসাদুল বাহর* তথা সমুদ্রের সিংহ খ্যাত ইবনে মাজেদের (মৃ. ৯০৪ হি./১৪৯৮ খ্রি.) লেখা اَلْفَوَائِدُ فِيْ أُصُوْلِ عِلْمِ الْبَحْرِ وَالْقَوَاعِدِ এবং রাজায ছন্দে রচিত তার কাব্যগ্রন্থ حَاوِيَةُ الْاِخْتِصَارُ فِيْ أُصُوْلِ عِلْمِ الْبِحَارِ।[৩৭৫] এ ছাড়াও রয়েছে مُعَلَّمُ الْبَحْرِ (সমুদ্রবিষয়ক শিক্ষক) খ্যাত সুলাইমান আল-মাহরি (মৃ. ৯৬১ হি./১৫৫৪

---

৩৭৪. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৬৯-১৭০; কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৩-১৮৭।

৩৭৫. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২০১।

খ্রি.) রচিত দুটি গ্রন্থ : *আল-মিনহাজুল ফাখির ফি ইলমিল বাহরিয যাখির* এবং *আল-উমদাতুল মাহরিয়্যা ফি যাবতিল উলুমিল রাহরিয়্যা*।[৩৭৬]

তেমনই সমুদ্রবিষয়ক অভিধানও ইসলামি নৌ-পরিভাষায় ভরপুর, যা কালের পরিক্রমায় ইউরোপীয়রা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে Admiral শব্দটি মূলত أَمِيْرُ الْبَحْرِ-এর পরিবর্তিত রূপ। Cable শব্দটি মূলত حَبْلٌ শব্দের পরিবর্তিত রূপ। Resif শব্দটি মূলত رَصِيْفٌ-এর পরিবর্তিত রূপ। এবং Darsinal শব্দটি মূলত دَارُ الصِّنَاعَةِ-এর পরিবর্তিত রূপ।

সামরিক চারিত্রিক নীতি

যুদ্ধ এবং সচ্চরিত্রের মাঝে প্রথম মেলবন্ধন তৈরি করেছে মুসলিমজাতি। আর এ কথা জেনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সামরিক নীতিতে কখনোই সমকালীন পারসিক ও রোমান সেনাবাহিনীর আচরণ অনুসরণ করেনি মুসলিম সেনাবাহিনী। কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বমানবতার জন্য ইসলামি সভ্যতার এ এক বড় অবদান। ইসলাম সবসময় মানুষের অন্তর ও স্বভাব পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়। সামরিক বা বেসামরিক সবার সঙ্গেই আচরণের ক্ষেত্রে মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলিকে অগ্রাধিকার দেয়।

সমকালীন রোম ও পারস্য সামরিক শক্তি, যুদ্ধ ইস্যুতে যে গণহারে রক্তপাত ও নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যার নীতি গ্রহণ করেছে, তাতারজাতি যেভাবে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষদের হত্যা করেছে, গর্ভবতী নারীর পেট ছিঁড়ে শিশুকে বের করে হত্যা করেছে, পশু হত্যায় নির্মমতার পরিচয় দিয়েছে এবং এ ছাড়া আরও অনেক নির্দয়, মর্মন্তুদ, পাশবিক ও অমানবিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে, ইসলামি সভ্যতা শুরু থেকেই সেই নীতি বর্জন করে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের নজির স্থাপন করে ধর্মের প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে।

এ কারণেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর সঙ্গীদের দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

«لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ»

---

৩৭৬. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১২১।

> শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে রক্তপাত ঘটানোর প্রত্যাশা করো না, আল্লাহর কাছে মুক্তি কামনা করো।[৩৭৭]

কুরআনুল কারিম এবং সুন্নাতে নববির আলোকে চারিত্রিক শিক্ষা ও যে স্বভাবের ওপর একজন মুসলিম বেড়ে ওঠে, সেই স্বভাব হত্যা, খুন, রাহাজানিকে ঘৃণা করে। আগ বেড়ে কখনোই অন্যকে সে হত্যা করতে যায় না। মানবতার কল্যাণ সাধনে সবসময় সে চায় যথাসম্ভব যুদ্ধ ও খুনাখুনি এড়িয়ে যেতে।

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায়পরায়ণতা ছিল এই যে, কেবল লড়াই করতে আসা যোদ্ধাদেরকেই হত্যা করতেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা নিরপরাধ মানুষদের তিনি হত্যা করতেন না। ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে দুমাতুল জান্দাল এলাকায় বাস করা খ্রিষ্টান কালব গোত্রের উদ্দেশে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-কে পাঠানোর সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ওসিয়ত করেন,

> «اُغْزُوْا جَمِيْعًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَغْدِرُوْا، وَلَا تُمَثِّلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا»

> তোমরা সকলেই আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। যারা আল্লাহর প্রতি কুফরি লালন করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তবে যুদ্ধে কিছু চুরি বা দুর্নীতি করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। লাশ বিকৃত করবে না। নবজাতক শিশুকে হত্যা করবে না।[৩৭৮]

অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধে এসব নীতিই ছিল মুসলিমদের প্রধান সমরনীতি। ইসলামের যুগে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলিমদের যুদ্ধগুলোতে রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার হার অন্যসব জাতি-গোষ্ঠীর যুদ্ধসমূহ থেকে বহুগুণ বেশি। মুসলিম সেনাপতিগণ সবসময় সম্মুখ লড়াই এড়িয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করার সুযোগ খুঁজতেন। এ বিষয়ে তাদের আদর্শ হলেন রাসুল আলাইহি ওয়া

---

৩৭৭. *বুখারি*, হাদিস নং ২৮০৪; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৪২।

৩৭৮. *মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৩১; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৬১৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৪০৮; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৮৫৭; *দারেমি*, হাদিস নং ২৪৩৯; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৮১১৯; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৮৬২৩।

সাল্লামের জীবদ্দশায় যতটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সবকটি যুদ্ধে মুসলিম-অমুসলিম নিহতের সংখ্যা হিসাব করে বর্তমান সময়ে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর সঙ্গে এর তুলনা করলে বড় বিস্ময়কর ফল বেরিয়ে আসে।

মদিনায় হিজরত করার পর দশ বছর যাবৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে মুসলিমদের মধ্যে সর্বমোট শহিদ হন ২৬২ জন এবং শত্রুপক্ষের নিহত হয় ১০২২ জন। এই পরিসংখ্যান বের করতে গিয়ে যেসব নিহত হওয়ার ঘটনা রণক্ষেত্রে নয়, শুধু বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোকেও আমি অন্তর্ভুক্ত করেছি। তুলনামূলক আকর্ষণীয় ফলাফল বের করতে ও ন্যূনতম পরিসংখ্যান তুলে ধরার জন্য অনেকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা উল্লেখ করে থাকেন,[৩৭৯] তা না করে আমি শুধু নির্ভরযোগ্য সূত্র ঘেঁটেই এই পরিসংখ্যান বের করেছি।[৩৮০]

এভাবে মহানবীর জীবদ্দশায় সকল যুদ্ধে মুসলিম-অমুসলিম উভয় পক্ষের সর্বমোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৮৪ জনে।

নিহতের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে অনেকে বলতে পারেন যে, সৈনিকদের সংখ্যা তখন কম ছিল। তাই নিহতও কম হয়েছে। এটা বের করতে গিয়ে আমি ওই দশ বছরে সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সৈনিকদের সংখ্যা গণনা করি। এরপর ওই সংখ্যা থেকে নিহতের শতকরা হার দেখে অবাক হয়ে যাই। দেখি মুসলিমদের মধ্যে শতকরা এক ভাগ নিহত হয়েছেন। আর শত্রুপক্ষের নিহত হয়েছে শতকরা দুই ভাগ। তাহলে উভয় পক্ষ মিলিয়ে গড়ে নিহত হয়েছে মাত্র ১.৫%!!

---

৩৭৯. এই পরিসংখ্যান বের করতে গিয়ে আমি আশ্রয় নিয়েছি প্রথমে সিহাহ সিত্তার ওপর। এরপর সুনান ও মুসনাদসমূহের ওপর। এরপর বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক সিরাত বিষয়ক গ্রন্থের ওপর। যেমন *সিরাতে ইবনে হিশাম*, *উয়ুনুল আসার*, *যাদুল মাআদ*, *সিরাতুন নাবাবিয়্যা* (ইবনে কাসির এবং তাবারি রচিত)।

৩৮০. যেমন অনেকে বিরে মাউনা ট্রাজেডিতে শহিদের সংখ্যা বলেন ২৭ জন। কিন্তু সঠিক সংখ্যা হলো ৭০ জন। আবার অনেকে বনু কুরাইযায় নিহতদের সংখ্যা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন। যুক্তি হিসেবে তারা বলেন যে, বনু কুরাইযার অধিবাসী ইহুদিগণ নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই করুণ পরিণতি বরণ করেছে। তবে উচিত হলো, তাদের নিহতের সংখ্যাও এখানে উল্লেখ করা। কারণ সেটিও ছিল একটি যুদ্ধ। যুদ্ধের মৌলিক কারণ যাই হোক না কেন এভাবে নানা যুক্তিতে নিহতদের পরিসংখ্যান ছোট করার চেষ্টা করা হয়।

পঁচিশ কি সাতাশটির মতো যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৩৮টি যুদ্ধে তিনি নিজে অংশগ্রহণ না করে সৈনিকদের প্রস্তুত করে অভিযানে পাঠিয়েছেন। সব মিলে মোট যুদ্ধাভিযানের সংখ্যা ৬৩টি। এতগুলো যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা মাত্র ১.৫%?!! এতেই বোঝা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে, তাতে রক্তপাত ও খুনাখুনির হার ছিল অনেক কম। মুসলিমগণ যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করে মানুষের জীবন সুরক্ষার বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

বর্তমান সময়ে যতগুলো সভ্যতার কথা আমরা জানি, সেসব সভ্যতার মাঝে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যার দিকে যদি আমরা তাকাই, বিশেষ করে তাতে অশংগ্রহণ করা যেসব দেশ এখনো নিজেদের সভ্যতার ধ্বজাধারী বলে দাবি করে এবং কথায় কথায় মানবাধিকারের বুলি আওড়ায়, এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সৈনিকদের সংখ্যার সঙ্গে নিহতের সংখ্যা তুলনা করি তাহলে আমরা হতবাক হয়ে যাই। সভ্যতার এই যুদ্ধে নিহতের সহস্রাংশের হার ছিল ৩৫১%!!

এ পরিসংখ্যান মিথ্যা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়া সেনাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৫,৬০০,০০০ (এক কোটি ছাপ্পান্ন লাখ)। কিন্তু এই যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল ৫৪,৮০০,০০০ (পাঁচ কোটি আটচল্লিশ লাখ) মানুষ। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সংখ্যার চেয়ে আরও তিন গুণ বেশি মানুষ নিহত হয়। নিহতের সংখ্যা বেশি হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল, প্রতিটি সেনাদল নিরপরাধ বেসামরিক মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। হাজার হাজার টন বোমা ও বিস্ফোরক তারা বিভিন্ন শহর ও জনবসতির ওপর নিক্ষেপ করে মানুষের বাড়িঘর ধ্বংস করে, অর্থনৈতিকভাবে তাদের পঙ্গু করে এবং সাধারণ মানুষদের দেশান্তর করে জাতিগতভাবে তাদের নির্মূল করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই, সব দিক থেকেই এটি ছিল চরম মানবিক বিপর্যয়। আর সেই যুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় থাকা জাতি-গোষ্ঠীগুলোই ছিল তৎকালীন উন্নত সভ্যতার দাবিদার। যেমন ফ্রান্স, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জার্মানি, ইতালি, জাপান।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর মুসলিমগণ তাঁর দেখানো পথেই হাঁটেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মহানবীর আদর্শের ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর সাহাবি সিদ্দিকে আকবর রা. শাম অভিযানে বের হওয়া সেনাবাহিনীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, তোমরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করো না। এ কথাটির মাধ্যমে প্রশংসাযোগ্য সকল কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথার মাধ্যমে তিনি সকল প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে সৈনিকদের সাবধান করে দেন। উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেন,

«وَلَا تُغْرِقُنَّ نَخْلًا وَلَا تَحْرِقُنَّهَا، وَلَا تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، وَلَا شَجَرَةً تُثْمِرُ، وَلَا تَهْدِمُوا بَيْعَةً...»

কখনো কোনো খেজুরগাছ তোমরা নষ্ট করবে না। বৃক্ষে আগুন দেবে না। যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কোনো পশু হত্যা করবে না। ফলদায়ক কোনো গাছ তোমরা বিনষ্ট করবে না। কোনো গির্জা বা উপাসনালয় ধ্বংস করবে না।[৩৮১]

এসব বিবরণ বিশৃঙ্খলা না করার মর্মে আবু বকর রা.-এর প্রদত্ত ওসিয়তের উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করেছে যাতে কোনো সেনাপতি এ কথা ভাবতে না পারে যে, প্রতিপক্ষের সাথে শত্রুতাস্বরূপ কিছু বিশৃঙ্খলা করা যেতে পারে। কারণ যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ইসলামে বর্জনীয়।

যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. প্রথমেই সৈনিকদের তাকওয়ার উপদেশ দিতেন। প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে কি না অন্তরে এ ভয় লালন করার ওপর গুরুত্বারোপ করতেন। এরপর মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে সেনাপতির অবস্থান নির্দেশক ঝান্ডা বেঁধে দেওয়ার সময় বলতেন,

«بسم الله وعلى عون الله، وامضوا بتأييد الله بالنصر، وبلزوم الحق والصبر، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ﴿وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾، لا تجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا عند القدرة، ولا

৩৮১. বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৭৯০৪।

تسرفوا عند الظهور، ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وفي شن الغارات، ولا تغلوا عند الغنائم، ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا، وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به، وذلك هو الفوزالعظيم»

আল্লাহর নাম নিয়ে ও তাঁর সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে শুরু করছি। বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আস্থা রেখে এবং সত্য ও ধৈর্যের চেতনা লালন করে রওয়ানা করো। যারা আল্লাহর প্রতি কুফরি লালন করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আর কখনো সীমালঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৩৮২] রণাঙ্গনে শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার পর কাপুরুষতা দেখাবে না। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লাশ বিকৃত করবে না। বিজয়ের মুহূর্তেও সীমালঙ্ঘন করবে না। বৃদ্ধ, নারী ও নবজাতককে হত্যা করবে না। তাদের হত্যা থেকে বিরত থাকবে রণাঙ্গনে শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সময় এবং আক্রমণ করার মুহূর্তে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে চুরি, দুর্নীতি করবে না। জিহাদের মতো মহান ইবাদতকে তোমরা পার্থিব হীন উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র রাখবে এবং আল্লাহর সঙ্গে যে লেনদেন হয়েছে তার সুফল ও চিরস্থায়ী লাভের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এটিই তো মহা সাফল্য।[৩৮৩]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ হোক বা শান্তিপূর্ণ সমাধান, সব ক্ষেত্রেই ইসলাম ও তার সভ্যতা উন্নত চরিত্র অবলম্বনের যে বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছে, এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, ইসলামি সভ্যতা নামক বৃক্ষের শিকড় হলো উন্নত চরিত্র, কাণ্ড হলো দয়া, ডালপালা হলো ক্ষমা, ফল হলো ভ্রাতৃত্ব। কারণ অদম্য পরাশক্তি এবং বিশ্বমানচিত্রে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও ইসলাম কখনো বিধর্মী জাতি-গোষ্ঠীকে লাঞ্ছিত করেনি। কখনো তাদের প্রতি অবিচার প্রদর্শন করেনি। ইসলাম সবসময় তাদের বিশ্বাসকে সম্মান দিয়েছে। (তারা কুফরি বিশ্বাস লালন করা সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাসে

---

৩৮২. সুরা বাকারা : ১৯০।

৩৮৩. ইবনে কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার*, খ. ১, পৃ. ১০৭।

ইসলাম কোনো বাধা দেয়নি)। ইসলামি ভূখণ্ডে মুসলিম নাগরিকদের মতো তাদেরকেও অবাধ ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো, ক্রুসেডারদের দখল থেকে জেরুজালেম উদ্ধারকারী বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর আচরণ। ক্রুসেডার বন্দিদের ও সেনাপতিদের সঙ্গে তিনি যে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করেন, নিরপেক্ষ খ্রিষ্টান জ্ঞানী ও জাতি-গোষ্ঠী আজও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

17.07.'21
2:50 AM
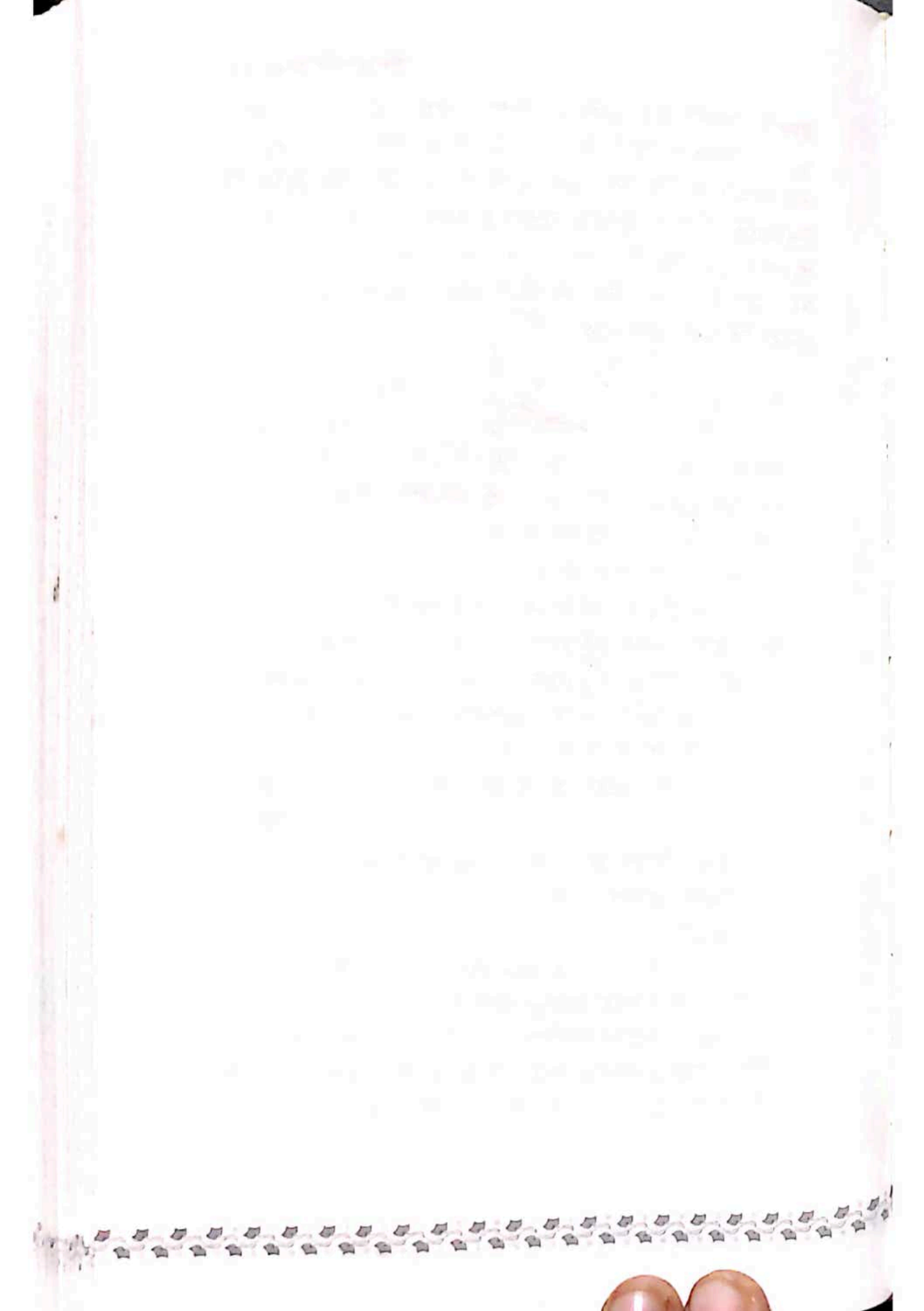
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচারবিভাগ

ইসলামি বিচারবিভাগ এবং গোটা মানবসভ্যতার উন্নয়নে তার সুস্পষ্ট অংশগ্রহণের ইতিহাস পড়ে সত্যিই অবাক হতে হয়। ইসলামি বিচারবিভাগ শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও যথার্থতার যে নজির স্থাপন করেছে, ইসলাম আগমনের পূর্বে অন্য কোনো সভ্যতায় এর নজির পাওয়া যায় না। এমনকি ইসলাম আগমনের পরেও এর কোনো জুড়ি ছিল না, শত শত বছর যাবৎ ইসলামের বিচার চর্চার এ ইতিহাস সভ্যতার পরিপূর্ণ ভান্ডারে পরিণত হয়েছে আর বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে যে ন্যায় ও ইনসাফ আবিষ্কারের কথা বলা হচ্ছে, নিঃসন্দেহে তার সবগুলো উপাদান এই চিরন্তন ইসলামি সভ্যতা থেকেই নেওয়া। কারণ কোনো অসাধু বিষয় ইসলামি সংবিধানের সামনে টিকে থাকতে পারে না। শত শত বছর ধরে ইসলামি সভ্যতায় আলোকিত এই বিচারবিভাগের আগাগোড়া অধ্যয়ন করার পর তার সুফল ও সাফল্যের ইতিবৃত্ত জেনে তা গ্রহণ করে আজ নিজেদের উন্নত ও সুসভ্য বলে তারা দাবি করছে। বিপরীতে আমরা শুধু তাদের চাপানো সামান্য কিছু নীতি গ্রহণ করে তাদের অনুসারী হয়ে গেছি। ভুলে গেছি, বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠায় একসময় আমরাই ছিলাম সর্বাগ্রে, সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠ জাতি।

বিচারবিভাগের আলোচনা আমরা নিম্নবর্ণিত একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করছি :

প্রথম অনুচ্ছেদ : সভ্য জাতি বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি ন্যায়বিচার অনুসন্ধানের আগ্রহ লালন

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বিচারকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার সহায়ক কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার

প্রথম অনুচ্ছেদ

১. সভ্য জাতি বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি ন্যায়বিচার অনুসন্ধানের আগ্রহ লালন

অন্যসব সভ্যতাকে ছাপিয়ে ইসলামি সভ্যতা যে-কয়েকটি কারণে উন্নত আসন লাভ করেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইসলামি সভ্যতা এমন কিছু নীতি ও ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে যা সরাসরি মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর তা কারও ব্যক্তিগত স্বার্থকে পরোয়া করে না। ইসলামি সভ্যতার আগমনের পূর্বে গোটা মানবজাতি ছিল আত্মিক ও মানসিক পবিত্রতা থেকে অনেক দূরে। ইসলামি সভ্যতার আগমনের পর মানুষ তা গ্রহণ করে সেই আত্মিক ও মানসিক পবিত্রতার সন্ধান লাভ করে ধন্য হয়েছে। ইসলামি সভ্যতার পবিত্র মূল্যবোধ বাস্তবিক জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর যে সুফল মুসলিমগণ পৃথিবীবাসীর সামনে তুলে ধরেছে, তা যুগ যুগ ধরে বিশ্বমানবতাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ধর্মবর্ণনির্বিশেষে যারাই ইসলামি বিচারবিভাগের শরণাপন্ন হয়ে মোকদ্দমা দায়ের করেছে, ইসলামি বিচারবিভাগ সবসময় তাদের জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর সুফল শুধু যে বিচারপ্রার্থীরা একাই ভোগ করেছে তা নয়, বরং পুরো মুসলিমজাতি তা থেকে উপকৃত হয়েছে। কারণ এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল জনগণের মাঝে ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণের মৌলিক উৎস, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিমগণ নিজ থেকেই সে মূল্যবোধ আবিষ্কার করেছে এমনটি নয়, বরং এই মহান ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছে কুরআনুল কারিম এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আদর্শ থেকে। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে কুদসিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণী এভাবে বর্ণনা করেন,

«يَا عِبَادِيْ، إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوْا»

হে আমার বান্দাগণ, অবিচারকে আমি নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও তা নিষিদ্ধ করেছি। কাজেই কখনো তোমরা অবিচার করো না।[৩৮৪]

এখান থেকেই মুসলিমগণ ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অনুধাবন করে সমাজজীবনে তা প্রয়োগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন।

ন্যায়বিচার শুধু মুসলিমদের মধ্যেই প্রয়োগ করতে হবে এমনটি নয়, বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য সুবিচার প্রয়োগ করতে। বিধর্মীদের প্রতি সুবিচার প্রয়োগের এমন সিদ্ধান্ত বিশ্বসভ্যতায় ছিল একেবারেই নতুন বিষয়। এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করো, এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।[৩৮৫]

ইসলাম বিধর্মীদের প্রতিও ন্যায় ও সাম্যের আচরণ করার আদেশ করেছে। যথাযথভাবে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। দুর্বল ভেবে তাদের ওপর বিন্দুমাত্র অবিচার বা খেয়ানত না করতে মুসলিমদের সতর্ক করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

« مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انتقصَه حَقًّا، أو كلَّفَه فوقَ طاقتِه أو أخذَ منهُ شيئًا بغيرِ طيبِ نفسٍ فأنا خَصمهُ يومَ القيامةِ»

---

৩৮৪. মুসলিম, হাদিস নং ২৫৭৭।

৩৮৫. সুরা মায়িদা : ৮।

যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোনো (বিধর্মী) লোকের ওপর অবিচার করবে বা তার প্রাপ্য কম দেবে বা সামর্থ্যের বাইরে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেবে অথবা সন্তুষ্টিপূর্ণ সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, কেয়ামতের দিন আমি নিজে তার বিপক্ষে বাদী হব।[৩৮৬]

এ কারণেই ইসলাম মুসলিমজাতির কাঁধে স্বধর্মী-বিধর্মী সকলের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব চাপিয়েছে। শুধু দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, এর জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«تَعْدِيْلٌ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ»

দুজন ব্যক্তির মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সদকা।[৩৮৭]

শুধু তাই নয়, বাদী-বিবাদী উভয়কে বাস্তবতা জাল করা, নিজ স্বার্থের পক্ষে অসাধু যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করা এবং অন্যায়ভাবে তাকে সমর্থন দেওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, এই সঠিক ইসলামি শিক্ষাই প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়কে সকল অনিষ্টের বিরুদ্ধে সচেতন রাখে। সত্য বিকৃতি ও গোপন করা থেকে তাদের বারণ করে। তাই তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّما أنا بَشَرٌ وإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، وأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ ما أَسْمَعُ، فَمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أَخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أَقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাকো। তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের চেয়ে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী হতে পারে। ফলে আমি যেভাবে শুনেছি, সেভাবে রায় দেওয়ার ফলে কাউকে যদি তার অপর ভাইয়ের অধিকার দিয়ে দিই, তাহলে সে যেন তা

---

৩৮৬. *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩০৫২; *বাইহাকি*, হাদিস নং ১৮৫১১।

৩৮৭. *বুখারি*, হাদিস নং ২৮২৭; *মুসলিম*, হাদিস নং ১০০৯।

গ্রহণ না করে। কারণ বস্তুত আমি তার জন্য জাহান্নামের এক টুকরো আগুন প্রদান করেছি।[৩৮৮]

এ থেকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, ইসলামি সভ্যতা মানুষকে সচ্চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়েছে। পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে ঐশী ইনসাফের বীজ বপন করেছে। এই সভ্যতার ধারকবাহকদের কোনো ভয় নেই, কারণ তারা বাদী-বিবাদীকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ হিসেবে পৃথক করে দেখেনি। সুতরাং এই চিরন্তন সভ্যতার মাঝে যারা সন্দেহের বীজ বপন করতে চায়, তাদের হীন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য কতটা অন্যায় ও অযৌক্তিক, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

৩৮৮. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৫৬৬; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৩১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২. বিচারকের ন্যায়প্রতিষ্ঠার সহায়ক কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার

বিচারবিভাগ খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যালয়। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এটাই ইসলামের সর্বোচ্চ বিভাগ। এই বিভাগের দায়িত্ব হলো কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে শরিয়তসম্মত বিধান মোতাবেক বাদী-বিবাদীর মাঝে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসা ও সমাধান করা।[৩৮৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ছোট-বড়, শাসক-শাসিত সকলের সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শরিয়ত অনুযায়ী বিচার বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে। পাশাপাশি বিচারকগণ যেন কথা ও কাজে সবসময় আল্লাহর ভয় লালন করেন, ইসলাম সেই দীক্ষা তাদের শুরু থেকেই দিয়ে আসছে। কারণ কোনো বিচারক যদি শরিয়তের গণ্ডির বাইরে গিয়ে বিচার সমাধা করেন, তবে তা বাদী-বিবাদীর প্রতি চরম অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহর বিচারনীতি অবজ্ঞার ফলে দ্বিগুণ অপরাধী সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই ইসলাম জুলুমকারী এবং সুবিচার বর্জনকারী বিচারকদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ»

বিচারক তিন প্রকারের। দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামি এবং এক প্রকারের বিচারক জান্নাতি। জেনেশুনে যে বিচারক অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামি। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করেই যে বিচারক মানুষের অধিকারসমূহ বিনষ্ট করে দেয়, সেও

---

৩৮৯. ইবনে খালদুন, *আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২০।

জাহান্নামি। আর যে বিচারক ন্যায় বিচার করে সে জান্নাতের অধিকারী।[৩৯০]

এতে কোনো সন্দেহ নেই, সূক্ষ্মভাবে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল আস্থার জায়গা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। এতে করে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির পথ বন্ধ হয়। পাশাপাশি ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে একই বিচারনীতি প্রয়োগ হয় এবং দীর্ঘ সময়ের পরম্পরায় তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

বিচারকার্যে যদিও প্রধান দুটি উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। তারপরও যেসব মোকাদ্দমা নিষ্পত্তিতে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস-এ চারটি মৌলিক উৎসে কোনো উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না, তখন বিচারক সেসব বিষয়ে নিজে ইজতিহাদ বা গবেষণা করতে পারবেন। সেই ইজতিহাদে তিনি পুরস্কার লাভ করবেন। আমর ইবনুল আস রা. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

«إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فَلَهُ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أخْطَأَ فَلَهُ أجْرٌ»

একজন বিচারক বিচারকার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে যখন ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করে সঠিক রায় প্রদান করেন, তখন তার জন্য দুটি পুরস্কার লেখা হয়। আর ইজতিহাদ করতে গিয়ে যখন ভুল করেন তখন তার জন্য একটি পুরস্কার লেখা হয়।[৩৯১]

দুটি পুরস্কারের একটি হলো সত্য অনুসন্ধানে আন্তরিক প্রচেষ্টার এবং দ্বিতীয়টি হলো সত্য খুঁজে পেয়ে সে মতে বিচার সাধনের। আর যে বিচারক ভুল করবে, তার পুরস্কার এজন্য যে, সত্য অনুসন্ধানে তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। সে ক্ষেত্রে বিচারক ভুল সিদ্ধান্ত দিলেও কোনো গুনাহ হবে না, কারণ তার মনের ইচ্ছা ছিল সৎ। তবে বিচারক ইজতিহাদ তখনই করতে পারবেন, যখন তার মাঝে ইজতিহাদ করার সব যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে।

---

৩৯০. *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩২২; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৫৭৩; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৩১৫।

৩৯১. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৯১৯; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৫।

বিচার-মীমাংসায় বিচারককে বাদী-বিবাদীর মাঝে পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

«إذا تَقاضى إليكَ رجلانِ فلا تَقضِ للأوَّلِ حتّٰى تَسمعَ كلامَ الاخرِ فإنَّك إذا فعَلَت ذٰلكَ تبيَّنَ لَكَ القضاءُ»

তোমার কাছে যখন দুই ব্যক্তি বিচারের আবেদন করবে, তখন দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণ না শুনে প্রথম পক্ষের কথার ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করো না। আর খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, তুমি কীভাবে ফয়সালা করছ।[৩৯২]

তেমনই একজন বিচারকের জন্য আবশ্যক হলো, রাগের মাথায় রায় প্রদান না করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»

কোনো বিচারক যেন রাগের মাথায় দুইজনের মাঝে ফয়সালা না করে।[৩৯৩]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারককে উপযুক্ত বেতন প্রদান করতে হবে। কোনো প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করা[৩৯৪] থেকে তাকে নিষেধ করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فرَزَقْنَاه رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ»

বেতন ধার্য করে কাউকে আমরা কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান করার পর সে যদি তা থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তাহলে সেটা চুরি বলে বিবেচিত হবে।[৩৯৫]

বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে কখনো বিরোধপূর্ণ বিষয় সরাসরি দেখার প্রয়োজন পড়ে। সে ক্ষেত্রে বিচারক নিজেই তা নির্ধারণ করবেন। একাকীও যেতে

---

৩৯২. *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩৩১; *আহমাদ*, হাদিস নং ১২১০।
৩৯৩. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৩৯; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৬।
৩৯৪. আবদুল মুনয়িম মাজেদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ৫৩।
৩৯৫. *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৯৪৩; ইবনে খুযাইমা, হাদিস নং ২৩৬৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৪৭২।

পারেন। পরিদর্শন শেষে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তিনি রায় দেবেন। উদাহরণ : একবার আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। তাদের আসার অপেক্ষা না করে বিরোধ মীমাংসায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দ্রুত সেখানে ছুটে যান। কারণ, পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক ও সংঘাতময়। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। একজন মুহাজির একজন আনসারির নিতম্বে আঘাত করে। প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে সে আনসার গোষ্ঠীকে ডেকে বলে, কোথায় আনসার গোষ্ঠী? অপরদিকে মুহাজিরও ডাকতে থাকে, হে মুহাজির গোষ্ঠী! কিন্তু তাদের এ ডাকাডাকি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনিয়ে দেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? সবাই বলল, একজন মুহাজির একজন আনসারের নিতম্বে আঘাত করেছে। এরপর প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে পরস্পরে আনসার ও মুহাজির গোষ্ঠীকে ডাকাডাকি শুরু করে। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এগুলো ছাড়ো। এ ধরনের ডাকাডাকি বড় দুর্গন্ধময়।[৩৯৬]

আরেকটি ঘটনা। মুহাম্মাদ ইবনে রুমহের বিবরণ অনুযায়ী আল-কিন্দি বলেন, বাড়ির প্রাচীর নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে আমার বিরোধ চলছিল। আমার মা আমাকে বললেন, তুমি বিচারক মুফাদদাল ইবনে ফুদালার (১৭৪-১৭৭ হি. পর্যন্ত বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) কাছে গিয়ে বলো, তিনি যেন এখানে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তদন্ত করেন। তখন তার কাছে গিয়ে আবেদন করলে তিনি বলেন, আসরের পর বসার ব্যবস্থা করো, আমি এসে এর মীমাংসা করব। তিনি এসে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে প্রাচীরটি দেখলেন। পরে প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢুকে তা দেখলেন। অতঃপর এই বলে প্রস্থান করলেন যে, প্রাচীরটি তোমাদের প্রতিবেশীর।[৩৯৭]

এমনকি বিচারকের অধিকার আছে প্রয়োজন হলে কারও কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার। আলি রা. একবার অদ্ভুত এক মামলার এজলাসে ছিলেন। নিত্যনতুন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছিল। উত্তেজক জবানবন্দি

---

৩৯৬. *বুখারি*, হাদিস নং ৪৬২৪; *মুসলিম*, হাদিস নং ২৫৮৪।

৩৯৭. আল-কিন্দি, *আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*, পৃ. ৩৭৮; যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি*, খ. ২, পৃ. ৫১৫।

রেকর্ড করা হচ্ছিল। ফলে মামলাটি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তখন আলি রা. পুত্র হাসান রা.-এর কাছে পরামর্শ চান। এর দ্বারা বোঝা যায়, একজন বিচারক মামলার বিষয়ে অনায়াসে যে-কারও সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। বিস্ময়কর এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবনুল কাইয়িম রহ. তার বিখ্যাত *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা* গ্রন্থে। তিনি বলেন, একবার আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর কাছে একজন লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়। যাকে একজন রক্তাক্ত নিহত ব্যক্তির ঘটনাস্থলে হাতে রক্তমাখা ছুরিসহ পাওয়া গিয়েছিল। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি হত্যা করেছি! আলি রা. রায় দেন, কেসাস হিসেবে তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করো। তাকে নিয়ে গেলে এক ব্যক্তি ছুটে এসে বলতে থাকে, হে আমার জাতি, তোমরা তাড়াহুড়া করো না বরং একে আলি রা.-এর কাছে নিয়ে চলো। তাকে আলি রা.-এর কাছে নিয়ে আসা হলে দ্বিতীয় লোকটি বলতে থাকে, হে আমিরুল মুমিনিন, সে হত্যাকারী নয়, বরং আমি হলাম প্রকৃত হত্যাকারী। তখন আলি রা. প্রথম লোকের উদ্দেশে বলেন, হত্যা না করেও কেন তুমি হত্যার দাবি করেছ? উত্তরে সে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমার আর কীই-বা করার ছিল! পুলিশ এসে আমাকে এমন অবস্থায় পেয়েছে যে, আমার হাতে তখন রক্তমাখা ছুরি এবং ঘটনাস্থল থেকে আমাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। আমি যদি অস্বীকার করতাম, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত না। উপরন্তু ওই এলাকায় হত্যার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলে হত্যাকারী অজানা থাকায় বিচারকের সামনে এসে এলাকাবাসীকে কাসামা[৩৯৮] (শপথ) করতে হতো। এসব কিছু বিবেচনা করে আমি নিজেকে হত্যাকারী বলে স্বীকার করেছি। এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাব বলে আশা করেছি। উত্তরে আলি রা. বলেন, তোমার কাজটি ভালো হয়নি। এখন বলো, রক্তমাখা ছুরি নিয়ে ওখানে তুমি কী

---

৩৯৮. কাসামার একটি পদ্ধতি হলো, হত্যাকারী অজানা থাকলে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে পঞ্চাশজন ব্যক্তি বিচারকের সামনে হত্যার ক্ষতিপূরণ দাবি করে শপথ করবে। সংখ্যায় তারা পঞ্চাশজন না হলে যতজন উপস্থিত থাকবে, সবাই পঞ্চাশ বার শপথ করে এই দাবি করবে। তবে সেই পঞ্চাশজনের মাঝে নারী, শিশু, পাগল, দাস থাকা যাবে না। কাসামার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, যাদের বিরুদ্ধে হত্যার অপবাদ এসেছে, তারা হত্যার সঙ্গে জড়িত নয় বলে উপর্যুক্ত নিয়মে শপথ করবে। এভাবে দাবিদারগণ যদি শপথ করে, তবে ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। আর যদি অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শপথ করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

করছিলে? উত্তরে সে বলল, পেশায় আমি একজন কসাই। ভোরের আবছা অন্ধকারে আমি দোকানের উদ্দেশে বের হই। এরপর একটি গরু জবাই করে তার চামড়া ছেলা শুরু করি। এমন সময় আমার প্রস্রাবের বেগ হলে দোকানের পাশে ঘটনাস্থলে প্রস্রাব করতে যাই। প্রস্রাব শেষে আমি দোকানের দিকে ফিরতে গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি নিহত হয়ে পড়ে আছে। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। ছুরি হাতে নিয়েই আমি ঘটনা জানার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপনার বাহিনী এসে দাঁড়ায় এবং আমাকে গ্রেফতার করে। আশপাশের মানুষজনও বলতে থাকে, আর কেউ নয়, এই লোকই হত্যা করেছে। এরপর আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, এতগুলো মানুষের সাক্ষ্যের সামনে আমার একার সাক্ষ্য কোনো কাজে আসবে না। তাই বাধ্য হয়ে, অপরাধ না করেও তা স্বীকার করে নিই। আলি রা. দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলেন, এবার তোমার বৃত্তান্ত বলো! সে বলল, ইবলিসের প্ররোচনায় অর্থের মোহে পড়ে ওই ব্যক্তিকে আমি হত্যা করেছি। এরপর নৈশ প্রহরীর আগমন টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কেটে পড়ি। কসাই লোকটি যে বিবরণ দিয়েছে, পালানোর সময় ঠিক সেই অবস্থায়ই তাকে আমি সেখানে দেখতে পাই। নৈশ প্রহরী আসার আগেই আমি নিকটস্থ একটি জায়গায় আত্মগোপন করি। তখন প্রহরীরা তাকে ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসে। আপনি যখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তখন ভাবলাম, আমি ইতিমধ্যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, এখন এ লোকটিও যদি আমার কারণে বিনা অপরাধে মারা যায়, তাহলে এর শাস্তিও পরকালে আমাকে ভোগ করতে হবে। তাই আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। আলি রা. পুত্র হাসান রা.-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, এই লোকটি যদিও একজনকে হত্যা করেছে। কিন্তু অপরদিকে সে একজন নিরপরাধ লোকের জীবন বাঁচিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

এবং যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করে।[৩৯৯]

৩৯৯. সুরা মায়িদা : ৩২।

আলি রা. উভয়কে মুক্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থ তহবিল থেকে এর দিয়ত (রক্তপণ) প্রদান করেন। এই ঘটনায় ইবনুল কাইয়িম রহ. টীকা যোগ করে বলেন, এখানে যদি নিহতের অভিভাবকদের সম্মতিতে রক্তপণ চুক্তি সম্পাদন হয়ে থাকে, তাহলে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু যদি তাদের সম্মতি না থাকে, তাহলে ফকিহদের মতামত হলো, এই অবস্থায় কেসাস বহাল থাকবে। কারণ অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। আর যেহেতু কেসাস প্রত্যাহার করার কোনো কার্যকারণ নেই, তাই কেসাস কার্যকর করা আবশ্যক হয়ে যায়।[৪০০]

মানুষের মাঝে বিচারবিভাগের ছিল সুউচ্চ মর্যাদা ও প্রভাব। বিচারক ও তার অবস্থানের সম্মানার্থে এজলাসে সকলের নীরবতাবলম্বন ছিল সাধারণ নিয়ম। *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস* গ্রন্থে ইবনে যাকওয়ানের বৃত্তান্ত বর্ণনায় লেখক বলেন, তিনি ছিলেন প্রবল ভাবমূর্তিসম্পন্ন একজন বিচারক। তার উপস্থিতিতে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। তার এজলাসের চেয়ে অধিক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এজলাস কখনো দেখিনি। এজলাসে বসলে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। তার সামনে বাদী-বিবাদী ছাড়া কেউ আওয়াজ করার দুঃসাহস করত না। তার এজলাসে উপস্থিত লোকেরা হাতের ইশারায় কথা বলত। মানুষ তার কথা শুনে অভিভূত হতো।[৪০১]

ইসলামি সমাজে বিচারবিভাগের অপরিসীম গুরুত্বের কথা চিন্তা করে মুসলিম জ্ঞানী-মনীষী ও বিজ্ঞজনেরা সমাজে সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিচারকদের উপদেশ দিতেন। আবু মুসা আশআরি রা.-কে কুফার বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠানোর সময় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার উদ্দেশে একটি নাতিদীর্ঘ উপদেশবাণী লেখেন। যার সারমর্ম ছিল,

> পর সমাচার এই যে, মনে রাখবেন বিচারকাজ একটি চিরন্তন ফরয এবং অনুসৃত রীতি। আপনাকে যেহেতু এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে, তাই এ কাজটি আপনি ভালো করে উপলব্ধি করুন। কারণ বাস্তবায়ন ছাড়া শুধু মুখে বলে কোনো লাভ নেই। আপনার অবয়ব, আপনার ন্যায়বিচার এবং আপনার বিচারিক

---

৪০০. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৮২-৮৪।

৪০১. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৮৪।

মজলিসের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সুখ বিতরণ করুন। আপনার দুর্বলতা দেখে কোনো অসাধু ব্যক্তি যেন লোভের চিন্তা না করতে পারে এবং আপনার সুবিচার থেকে কোনো দুর্বল ব্যক্তি যেন হতাশ না হয়ে পড়ে। মনে রাখবেন, বাদীর কর্তব্য হলো উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করা। আর বিবাদীর কর্তব্য হলো শপথ করা। মুসলিমদের মাঝে চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ। তবে এমন কোনো চুক্তি করা যাবে না যা হারামকে হালাল করে অথবা কোনো হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে। গতকালের করা ফয়সালা যদি আজ আপনার কাছে ভুল মনে হয়, তাহলে ওই রায় প্রত্যাহার করে নিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। কারণ সত্য চিরন্তন। আর মিথ্যা রায়ের ওপর অবিচল না থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসাটাই উত্তম। কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে যে বিষয়ের সমাধান আপনি খুঁজে পাবেন না, তার সমাধান আপনি আপনার বোধশক্তি, উপলব্ধি এবং হৃদয়ে উদিত হওয়া ফয়সালার ওপর ছেড়ে দেবেন। অনুরূপ মামলা ও মীমাংসার ওপর অনুমান করে রায় দিয়ে দেবেন।[৪০২]

---

৪০২. ইবনে খালদুন, আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি, খ.১, পৃ. ২২১।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩. বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নয়ন

হিজরি প্রথম দুই তিন শতকে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। সেই বিস্তৃতির ফলে যেহেতু নানা দেশের নানা বর্ণের জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ ইসলামি সভ্যতার শীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাই শুরু থেকেই ইসলামি সাম্রাজ্যের জন্য এমন একটি সুগঠিত ও স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থা প্রণয়ন করা ছিল অতীব জরুরি, যা ইসলামি সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের মানুষের মাঝে বিচারিক সমতা সাধন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই ইসলামি বিচারব্যবস্থা জন্মলাভ করে।

জীবদ্দশায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতেন। সকল ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর ইসলামের সূচনালগ্নে খলিফাগণ সরাসরি বিচারকাজের ফয়সালা করতেন। এরপর যখন ইসলামি সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তার ঘটতে থাকে, অন্যসব সভ্যতার লোকদের সঙ্গে মুসলিমদের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে, খলিফার দায়িত্ব বেড়ে যায়, তখন মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য সরকারিভাবে স্বতন্ত্র বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামল থেকেই বিচারক নিয়োগের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। তখন মদিনার বিচারক হিসেবে আবু দারদা রা.-কে, বসরার বিচারক হিসেবে শুরাইহ রা.-কে এবং কুফার বিচারক হিসেবে আবু মুসা আশআরি রা.-কে নিয়োগ করা হয়। আবু মুসা আশআরি রা.-কে নিয়োগ দেওয়ার সময় খলিফা উমর রা. তার কাছে বিচারনীতি সংবলিত প্রসিদ্ধ সেই নাতিদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন।[৪০৩]

---

৪০৩. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২১।

এরপর উমাইয়া শাসনামলে বিচারবিভাগের আরও উন্নতি ঘটে। নতুন অনেক বিষয় তাতে সংযোজন করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের অনুসরণে উমাইয়া শাসকগণও সরাসরি বিচারবিভাগ ও আদালত পরিচালনা করতেন। কিন্তু যুগ-চাহিদা ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে উমাইয়া শাসকগণ বিভিন্ন বিভাগকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে দেন। কিন্তু বিচারবিভাগ সংশ্লিষ্ট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারা নিজেদের অধীনে রাখেন। সেগুলো হলো যথাক্রমে খিলাফতের রাজধানী দামেশকে সরাসরি বিচারক নিয়োগ করা, বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নজরদারি, সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে বিচারকার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিশ্চিত এবং বিচারক নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ক বিশেষ দিকগুলো তদারকি করা। এরপর ফৌজদারি বিধি, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিষয়ে ফয়সালা করার যে দায়িত্ব সেগুলো উমাইয়া শাসকগণ সরাসরি পরিচালনা করতেন। বিশেষ করে অপরাধদণ্ড ও ফৌজদারি মামলার বিচারগুলো সরাসরি উমাইয়া শাসকগণ দেখাশোনা করতেন এবং এজন্য তারা স্বতন্ত্র ইউনিট উদ্ভাবন করেন।[৪০৪]

এরপর আব্বাসীয় খিলাফতের সময় বিচারব্যবস্থার প্রশাসনিক অবকাঠামো উন্নতির শিখরে পৌঁছে। নানা শাখাপ্রশাখা ও ব্যবস্থাপনা তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। শাসনামল শুরু হওয়ার পর থেকেই আব্বাসীয় খলিফাগণ বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে উমাইয়া শাসনামলের শেষদিকে এ বিভাগের যে দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো ধরা পড়েছিল, তা সংশোধন করেন। আব্বাসীয় খিলাফতের মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যাকে ধরা হয় সেই বিখ্যাত আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মনসুর বিচারবিভাগকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য চারটি অনুষঙ্গের একটি মনে করতেন।[৪০৫]

খিলাফতের অঞ্চল ও প্রদেশ বেড়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে প্রাদেশিক গভর্নরগণ বিচারক নিয়োগ ও তাদের অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। তবে আব্বাসি খিলাফতের পরিমণ্ডলে নতুন

---

৪০৪. মুহাম্মাদ যুহাইলি, *তারিখুল কাযা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

৪০৫. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৫২০।

আরেকটি পদ যোগ হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'কাযিউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি)। তিনি রাজধানী বাগদাদের প্রধান বিচারপতি হওয়ার পাশাপাশি সরকার তাকে আঞ্চলিক বিচারক নিয়োগ, বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নজরদারি, সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে বিচারকাজ সম্পাদনের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং বিচারকদের পদচ্যুত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। এ কারণেই আব্বাসীয় শাসনামলে বিচারবিভাগ পুরোপুরি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করে এবং উন্নতির শিখরে পৌঁছে। আঞ্চলিক বিচারক নিয়োগ এবং বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নজরদারি করার জন্য প্রথম যাকে কাযিউল কুযাত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তিনি হলেন বিখ্যাত কাযি ইমাম আবু ইউসুফ রহ.। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত কাযি এবং তার বিশিষ্ট উযির। তিনি বাগদাদের পাশাপাশি ইরাক, খোরাসান, মিশর এবং শামের বিচারক নিয়োগের অধিকার রাখতেন।[৪০৬]

বিচারবিভাগের পরিধি এবং অবকাঠামোতে ব্যাপক বিস্তার ঘটার ফলে আব্বাসীয় সরকার প্রধান বিচারপতি ও আঞ্চলিক বিচারপতিদের জন্য যোগ্য সহকারী নিয়োগ করে। তারা বিচারিক কাজে এবং মামলা নিষ্পত্তির কাজে বিচারপতিদের সহায়তা করতেন। তাদের পদগুলো ছিল :

এক. সহকারী বিচারপতি। তিনি বিভিন্ন শহরে ও দূরের গ্রাম্য এলাকায় বিচারকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

দুই. বিচারকের লেখক বা আদালতের লেখক। তিনি এজলাসে উভয় পক্ষের বক্তব্য, সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং বিচারকের রায় লিপিবদ্ধ করা, বাদী-বিবাদীর উপস্থিতি অনুসারে মামলা প্রস্তুত করা, এরপর বিচারকের সামনে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা এবং মুসাফির বা অচল ব্যক্তি ছাড়া কারও সঙ্গে অতিরিক্ত সম্প্রীতি না রাখা ইত্যাদি কাজগুলো তিনি পালন করতেন।

তিন. ঘোষক। তিনি বিচারকের পাশে দাঁড়িয়ে বিচারকের সম্মান ও মর্যাদা ঘোষণা করতেন। বাদী-বিবাদীর সম্মুখে বিভিন্ন ঘোষণা দিতেন।

---

৪০৬. আরনুস : তারিখুল কাযা মুহাম্মাদ যুহাইলি রচিত (*তারিখুল কাযা ফিল-ইসলাম* থেকে উদ্ধৃত।) পৃ. ২২৭।

চার. প্রহরী। তিনি মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। বিচারকের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য তিনি শতভাগ নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের লোকজন কে কোথায় বসবে সেগুলো নির্ণয় করতেন। এক পাশে নারী এবং অন্য পাশে পুরুষ বসার বিষয়টি নিশ্চিত করতেন।

পাঁচ. তদন্ত কর্মকর্তা। এ পদটির সংযোজন ঘটে আব্বাসীয় শাসনামলে। এটি উদ্ভাবনের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, বিচারকের সামনে যেসব বিষয় উত্থাপন করা হবে তার যথার্থতা তদন্ত করা। এ কাজের প্রথম উদ্ভাবক ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সহচর ও বিশিষ্ট কাযি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা। বিশিষ্ট দার্শনিক ও পণ্ডিত আল-কিন্দি বলেন, ১৭৪ হিজরি সনে মিশরের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া মুফাযযাল ইবনে ফুযালা তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। তার কাজ ছিল সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা। সাক্ষীগণ কতটুকু সৎ তা যাচাই-বাছাই করা।

ছয়. বণ্টনকারী। তিনি নিজ নিজ অংশ হকদারদের মাঝে সুষ্ঠুরূপে বণ্টন করে দিতেন। জমি সংক্রান্ত মামলা হলে উভয় পক্ষের জন্য জমির পরিমাণ ও সীমা নির্ণয় করে দিতেন। কোনো কোনো অঞ্চলে তাকে 'হাসসাব' বা হিসাবকারী বলেও ডাকা হতো। বিশিষ্ট লেখক মাওয়ারদি তার জন্য প্রযোজ্য শর্ত ও গুণাগুণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাত. আমিন। এরকম কিছু লোককে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যারা কাযিদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সুষ্ঠুভাবে দেখাশোনা করবে। যেমন এতিম, অক্ষম-অপারগ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অনুপস্থিত লোকদের সম্পদ দেখাশোনা করা; উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করার আগ পর্যন্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেখভাল করা। কাযি সিওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ প্রথম আমিন নিয়োগ প্রদান করে তাদেরকে এ কাজগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব দেন।

আট. নথি সংরক্ষক। তিনি বিচারকের যাবতীয় নথি, কাগজ, দলিল-দস্তাবেজ নিরাপদ ও নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি পদ, সেটি হলো দোভাষী। বাদী-বিবাদী বা সাক্ষীদের কেউ ভিনদেশি বা অনারব হলে বিচারকের সামনে তাদের বক্তব্য অনুবাদ

করার দায়িত্ব পালন করতেন। খিলাফতের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় এবং নানা জাতির ও নানা ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আব্বাসি শাসনামলে দোভাষীদের সংখ্যা বেড়ে যায়।[৪০৭]

তা ছাড়া ইসলামি সভ্যতায় বিচারিক এজলাস বা আদালত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পদ্ধতিও ছিল ভিন্নরকম। এজলাসে বিচারকের সামনে প্রথমে বাদী বিবাদীকে ডাকা হতো। আন্দালুসে একটি সুন্দর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যার নাম ছিল 'তাবে' পদ্ধতি। বিচারকের স্বাক্ষর ও সিল থাকা একটি কাগজের মাধ্যমে বাদী-বিবাদীকে ডাকা হতো। কে ধনী, কে গরিব, কে আমির, কে সাধারণ তার পরোয়া না করে সবাইকে একই নিয়মে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হতো।[৪০৮]

---

[৪০৭]. মুহাম্মাদ যুহাইলি, *তারিখুল কাযা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ২৪৬-২৫০।

[৪০৮]. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৫০-১৫১।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

বিচারক নিয়োগ ও যাচাই পদ্ধতি

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হতো, যাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার, সাম্য প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকার পাশাপাশি যথেষ্ট জ্ঞান, ধার্মিকতা, সততা ও চারিত্রিক স্বচ্ছতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটত।[৪০৯]

এ কারণেই খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিচারক নিয়োগে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিতেন। সেগুলো হলো, এমন ব্যক্তি যে ঘুষ নেবে না। আত্মপ্রদর্শনের মোহে পড়বে না। লোভের পেছনে পড়বে না।[৪১০] যার ফলে আমরা দেখি, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিভিন্ন অঞ্চলের বিচারকদের গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ইসলামি সভ্যতায় এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনার ওপরই বিচারব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়। পরবর্তীকালে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সেগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং নানা সমস্যার সমাধানে বিরাট অবদান রাখে।

খিলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া খলিফাগণও বিচারক নিয়োগের বেলায় জ্ঞান, যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাকে প্রাধান্য দিতেন। বিখ্যাত উমাইয়া শাসক উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. মিশরের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন ইবনে খাযামির সানআনিকে। কিন্তু এর আগেই তিনি ইবনে খাযামিরের যোগ্যতা, জ্ঞান, পরিপক্বতা, ধার্মিকতা ও দায়িত্ব গ্রহণে তার সামর্থ্যের পরিচয় পেয়ে যান। ইবনে খাযামিরকে বিচারপতি নিয়োগের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে হাজার রহ. লেখেন, একবার মিশর থেকে একদল অভিযাত্রী খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের কাছে আগমন করে। ওই দলের একজন ছিলেন ইবনে খাযামির। কথাপ্রসঙ্গে খলিফা

---

৪০৯. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৫৩-৫৪; ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২১।

৪১০. ওয়াকি ইবনে খালাফ, *আখবারুল কুযাত*, খ. ১, পৃ. ৭০।

সুলাইমান তাদের কাছে মরক্কোর অধিবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা সবাই মরক্কোবাসী সম্পর্কে নিজেদের মতামত ও মূল্যায়ন পেশ করেন। কিন্তু ইবনে খাযামির তাদের ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে অস্বীকার করেন। সবাই বের হয়ে যাওয়ার পর উমর ইবনে আবদুল আযিয তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মাসউদ, কেন তাদের ব্যাপারে আপনি মতামত দেননি? উত্তরে ইবনে খাযামির বলেন, আমার মুখ থেকে মিথ্যা কথা বের হয়ে যাবে এই ভয়ে কোনো মত দিইনি। এ ঘটনার পর থেকেই উমর তাকে চিনে রাখেন। এরপর তিনি যখন খলিফা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন, তখন মিশরের গভর্নর আইয়ুব ইবনে শুরাহবিলের কাছে ইবনে খাযামিরকে মিশরের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপত্র লেখেন। যার ফলে তিনি হিজরি ১০০ থেকে ১০৫ সন পর্যন্ত মিশরের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪১১]

যোগ্য ব্যক্তি শনাক্ত করা এবং বিশেষ বিশেষ পদে তাদের নিয়োগ দেওয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ কারণেই খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের উযির থাকা অবস্থায় উমর ইবনে আবদুল আযিয যোগ্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করেন। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের যাচাই করেন। যার ফলে ওই ঘটনার পর থেকে উমর ইবনে আবদুল আযিয ইবনে খাযামিরকে ইসলামি সাম্রাজ্যের কোনো একটি অঞ্চলের বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের জন্য মনস্থির করে রাখেন। পরে তিনি তা বাস্তবায়নও করেন। উমরের অনুমান বৃথা যায়নি। পাঁচ বছর বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি পুরো নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করেন। এ কারণেই ইবনে খাযামির সম্পর্কে ইবনে হাজার লেখেন, অনারবদের মধ্যে ইবনে খাযামিরই প্রথম মিশরের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে এক দিরহাম বা এক দিনারও তিনি গ্রহণ করেননি।[৪১২]

যদিও উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামল থেকেই বিচারব্যবস্থা পৃথক হয়ে যায়, যা উমাইয়া শাসনামলে পূর্ণতা লাভ করে, তারপরও আমরা দেখি বড় বড় ফকিহ ও বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ বিচারপতির পদ লাভ

---

৪১১. ইবনে হাজার, *রফউল ইসরি আন কুযাতি মিসর*, খ. ২, পৃ. ৩০৫।

৪১২. প্রাগুক্ত।

করা থেকে অনীহা প্রদর্শন করতেন। আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পুরোপুরি বাস্তবায়ন ঘটাতে যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায় এবং এর ফলে পরকালে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় এই আশঙ্কায়। *আখবারুল কুযাত* গ্রন্থে ওয়াকি বলেন, মিশরের গভর্নর ইয়াযিদ ইবনে হাতেম (মৃ. ১৭৭ হি.) একবার মিশরের বিচারপতি নিয়োগের ইচ্ছা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ এবং রাজসভাসদদের পরামর্শ চাইলে তারা তিনজন ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগের পরামর্শ দেন। তারা হলেন যথাক্রমে, হাইওয়া ইবনে শুরাইহ, আবু খুযাইমা (ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস গাসসানি। ঘটনার দিন আবু খুযাইমা আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাকে রাজপ্রাসাদে ডাকা হলে অনতিবিলম্বে তাকে গভর্নরের সামনে উপস্থিত করা হয়। প্রথম ডাক পড়ে হাইওয়া ইবনে শুরাইহের। তিনি বিচারপতির পদ গ্রহণে সাফ না করে দিলে শাস্তি দেওয়ার জন্য তরবারি ও চাবুক আনতে বলা হয়। পরিস্থিতি দেখে হাইওয়া নিজের সঙ্গে থাকা একটি চাবি বের করে বলেন, এটি আমার বাড়ির চাবি। আপনাদের কাছে রাখুন। কারণ আমি আমার পরকালে গমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। সভাসদগণ যখন দেখলেন, কোনোভাবেই তাকে রাজি করানো সম্ভব নয়, তখন তাকে ছেড়ে দেন। তখন হাইওয়া বলেন, বাকি দুজনের কাছে আমার এ সিদ্ধান্ত ও অবস্থানের কথা বলবেন না। তাহলে তারাও আমার মতো অস্বীকার করতে পারেন। এরপর হাইওয়া রাজদরবার থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যান।[৪১৩]

অপরদিকে অনেক বিচারক বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। তারা ভাবতেন, এ মহান কাজের বিনিময় গ্রহণ করলে এ পদের অবমূল্যায়ন হবে। তাদের অন্যতম হলেন আন্দালুসের বিখ্যাত বিচারক ইবনে সাম্মাক হামাযানি। তার গুণাগুণ ও কীর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট লেখক নাবাহি *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস* গ্রন্থে লেখেন, কাযি ইয়ায ও অন্যান্য মনীষীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইবনে সাম্মাক নিজেই ড্রেন বা নালা পরিষ্কার করতেন। ঘরের দরজায় বসে লাকড়ি কাটতেন। আর এই অবস্থায়ই মানুষ তার কাছে মামলার

---

৪১৩. ওয়াকি ইবনে খালাফ, *আখবারুল কুযাত*, খ.৩, পৃ.২৩২-২৩৩; আবদুর রহমান মিশরি, *ফুতুহ মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ২৬১।

নিষ্পত্তি করার জন্য হাজির হতো। তার কাছে সমাধান জিজ্ঞেস করত। তিনি শক্ত মোটা পশমের কাপড় পরিধান করতেন। যতদিন তিনি বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন, ততদিন তিনি শহরে কোনো বাহনে আরোহণ করেননি। তার বসত ছিল দূরের গ্রামে। দিন শেষে যখন গ্রামে অবস্থিত তার বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন তখন ক্ষীণগতির গাধার পিঠে চড়ে রওয়ানা হতেন। সামান্য উপার্জন থেকে যা আসত, তা দিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিচারকের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে তিনি কানাকড়িও গ্রহণ করতেন না।[৪১৪]

অনেক সময় বিচারক নিয়োগ হতো নির্বাচনের মাধ্যমে। গুরুত্বপূর্ণ এই পদের জন্য জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি সুন্দর ঐতিহ্য ছিল এই পদ্ধতি। বুওয়াইহি নামক এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে বিশিষ্ট দার্শনিক আল-কিন্দি বলেন, গভর্নর ইবনে তাহের একবার মিশরের জনগণকে এক জায়গায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। সবাই এক জায়গায় একত্র হয়। সেদিন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ইবনে তাহেরের কাছে উপস্থিত হলাম। তার পাশেই ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম। ইবনে তাহের ঘোষণা করলেন, এখানে আপনাদের জমায়েত করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো, আপনারা নিজেরাই পছন্দমতো একজনকে বিচারক হিসেবে নির্বাচন করুন। সেদিন প্রথম নিজের মতামত উপস্থাপন করেন ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর। তিনি বলেন, হে আমাদের আমির, আপনিই বরং একজনকে কাযি হিসেবে নির্বাচন করে দিন। তবে দু-ধরনের ব্যক্তিকে আমরা বিচারকের আসনে দেখতে চাই না। এক. অপরিচিত। দুই. পরনিন্দাকারী, যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে বেড়ায় আর শত্রুতা তৈরি করে।[৪১৫] ঘটনাটি ছিল হিজরি ২১২ সনের। বোঝা যায়, বিচারক নির্বাচনে মিশরের জনগণের মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।

বিচারক নিয়োগে খলিফাগণ সবসময় জ্ঞান, যোগ্যতা ও ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিতেন। যোগ্য হলে বয়স সেখানে কোনো বাধা হতো না। খতিবে বাগদাদি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম যখন বসরার বিচারক

---

৪১৪. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৩২।

৪১৫. আল-কিন্দি, *আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*, পৃ. ৪৩৩।

নিযুক্ত হন তখন তার বয়স মাত্র বিশ বছর বা তার কাছাকাছি। তখন হিজরি ২০২ সন। বসরার অধিবাসীগণ তাকে অপরিপক্ব মনে করে জিজ্ঞেস করল, বিচারকের বয়স কত? উত্তর শুনে তারা তাকে অযোগ্য ও ছোট ভাবলে ইয়াহইয়া বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আততাব ইবনে আসিদ রা.-কে মক্কার বিচারক হিসেবে পাঠান, তখন আততাবের বয়স ছিল আমার চেয়ে কম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামেনের বিচারক হিসেবে পাঠান, তখন মুআয রা.-এর বয়স ছিল আমার চেয়েও কম। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন কাব ইবনে সুরকে বসরার বিচারক হিসেবে পাঠান, তখন তার বয়সও ছিল আমার চেয়ে কম। ইয়াহইয়া এ উত্তরের মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন করেন।[৪১৬]

এবার আসি আন্দালুসে। আন্দালুসের বিচারকগণ মালেকি মাযহাব অনুযায়ী রায় দিতেন। কারণ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার মতো আন্দালুসের বড় ও বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ইমাম মালেক ইবনে আনাসের ছাত্র ছিলেন। আর হিশাম ইবনে আবদুর রহমানের মতো বনু উমাইয়ার শাসকগণও ইমাম মালেক রহ.-কে ভালোবাসতেন এবং তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।[৪১৭]

কিন্তু মামলুক রাজবংশের শাসনামলে ব্যতিক্রমধর্মী একটি উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। তখন চার মাযহাবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হতো শুধু শাফিয়ি মাযহাব অনুসারে। বিশিষ্ট লেখক কালকাশান্দি সমকালীন বিচারব্যবস্থার স্তর বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, ওই সময় দামেশকের মতো সর্বত্রই চার মাযহাবের বিচারকগণ ফয়সালা করতেন। তবে দামেশকে এই পদ্ধতির স্বাক্ষরিক সফল প্রচলন শুরু হওয়ার পরই তা সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। তবে মূল শহরের সকল কার্যালয়ে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদন হতো শাফিয়ি মাযহাব অবলম্বনে। আর পুরো নগরজুড়ে অন্যান্য মাযহাব অনুযায়ী

---

৪১৬. খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১৪. পৃ. ১৯৮-১৯৯।
৪১৭. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

বিচারকাজ সম্পাদিত হতো। মিশর ও দামেশকেও একই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন চলে আসছিল।[৪১৮]

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো কঠিন পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। নতুন বিচারকের যোগ্যতা, দক্ষতা, পরিপক্বতা পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে যাচাই করা হতো সেই পরীক্ষায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, খলিফা নিজেই এ পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। সুলাইমান ইবনে সাদ আল-খুশানি *কুযাতু কুরতুবা* গ্রন্থে প্রধান বিচারপতি হিসেবে আহমাদ ইবনে বাকির নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমিরুল মুমিনিন তাকে এ পদের জন্য নিযুক্ত করেন। এরপর একে একে তাকে জায়েন, এলভিরা, টলেডো অঞ্চলের বিচারক হিসেবে মনোনীত করেন। সব দিক দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। সকল পদ্ধতিতে তাকে যাচাই-বাছাই করেন। সব পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় আমিরুল মুমিনিন তাকে একনিষ্ঠ ও যোগ্য বিচারক হিসেবে বাছাই করেন। এরপর তাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব প্রদান করেন।[৪১৯]

---

৪১৮. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৪, পৃ. ২২৮।

৪১৯. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫. বিচারকদের দায়িত্ব নির্ধারণ

একজন বিচারকের প্রধান দায়িত্ব ছিল, মামলামোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা, বিরোধ নিরসন করা, পাওনা আদায়ে যে লোক টালবাহানা করছে তার কাছ থেকে প্রকৃত মালিকের কাছে সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া। আপন সম্পদের হস্তক্ষেপে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অর্থসম্পদ দেখাশোনা করা, অপরাধীদের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা। তার সাক্ষী ও আমিনদের পর্যবেক্ষণ করা, তার প্রতিনিধিদের নিয়োগ ও বিচারিক কাজে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি।[৪২০]

শুধু তাই নয়, একজন বিচারকের দায়িত্ব এমন আরও অনেক ধর্মীয় বিষয়জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল, বিচারিক কাজের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। শরিয়ত সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় অধিকাংশ সময় বিচারকদেরই জামে মসজিদে নামাযের ইমামতি করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করা, অনুপস্থিত ও হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পদ দেখাশোনা করা, হজের বিষয়গুলো তদারকি করা এবং লোকদের থেকে খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হতো।[৪২১]

জ্ঞানের গভীরতার কারণে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অসামান্য মর্যাদার অধিকারী হওয়ায় অনেক প্রধান বিচারপতি উন্নতি করতে করতে উযিরের পদে অধিষ্ঠিত হন। মনসুর ইবনে আবু আমিরের শাসনামলে আন্দালুসের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনকারী আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ানের জীবনবৃত্তান্তে নাবাহি বলেন, মনসুর ইবনে আবু আমির

---

৪২০. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৫৩-৫৪; ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২১।

৪২১. আবদুল মুনয়িম মাজেদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ৪৮-৪৯।

তাকে প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি উযিরের দায়িত্ব প্রদান করেন। বনু আমিরের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল ছিলেন।[৪২২]

মামলুক রাজবংশের শাসনামলে মিশরে বিচারকের পদটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী। বিচারকাজ সম্পাদনের পাশাপাশি আরও অনেক দায়িত্ব বিচারকদেরকেই সম্পাদন করতে হতো। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে তাজুদ্দিন ইবনে বিনতুল আআয-এর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাসির রহ. লেখেন, তার হাতে একে একে সতেরোটি পদ ছিল। এর মধ্যে ছিল বিচারিক দায়িত্ব, জুমার ইমামতি, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দেখাশোনা, রাষ্ট্রীয় অর্থ তহবিল দেখাশোনা ইত্যাদি।[৪২৩]

ইসলামের স্বর্ণযুগে কাযি বা বিচারকগণ যে অসামান্য সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এসব দায়িত্ব পালন তাদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাজুদ্দিন সুবকির বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথমে প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত হন। এ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি শাফিয়ি মাযহারের ওপর ফিকহের দরস দিতেন, তুলুনের জামে মসজিদে জুমা ও ঈদের নামাযের ইমামতি করতেন, মাদরাসায়ে শাইখুনিয়ায় শিক্ষকতা করতেন, বিচারালয়ে ফতোয়া প্রদান করতেন। তা ছাড়া দামেশকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন। এতসব দায়িত্বের মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে তিনি যা করতেন তা হলো, মিশরে তিনি বিচারকাজ পরিচালনা করতেন এবং সুলতানের অনুমতিক্রমে দামেশকের মাদরাসাগুলোতে প্রতিনিধি হিসেবে কাউকে পাঠাতেন দরস দেওয়ার জন্য।[৪২৪]

---

[৪২২]. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৮৬।
[৪২৩]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১৩, পৃ.৩৮০।
[৪২৪]. শামসুদ্দিন ইবনে তুলুন, *কুযাতু দিমাশক*, পৃ. ১০৪।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৬. বিশেষ বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন

ইসলামি সভ্যতায় বিচারব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত ও সুসংগঠিত। বিশেষ গোষ্ঠী অথবা বিশেষ কোনো মোকদ্দমায় বিশেষ বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হতো। বেসামরিক ও সেনাবাহিনী উভয় গোষ্ঠীর বিচারপ্রক্রিয়া পৃথক রাখার জন্য আব্বাসি শাসনামলে সেনাবাহিনীর জন্য সামরিক আদালত গঠন করে সেজন্য স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগ করা হয়। বোঝা যায়, ইসলামি সভ্যতায় সামরিক আদালত অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। খলিফা হওয়ার পূর্বে আল-মাহদি নিজেই সৈনিকদের মধ্যে ঘটিত বিরোধ ও মামলা নিরসন করতেন। তেমনই খলিফা মামুনের মন্ত্রী হাসান ইবনে সাহল সেনাবিষয়ক বিশেষ বিচার ট্রাইব্যুনাল পরিচালনার জন্য ২০১ হিজরি সনে সাদ ইবনে ইবরাহিমকে নিয়োগ করেন।[৪২৫]

তা ছাড়া ইসলামি বিচারব্যবস্থায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ক্ষেত্রভেদে বাদী-বিবাদীর কল্যাণার্থে অনতিবিলম্বে মামলার নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এর মধ্যে একটি ছিল স্থানীয়দের আগে মুসাফির ব্যক্তিদের মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা। ইমাম শাফিয়ির বরাতে মাওয়ারদি লেখেন, (ইমাম শাফিয়ি বলেন,) আদালতে যদি স্থানীয় ও মুসাফির উভয় প্রকার লোক এসে হাজির হয়, তবে মুসাফিরদের সংখ্যা কম হলে তাদের মামলাগুলো আগে শেষ করতে হবে। বিচারক মুসাফিরদের জন্য আলাদা একটি দিন ধার্য করবেন। তবে স্থানীয়দের যেন কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর যদি মুসাফিরদের সংখ্যা বেশি হয়, যার ফলে স্থানীয় ও মুসাফিররা সংখ্যায় সমান হয় তবে সমতা বিধান করতে হবে যেন উভয় পক্ষের কারও কোনো কষ্ট না হয়। সবারই হক আছে। তবে মুসাফিরদের যেহেতু স্বদেশ ফেরার তাড়া আছে, সে হিসেবে মামলাগুলো বিলম্ব করলে

---

৪২৫. ওয়াকি ইবনে খালাফ, *আখবারুল কুযাতি*, খ. ৩, পৃ. ২৬৯।

তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সংখ্যায় কম হলে মুসাফিরদের মামলাগুলো অবশ্যই আগে শেষ করতে হবে।[৪২৬]

ভিসা বা অনুমতি নিয়ে অন্য ধর্মের মানুষও ইসলামি সাম্রাজ্যে অবাধে বসবাস করতে পারতেন। তাই ইসলামি বিচারবিভাগ তাদের জন্য পৃথক বিচার ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম শাসনামলে স্ব স্ব ধর্মের পাদরি, যাজক, বিশপরাই তাদের মাঝে সংঘটিত মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করতেন। মুসলিম বিচারকগণ সেখানে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতেন না। কারণ ফকিহগণও যিম্মিদের বিচারকাজ যিম্মি বিচারকদের ওপর ন্যস্ত করার বৈধতা দান করেছেন। *সুবহুল আ'শা* গ্রন্থে কালকাশান্দি রহ. যিম্মিদের বিচারব্যবস্থার নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরেন। যাতে বোঝা যায়, যিম্মি বিচারকদের এই বিচারকাজ সম্পাদনের ক্ষমতা খলিফার অনুমতিক্রমেই প্রচলিত ছিল। অপরদিকে আন্দালুসে যেহেতু যিম্মিদের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তাই মুসলিমগণ তাদের জন্য বিশেষ যিম্মি বিচারকের ব্যবস্থা করেন। তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেউ খ্রিষ্টানদের বিচারক, কেউ অনারবদের বিচারক। তবে মুসলিমের সঙ্গে কোনো যিম্মির বিরোধ ঘটলে মুসলিম বিচারকগণই তার মীমাংসা করতেন। তেমনই বিচারকগণ এক খ্রিষ্টানের বিপক্ষে অপর খ্রিষ্টানের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। এক ইহুদির বিপক্ষে অপর ইহুদির সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। তবে মুসলিমের বিরুদ্ধে কোনো বিধর্মীর সাক্ষ্য তারা গ্রহণ করতেন না।[৪২৭]

---

[৪২৬]. মাওয়ারদি, *আদাবুল কাযি*, খ. ২, পৃ. ২৮৪।

[৪২৭]. আবদুল মুনয়িম মাজেদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ৫৩-৫৪।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৭. বিচারব্যবস্থার ওপর নজরদারি

ইসলামি রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি বিচারব্যবস্থাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। বিচারবিভাগকে সকল প্রকার স্বার্থসিদ্ধির ঊর্ধ্বে রাখতে এবং যাবতীয় অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্ত রাখতে শাসকগণ বিচার কার্যক্রমের ওপর কঠোর নজরদারি আরোপ করেছেন। কোনো বিচারক দুর্নীতি, অবিচারের আশ্রয় নিলে তাকে পদচ্যুত করেছেন। বিশিষ্ট লেখক আল-কিন্দি লেখেন, ১০৫ হিজরি সনে ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুনের বিচারিক অঞ্চলে একবার এক এতিমের মামলা সামনে আসে। ওই এতিমের বিষয়টি দেখার জন্য এতিমের গ্রামের একজন নেতাকে তিনি দায়িত্ব প্রদান করেন। এতিম ছেলেটি ওই নেতার প্রতিপালনেই বড় হচ্ছিল। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ওই নেতার বিরুদ্ধে ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুনের কাছে জুলুমের অভিযোগ করেও ন্যায়সম্মত প্রতিকার পায়নি। যার ফলে এতিম ছেলেটি একটি কবিতায় তার অভিযোগ লিখে ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুনের কাছে পাঠায়। কবিতাটি ছিল :

ألا أبـلـغ أبـا حـسـان عني ☆ بأن الحكم ليس على هـواكا

حكمت بباطل لم تـأت حقا ☆ ولم يـسـمـع بحكم مثل ذاكا

وتـزعـم أنـهـا حـق وعـدل ☆ وأزعـم أنـهـا ليـسـت كذاكا

ألـم تـعـلـم بـأن الله حـــق ☆ وأنك حين تحكم قد يـراكا

আবু হাসসান (ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুন)-কে জানিয়ে দাও যে, বিচারব্যবস্থা তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলবে না। আপনি অন্যায় বিচার করেছেন। তাতে ন্যায় বলতে কিছুই ছিল না। এরকম বিচার কখনো হয়েছে বলে লোকমুখে প্রসিদ্ধ নয়। আর আপনি ভাবছেন যে, আপনি সত্য ও সুবিচার করেছেন। আর আমি দেখছি, তা

> একেবারে ন্যায়-বহির্ভূত। আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে মহান আল্লাহ সত্য, আপনি যখন বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করেন তখন তিনি আপনাকে দেখেন?!

কবিতাটি পড়ে ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুন এতিম বালকটিকে কারাবন্দি করেন। শেষ পর্যন্ত এতিমের ইস্যুটি খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের কানে যায়। তিনি বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেন এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুনকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি দেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে রিফাআর কাছে যে পত্রটি তিনি লেখেন তার ভাষা ছিল এই, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত করে ইয়াহইয়াকে পদচ্যুত করার ব্যবস্থা নিন।[৪২৮]

ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অবিচার দমনে শাসকদের এরকম সুউচ্চ মনোবল ও অদম্য ইচ্ছা সমকালীন অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসে একেবারেই বিরল। সাধারণ জনগণ এবং অনাথ শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ইস্যুগুলো শাসক ও খলিফাগণ যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন, অন্য কোনো সভ্যতায় তার নজির পাওয়া যায় না। ইসলামি সভ্যতার যাত্রা এবং মানবতার কল্যাণ সাধনায় তার অবদান কত সুদূরপ্রসারী ছিল এর দ্বারা তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে এ বিভাগেরও উন্নতি ঘটে। একপর্যায়ে বিচারকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো বিশেষভাবে তদন্ত করার জন্য প্রাদেশিক বিচারপতিদের সঙ্গে কাযিউল কুযাতগণ (প্রধান বিচারপতিগণ) যুক্ত হন। ফলে অভিযোগ প্রমাণিত হলে জড়িত বিচারকদের তারা পদচ্যুত করতেন। অন্যথায় স্বপদে বহাল রাখতেন। অনেক সময় বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ষড়যন্ত্রমূলক হতো। *কুযাতু কুরতুবা* গ্রন্থে বর্ণিত আছে, শাসক আল-হাকামের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন বিচারক জিয়ান অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। একবার স্থানীয় লোকজন তার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অবিচারের অভিযোগ দায়ের করে। ফলে শাসক আল-হাকাম ওই বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করতে কর্ডোভার কাযিউল জামাআ (প্রধান বিচারপতি) সাইদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বশিরকে দায়িত্ব দেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পদচ্যুত করার আর

---

৪২৮. আল-কিন্দি, *আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*, পৃ. ৩৪১।

অভিযোগ প্রমাণিত না হলে স্বপদে বহাল রাখার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তদন্ত করে বিচারককে নির্দোষ পান। ফলে তাকে বলে দেন, আপনি আপনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে থাকুন।[৪২৯]

সে সময় আরও একটি স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠা হয়, যা অনেকটা আমাদের বর্তমান সময়ে প্রচলিত সুপ্রিম কোর্টের মতো। ওই আদালতকে বলা হতো খুততাতুর রদ (خطة الرد)। এই আদালতের বিচারকগণ শুধু বিচারব্যবস্থায় দায়িত্বরত বিচারকদের রায়গুলো পর্যবেক্ষণ করতেন ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং সাধারণ বিচারকরা যে ক্ষেত্রে রায় দিতে ব্যর্থ হতেন সে ক্ষেত্রে রায় দিতেন। ওই আদালতের কাজ ছিল বিচারিক রায় ও বিচারকদের পর্যবেক্ষণ করা, স্থানীয় লোকদের গতিবিধি লক্ষ রাখা এবং বিচারক ও জনগণের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজরদারি করা।

এই বিভাগের প্রধানের পদে যারা সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের অন্যতম হলেন আল-হাকাম মুস্তানসিরের (মৃ. ৩৬৬ হি.) শাসনামলে মুহাম্মাদ ইবনে তামলিখ আত-তামিমি এবং আবদুল মালিক ইবনে মুনযির ইবনে সাইদ। উক্ত আদালতের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকের পদবি ছিল সাহিবুর রদ (صاحب الرد)। কারণ সকল অভিযোগ ও সংবিধান তাদের কাছে উত্থাপিত হতো। এই পদটি ছিল প্রধান বিচারপতি থেকে এক স্তর নিচের ও কাছাকাছি পর্যায়ের।[৪৩০]

---

৪২৯. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৫।
৪৩০. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৫।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৮. খলিফা ও শাসকগণও বিচারের আওতাধীন

কোনো সন্দেহ নেই, মানবসভ্যতার ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বরং ইসলামি সভ্যতার যুগে আরও উৎকৃষ্ট ও সমুজ্জ্বলরূপে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ ও সমগ্র বিশ্ব গত দু-শতাব্দী ধরে যে স্বাধীন বিচারবিভাগের সঙ্গে পরিচিত, ইসলাম তা প্রতিষ্ঠা করেছে আরও বারো শতাব্দী পূর্বেই।

একবার আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনে আবু তালিব রা. একটি ঢাল নিয়ে একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধের জের ধরে বিচারকের শরণাপন্ন হন। বিখ্যাত লেখক ইবনে কাসির রহ. সেই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, আলি ইবনে আবু তালিব রা. তার হারিয়ে যাওয়া একটি ঢাল একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তির কাছে খুঁজে পান। এরপর ওই খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে নিয়ে তৎকালীন বিচারক শুরাইহ রা.-এর কাছে গিয়ে বিচার দাবি করে বলেন, এই ঢালটি আমার। ঢালটি তার কাছে পাওয়া গেছে। তার কাছে এটি আমি বিক্রিও করিনি আর তাকে দানও করিনি। তা শুনে শুরাইহ রা. ওই খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে বললেন, আমিরুল মুমিনিন যা বলছেন সে ব্যাপারে তোমার কী মত? উত্তরে খ্রিষ্টান বলল, ঢালটি আমারই। আর আমিরুল মুমিনিনকে মিথ্যুক বলার সাহস আমার নেই। এরপর শুরাইহ রা. আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে? এ কথা শুনে আলি রা. হেসে ওঠেন এবং বলেন, শুরাইহ ঠিক ধরেছে, আমার কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই। এরপর শুরাইহ রা. খ্রিষ্টান ব্যক্তির পক্ষে রায় দিয়ে দেন। ইবনে কাসির রহ. লেখেন, এরপর ঢালটি নিয়ে খ্রিষ্টান লোকটি হেঁটে কিছুদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আজ যে নিরপেক্ষ বিচার-মীমাংসা করা হলো নিঃসন্দেহে এটি নবী-রাসুলদের বিচারব্যবস্থা। কী আশ্চর্য, একজন বিচারক স্বয়ং আমিরুল

মুমিনিনের বিপক্ষে আমার জন্য রায় দিলেন। নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহর শপথ! এই ঢালটি আপনারই হে আমিরুল মুমিনিন।[৪৩১]

খ্রিষ্টান লোকটি বিচারবিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা দেখে, এই ন্যায্য বিচার পেয়ে এবং বিচারক শুরাইহ রা. ও আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর অবস্থান দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়। তার আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, এই সভ্যতা বড় সুন্দর ও অতিশয় মহান। তার বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত ন্যায়সংগত। তাই তো দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই সে চিরদিনের জন্য এই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের ও চিরন্তন সভ্যতায় আশ্রয় নেওয়ার ঘোষণা পাঠ করে।

আব্বাসি শাসনামলে বিচারবিভাগ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। যার ফলে আমরা দেখি, অনেক বিচারক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী খলিফা বা সরকারি উচ্চপদস্থ লোকদের বিরুদ্ধে শক্ত ও কঠিন অবস্থান নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সুষ্ঠু ও ন্যায্য বিচার প্রতিষ্ঠায় তারা কারও হুমকি-ধমকির ও নিন্দাবাক্যের তোয়াক্কা করতেন না। একবার বিখ্যাত প্রতাপশালী আব্বাসি শাসক আবু জাফর মনসুর বসরার বিচারক সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহর কাছে পত্র লেখেন, অমুক জমি নিয়ে একজন সেনাপতি এবং একজন ব্যবসায়ীর মাঝে বিরোধ চলছে, সেই জমিটি আপনি সেনাপতির কাছে হস্তান্তর করুন। উত্তরে সাওয়ার লেখেন, উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, জমিটি ওই ব্যবসায়ীর। তাই কোনো প্রমাণ ছাড়া তার কাছ থেকে আমি জমি নিয়ে সেনাপতিকে দিতে পারব না। প্রত্যুত্তরে বাদশা মনসুর লেখেন, ওই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অবশ্যই আপনি ওই জমিটি সেনাপতির কাছে হস্তান্তর করবেন। এর উত্তরে সাওয়ার লেখেন, ওই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া জমিটি ব্যবসায়ীর হাতছাড়া করব না। এই পত্রটি পড়ে মনসুর বলেন, আল্লাহর

---

৪৩১. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ৫।

শপথ, এই ভূখণ্ডকে আমি ন্যায়বিচার দিয়ে পরিপূর্ণ করেছি। আমার বিচারকগণ সত্য ও ন্যায়ের দিকে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।[৪৩২]

বিচার, সাক্ষ্য ও দাবিদাওয়া প্রমাণের জন্য বিচারকগণ খলিফা ও শাসকদেরকে আদালতে হাজির করতেন। আর খলিফা ও বাদশাগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নিতেন। বিচারকের রায় মাথা পেতে মেনে নিতেন। এর ব্যতিক্রম ঘটনাও আছে। তবে সেগুলো নিতান্তই কম। বিচারবিভাগের রায় মানলে বা আদালতে উপস্থিত হতে অস্বীকার করলে খলিফাদেরকে সিংহাসন থেকে পদচ্যুত করার বা তাদের বিষয়টি জনগণের ওপর ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন বিচারকগণ। তবে সর্বাবস্থায় বিচারকদের রায়কে সম্মান করা হতো। পুরোপুরিভাবে তা কার্যকর করা হতো। জনগণ ও খলিফার মাঝে সংঘটিত যে মামলাগুলোর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো বাদশা আবু জাফর মনসুরের শাসনামলে বাগদাদের বিচারপতি মুহাম্মাদ ইবনে ইমরান আত-তালহির কাছে দায়ের করা কুলিদের মামলা। ঘটনার সারমর্ম হলো, একবার খলিফা আবু জাফর মনসুর কুলিদেরকে শামে পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। প্রচণ্ডরকম কষ্ট ও দুর্ভোগে পড়তে হবে বিধায় খলিফার এই ইচ্ছা কুলিদের মনঃপূত হয়নি। ফলে বিষয়টি তারা কাযি মুহাম্মাদ ইবনে ইমরানের কাছে উত্থাপন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খলিফা মনসুরকে আদালতে ডাকেন। লেখককে বলে দেন, কাঠগড়ায় ডাকার সময় খলিফা না বলে শুধু নাম দিয়ে তাকে সম্বোধন করতে। এরপর খলিফা মনসুর বিচারের মজলিসে উপস্থিত হলে খলিফার সম্মানে আসন ছেড়ে না দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের মতো আচরণ করেন। পরিশেষে তিনি কুলিদের পক্ষে রায় দেন। বিচারপ্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি উঠে গিয়ে মনসুরকে খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন হিসেবে সালাম দেন। তার এই ন্যায়বিচার দেখে মনসুর খুশি হয়ে যান। সুষ্ঠু এই বিচারিক কর্মকাণ্ডের জন্য তার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। সাধুবাদ জানান এবং তাকে দশ হাজার দিনার পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দেন।[৪৩৩]

---

৪৩২. সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ২২৯।

৪৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

বিচারকদের এই বলিষ্ঠ অবস্থানের কারণে খলিফাগণও তাদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। বিচারবিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতেন না। এমনকি বিচারকদের সামনে বিনয়ের সাথে সোজা দণ্ডায়মান হওয়ার যে সাধারণ নিয়ম, তা পালনেও তারা সামান্য ত্রুটি করতেন না। বর্ণিত আছে, খলিফা আল-মাহদি (ইনতেকাল ১৬৯ হি.) একবার কোনো এক মামলায় বিবাদীপক্ষকে সাথে নিয়ে বসরায় বিচারক আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-আনবারির কাছে আসেন। বিচারক খলিফাকে আসতে দেখেও মাথা নিচু করে স্বাভাবিকভাবে নিজ আসনে নীরবে বসে থাকেন। এরপর খলিফা বিচারপ্রার্থীদের আসনে বিবাদী পক্ষের সাথে তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের মতো বসে পড়েন। বিচারপ্রক্রিয়া শেষে কাযি আবদুল্লাহ উঠে গিয়ে খলিফাকে অভিবাদন দেওয়ার সময় খলিফা আল-মাহদি বলেন, আল্লাহর শপথ! আদালতে প্রবেশের সময় আমাকে দেখে যদি আপনি দাঁড়িয়ে যেতেন, তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে পদচ্যুত করতাম। আর বিচার শেষে যদি আপনি আসন ত্যাগ না করতেন, তাহলেও আমি আপনাকে পদচ্যুত করতাম।[৪৩৪]

আব্বাসি শাসনামলে বিচারবিভাগের প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। বিচারব্যবস্থা ছিল সকল স্বার্থসিদ্ধির ঊর্ধ্বে। বিচারবিভাগের কাছে সকল মানুষ ছিল সমান। বাগদাদের বিচারপতি আবু হামিদ আল-ইসফারায়িনি (মৃ. ৪০৬ হি.) একবার আব্বাসি খলিফার কাছে পত্র লেখেন। শরিয়া বিচার ব্যবস্থা কার্যকর করা না হলে এবং বিচারবিভাগের ওপর আস্থা প্রদর্শন না করলে তাকে খলিফার পদ থেকে বিচ্যুত করার হুমকি দেন। শুধু তাই নয়, পত্রে তিনি অনমনীয় ও শক্ত ভাষা প্রয়োগ করে লেখেন,

> জেনে রাখবেন, মহান আল্লাহ আমাকে যে বিচারক বানিয়েছেন সেই পদ থেকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা আপনার নেই। আর আমি ইচ্ছা করলে খোরাসানের উদ্দেশে দু-কথার ছোট পত্র লিখে আপনাকে খিলাফতের পদ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা রাখি।[৪৩৫]

বক্তব্য শুনতে বা সাক্ষ্য প্রদান করতে আমির ও খলিফাদের বিচারালয়ে ডাকা হতো। এটিকে খলিফাগণও বিন্দুমাত্র অসম্মানজনক বা কলঙ্ক মনে

---

৪৩৪. মাওয়ারদি, *আদাবুল কাযি*, খ. ১, পৃ. ২৪৮।

৪৩৫. সুবকি, *তবাকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরা*, খ. ৪, পৃ. ৬৪।

করতেন না। যেমন আব্বাস ইবনে ফিরনাস[৪৩৬] ছিলেন আন্দালুসের বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী। তার হাত ধরে বহু আবিষ্কার সাধন হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, ইতিহাসে তিনিই প্রথম আকাশে উড্ডয়নের প্রয়াস পেয়েছেন। তার এ যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তি তাকে শাসক শ্রেণির সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

এই তাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি, ব্যাপক সুখ্যাতি ও খলিফাদের নিকট সম্মানিত হওয়ার কারণে হিংসুক ও নিন্দুক শ্রেণি তৈরি হয়। জাদু ও ভেলকি চর্চা করে এবং উদ্ভট ও আজব বিষয় নিয়ে সারাদিন ঘরে ও গবেষণার ল্যাবে পড়ে থাকে এ ধরনের অপবাদ আরোপ করতে থাকে তার বিরুদ্ধে। কারণ তিনি ক্যামিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করতেন। ফলে সবসময় তার বাড়ি থেকে এক প্রকার ধোঁয়া উঠতে দেখা যেত।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের জন্য তাকে কর্ডোভার আদালতে ডাকা হয়। তখন খলিফা ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে হাকাম ইবনে হিশাম উমাবি। তাকে বলা হয়, আপনি অনেক উদ্ভট বিষয় নিয়ে পড়ে থাকেন। এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তু সংমিশ্রণ করে অদ্ভুত ও আজগুবি বিষয় আবিষ্কার করেন। এরকম তো আমরা আগে কখনো দেখিনি। এর উত্তরে তিনি বলেন, ধরুন আমি যদি পানির সঙ্গে আটা মিলিয়ে খামিরা তৈরি করি। এরপর আগুনের সাহায্যে ওই খামিরা থেকে রুটি বানাই, তাহলে কি সেটি জাদু হবে? সবাই বলল, না। বরং এই প্রক্রিয়া মহান আল্লাহই মানুষকে শিখিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, বাড়িতে আমি ঠিক এই কাজটিই করে থাকি। এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তু সংমিশ্রণ করে আগুনের সাহায্যে এরকম অনেক বিষয় আবিষ্কার করি, যা মুসলিমদের উপকারে আসবে। তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজে লাগবে।[৪৩৭]

তার এই দাবির যথার্থতা সম্পর্কে আদালত সাক্ষী তলব করলে খলিফা আবদুর রহমান ইবনে হাকাম ইবনে হিশাম নিজেই আদালতে উপস্থিত

---

৪৩৬. আবুল কাসেম আব্বাস ইবনে ফিরনাস : বনু উমাইয়ার শাসনামলের অনারব মুসলিম কবি, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। প্রথম পাথর থেকে কাচ আবিষ্কার করেন ও আকাশে উড্ডয়নের চেষ্টা করেন। এজন্য পালক পরে ও দুটি ডানা যুক্ত করে দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত ওড়েন। এরপর পড়ে গিয়ে পিঠে আঘাত পান। মৃত্যু ২৭৪ হি.। সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৬ , পৃ. ৩৮০-৩৮১; মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ৩ , পৃ. ৩৭৪।

৪৩৭. ইবনে সাইদ আল-মাগরিবি, *আল-মুগরিব ফি হুলাল মাগরিব*, পৃ. ২০৩।

হয়ে তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তিনি এরকম এরকম কাজ করেন (অর্থাৎ যা-কিছুই করেন, সেজন্য তিনি সুনির্দিষ্ট মূলনীতি অনুসরণ করেন)। আমাকে যা জানিয়েছেন, তিনি তাই করেছেন। আমি মনে করি তার কাজগুলো মুসলিমদের উপকারে আসবে। জাদুবিদ্যার সঙ্গে জড়িত কিছু করতে দেখলে সবার আগে আমিই তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করতাম।

রাষ্ট্রের কর্ণধার ও মুসলিম শাসক নিজেই আদালতে হাজির হয়ে ন্যায়ের সাক্ষ্য দিয়েছেন এই বিজ্ঞানীর পক্ষে। আর বিচারকও ইবনে ফিরনাসের পক্ষে রায় দিয়েছেন। সমকালীন ফকিহগণও তার প্রশংসা করে তার কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আরও বেশি করে উপকারী বিষয় আবিষ্কার করে যেন মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করতে পারেন, সে বিষয়ে তাকে নিয়মিত উৎসাহ প্রদান করছেন। এভাবেই সর্বমহলে তার মর্যাদা সুরক্ষিত হয়।

খলিফা, আমির, শাসকশ্রেণির উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের কেউ ভুল ও অন্যায় কিছু করলে বিচারকগণ তাদের আদালতে হাজির হতে বাধ্য করতেন। *কুযাতু কুরতুবা* গ্রন্থে আল-খুশানি লেখেন, একবার বিচারক আমর ইবনে আবদুল্লাহর কাছে কর্ডোভার একজন সাধারণ দুর্বল নাগরিক এসে আমির মুহাম্মাদের একজন প্রভাবশালী আমলার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সরকারি স্তরে ওই আমলার বিরাট প্রভাব ও দাপট ছিল। নগরপতি হওয়ার মনোনয়ন পেয়েছিল। পরে এক সময় সে গভর্নর হয়ে যায়। ওই দুর্বল লোকটি আদালতে এসে মামলা দায়ের করে যে, বিচারক মহোদয়, অমুক ব্যক্তি আমার বাড়ি জবরদখল করেছে। বিচারক বললেন, আপনি জমির কাগজ নিয়ে তার কাছে যান। তা শুনে দুর্বল লোকটি বলল, আমার মতো দুর্বল ও সাধারণ নাগরিক তার কাছে যাবে জমির দলিল দেখাতে?! নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শঙ্কিত। বিচারক বললেন, আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে জমির কাগজ নিয়ে তার কাছে যান। দেখুন কী হয়। এরপর লোকটি বিচারকের নির্দেশমতো দলিলপত্র নিয়ে তার কাছে যায়। কিছুক্ষণ পর লোকটি ফিরে এসে বলল, বিচারক মহোদয়, আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। দূর থেকে তাকে জমির কাগজ দেখিয়ে পালিয়ে এসেছি। বিচারক আমর বললেন, বসুন। সে আসবে এখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই আমলা সদলবলে এসে উপস্থিত হলো। তার সামনে ছিল অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক নিরাপত্তারক্ষী। এরপর তিনি

পা ভাঁজ করে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বিচারক ও মজলিসে বসা সকলকে সালাম দিলেন। এরপর যথারীতি দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতে মসজিদের দেয়ালে টেক্কা দিয়ে দাঁড়ালেন। বিচারক আমর ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, আপনি ওখানে যান। বাদীর মুখোমুখি হয়ে ওই জায়গায় বসুন। উত্তরে ওই আমলা বললেন, বিচারককে আল্লাহ সংশোধন করুন। এটি মসজিদ। মসজিদে তো কোনো কাঠগড়া নেই। এখানে সব জায়গাই সমান। আমর বলেন, আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে বাদীর সামনে গিয়ে বসুন। বিচারককে তার বক্তব্যে অনড় দেখে তিনি দুর্বল লোকটির সামনে বসতে বাধ্য হলেন। এরপর বিচারক দুর্বল লোকটিকেও বললেন আমলার মুখোমুখি হয়ে বসতে। এরপর তিনি দুর্বল লোকটিকে বলেন, এবার আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। তিনি বললেন, আমার বক্তব্য হলো এই লোকটি আমার ঘর জবরদখল করেছেন। এরপর আমলার উদ্দেশে বললেন, এখন আপনি আপনার বক্তব্য তুলে ধরুন। তিনি বললেন, আমার বক্তব্য হলো, আমার মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে জবরদখলের অভিযোগ মানহানির শামিল। তার এ কথা শুনে বিচারক বললেন, এ ধরনের বক্তব্য কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির মুখেই মানায়, আপনার মতো মানুষের জমি জবরদখলে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মুখে নয়। এরপর বিচারক আদালতে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কয়েকজনকে বললেন, আপনারা তার সাথে যান। তার ব্যাপারে খেয়াল রাখুন, যদি লোকটিকে তার ঘর বুঝিয়ে দেয় তাহলে তো সমাধান হলো। তা না হলে তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। আমি নিজে আমিরের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। তার সকল অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির কথা বাদশাকে খুলে বলব। এরপর ওই আমলা পুলিশদের সাথে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পুলিশ ও দুর্বল ব্যক্তিটি ফিরে এলো। দুর্বল লোকটি বিচারককে বলল, আজ আপনি যে বিচার করলেন তার জন্য আপনাকে মহান আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। ওই আমলা আমার বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে। বিচারক বললেন, এবার নিরাপদে বাড়ি ফিরে যান।[৪৩৮]

---

৪৩৮. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৫০-১৫১।

এ ধরনের ন্যায্য বিচারের দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় : এক. অভিযোগ দায়ের করা ব্যক্তিকে আদালতে ডাকা হতো বিভিন্ন নিয়মে এবং বিচারকাজ সম্পাদন করা হতো নানা পদ্ধতিতে। দুই. ইসলামি সভ্যতায় বিচারবিভাগ ছিল স্বাধীন। তার প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তিন. বিচারকের সামনে সবাই ছিল সমান। কে দুর্বল, কে সবল, কে প্রভাবশালী, কে আমলা, কে ধনী, কে গরিব এর কোনো তারতম্য ছিল না। চার. রায় প্রদান ও সিদ্ধান্ত কার্যকর হতো খুব দ্রুত। দুর্বল ওই লোকটির বাড়ি যেদিন জবরদখল করা হয়, ঠিক সেদিনই সে মামলা করে। আর সেদিনই ন্যায্য বিচার পেয়ে সে তার বাড়ি ফিরে পায়।

ইসলামি সভ্যতায় বিচারালয়ের এই অনিন্দ্যসুন্দর বৈশিষ্ট্য ও ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সুমহান এই বিচারব্যবস্থার ছত্রছায়ায় মুসলিম সমাজে ন্যায়, নিষ্ঠা ও ইনসাফের জয়জয়কার ছিল। এই স্বাধীন বিচারবিভাগের অধীনে মুসলিমগণ যে ন্যায়নিষ্ঠা ও সুবিচারের পরিবেশে বসবাস করতেন, ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রায় তা মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

নবম অনুচ্ছেদ

৯.অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ এবং তার উন্নয়ন

খিলাফতের ভূখণ্ডে মানুষের জীবনযাত্রার উপকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচারকার্যক্রমের পাশাপাশি অপরাধ ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ক্রমান্বয়ে এই কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিচারিক পদ হিসেবে এটি আত্মপ্রকাশ করে। এই বিভাগ গঠনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, অনিয়ম, দুর্নীতির করালগ্রাস থেকে সর্বস্তরের মানুষকে মুক্ত রাখা। বিচার কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিচারকগণ এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারতেন না। যার ফলে স্বয়ং খলিফা অথবা তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন গুরুত্বপূর্ণ কেউ এ বিভাগের কার্যক্রম সরাসরি দেখাশোনা করতেন।[৪৩৯]

এই পদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে খালদুন লেখেন, রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন অথবা ন্যায়বিচারের জন্য বিখ্যাত বিচারক শ্রেণি থেকে নির্বাচন করে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হতো, এজন্য তিনি হতেন প্রবল প্রতাপী ও ক্ষমতাসম্পন্ন; যারা উভয় পক্ষের মধ্য হতে অন্যায়-অবিচারকারীকে দমন করতে পারেন। আসামিকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন। সাধারণ বিচারকগণ যা কার্যকর করতে পারেন না, তারা সাহসের সঙ্গে তা কার্যকর করেন। তাদের দৃষ্টি থাকে প্রমাণ ও উভয় পক্ষের বিবৃতির ওপর। তারা নির্ভর করেন বিভিন্ন নিদর্শন ও আলামতের ওপর। অনেক সময় সত্য অনুসন্ধান করতে তারা রায় বিলম্বিত করেন। উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিপূর্ণ সমাধান বা আপস করেন। সাক্ষীদেরকে হলফ করিয়ে থাকেন। আর এসব কাজ বিচারকদের ক্ষমতার উর্ধ্বে।[৪৪০]

বিখ্যাত লেখক মাওয়ারদি বলেন, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মূল দায়িত্ব ছিল ভীতি প্রদর্শন করে অপরাধ ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের

---

৪৩৯. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ৫৪।

৪৪০. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২২।

ন্যায়সম্মত অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করা। ভয় দেখিয়ে বাদী-বিবাদীর মুখ থেকে ঘটনার সত্যতা উদ্‌ঘাটন করা। তবে অপরাধ ও দুর্নীতি দমনকারী হবেন সম্মানিত, প্রচণ্ড প্রতাপশালী। দণ্ড কার্যকরে সক্ষম। প্রভাবশালী। সৎ। লোভ-লালসা থেকে মুক্ত। ধার্মিক। কারণ, অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে সেনাপতিদের মতো প্রভাব ও বিচারকদের মতো সিদ্ধান্তে অনড় উভয় প্রকার যোগ্যতার সমাবেশ ঘটবে তার চরিত্রে। আর প্রচণ্ডরকম প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান হওয়ার ফলে উভয় দিক থেকে দণ্ড বিধান করা তার জন্য সহজ হবে।[৪৪১] এ ছাড়াও এ বিভাগে কর্মরতদের আরও যেসব দায়িত্ব ছিল, জনগণের ওপর আমির ও গভর্নরদের অন্যায় আচরণ পর্যবেক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখা, বিভিন্ন শহর ও নগর থেকে আসা রাজস্ব ও কর গ্রহণের ব্যাপারে আমলারা দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে কি না, বিভিন্ন সরকারি বিভাগে কর্মরত কেরানিগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে কি না, নিরাপত্তাবাহিনী, চাকরিজীবীদের, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা আদায়ে কোনোরকম দুর্নীতি করছে কি না বা কালক্ষেপণ করছে কি না, তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে কি না এগুলো তদন্ত করা। তাদের আরও দায়িত্ব ছিল, অপহৃত বস্তুকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হলে ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, না হয়ে থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সাধ্যের বাইরে থাকায় বা রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় হওয়ায় বা প্রভাবশালী কেউ তাতে জড়িত থাকায় যেসব রায় সাধারণ বিচারকগণ প্রদান করতে পারছেন না, বিশেষ ক্ষমতাবলে সেসব রায় প্রদান করা।[৪৪২]

এখান থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ ছিল অধিক প্রভাবশালী। দ্রুত আইন কার্যকর করতে সক্ষম ও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন। অনেকটা বর্তমান সময়ের সুপ্রিম কোর্ট বা প্রশাসনিক, বিচার ট্রাইব্যুনাল Council of State-এর ক্ষমতার মতো। রায় কার্যকর ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ ও এর দায়িত্বশীল ব্যক্তির ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এর বিচারব্যবস্থা ছিল

---

[৪৪১]. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৬৪।

[৪৪২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

যথার্থ। এ ব্যবস্থা সম্প্রতি অনেক দেশে চালু হলেও ইসলামি সভ্যতায় তা প্রায় বারো শতাব্দী আগে থেকেই চলমান।[৪৪৩]

এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা দরকার। আর তা হলো, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগটি আমাদের বর্তমান সময়ে আরববিশ্বের অনেক দেশে আন্তঃবিভাগীয় প্রশাসনিক বিচার ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা নামে প্রচলিত আছে। মিশরে এ ব্যবস্থার বর্তমান নাম মাজলিসুদ দাওলা (مجلس الدولة–Council of State) আর এই মাজলিসুদ দাওলা (প্রশাসনিক বিচার ট্রাইব্যুনাল) সমগ্র ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে চালু হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। অথচ ফ্রান্সকে আজ সংবিধান ও আইন প্রণয়নের জন্য আদর্শ দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষদিকে ১৭৯৯ সনে প্রণীত সংবিধানের আলোকে প্রাথমিকভাবে তার প্রচলন হয়। আর বর্তমান রূপে এর প্রচলন ঘটে ১৮৭২ সাল থেকে। এর আগে ফরাসি সাম্রাজ্যে রাজসভা নামে একটি বিভাগ চালু ছিল। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইস্যুতে দিক-নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি এই পরিষদের দায়িত্ব ছিল প্রশাসনিক বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা। তবে ফরাসি আইন বিষয়ক ইতিহাসবিদদের বিবৃতি অনুযায়ী ওই বিভাগের কার্যক্রম ছিল লৌকিকতা প্রদর্শন ও ফরাসি গৌরবের প্রকাশ ঘটানোর জন্য, যাকে প্রশাসনিক বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় কখনো দেখা যায়নি। অপরদিকে আমরা যখন উমাইয়া শাসনামলের ইতিহাসে এ কথা পড়ি যে, খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান (মৃ. ৮৬ হি.) অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের বিচার কার্যক্রম পরিচালনার আসনে নিজে বসেছেন, তখন এ কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, আন্তঃবিভাগীয় প্রশাসনিক বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় ইসলামি সভ্যতা সেই তেরো শতাব্দী আগেই সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন করে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। আর ফরাসি বুদ্ধিজীবীগণ তা আবিষ্কার করে বাস্তবায়ন শুরু করেছেন মাত্র এক বা দুই শতক হলো![৪৪৪]

---

৪৪৩. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১২৮।

৪৪৪. মুস্তাফা আল-বারুদি, *আল-ওয়াজিয ফিল-হুকুকিল ইদারিয়্যা*, পৃ. ৫৭-৫৮; যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফি-শারিআতি ওয়াত-তারিখ*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫।

কোনো সন্দেহ নেই, দুর্নীতি ও আন্তঃবিভাগীয় অপরাধ পর্যবেক্ষণ করে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তবে সেটি উমাইয়া শাসনামলের মতো প্রাতিষ্ঠানিকরূপে নয়, বরং স্বভাবগত পদ্ধতিতে। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ওই রকম বড় কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, যার দরুন অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ গঠনের প্রয়োজন ছিল। তবে কিছু কিছু প্রেক্ষাপটে যখন দুর্নীতি চোখে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুধরে দিয়ে কঠোরভাবে উম্মতকে তা থেকে সতর্ক করেছেন। একবার ইবনুল উতবিয়া আযদি রহ. নামক এক সাহাবিকে তিনি বনু সুলাইম গোত্রের সদকা উসুলের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। আবু হামিদ সাইদির বর্ণনায় সে ঘটনার আদ্যোপান্ত উঠে এসেছে। তিনি বলেন, ওই সাহাবি সদকা উসুল করে নিয়ে আসার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হিসাব করে বলল, এই নিন আপনার অর্থ, আর এই হচ্ছে আমার অর্জিত হাদিয়া। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে হাদিয়া পৌঁছে যেত! এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে এমন কোনো কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ শেষ করে এসে বলে, এই হলো তোমাদের মাল আর এ হলো আমাকে দেওয়া হাদিয়া। তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরেই বসে থাকল না, সেখানে এমনিতেই তার কাছে হাদিয়া পৌঁছে যেত! আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায়ভাবে কোনোকিছু গ্রহণ করবে, সে কেয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আমি তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিদের খুব ভালো করেই চিনতে পারব। সে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে উট বহন করে, আর উট আওয়াজ করতে থাকবে। অথবা গাভি বহন করে, আর সেটা হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে। অথবা ছাগল বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে।[৪৪৫]

---

৪৪৫. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৫৩; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৩২।

আল্লাহর রাসুলের ইনতেকালের পর ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যাবতীয় অনিয়ম ও অবিচার দূর করে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি তার প্রথম ভাষণে বলেন,

> হে লোকসকল, আমাকে আপনাদের আমির বানানো হয়েছে। তবে আমি আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নই। আমি ন্যায়ের পক্ষে কাজ করলে আমাকে সহযোগিতা করবেন। অন্যায় কিছু করলে আমাকে শুধরে দেবেন। সততাই বিশ্বস্ততা, মিথ্যাই বিশ্বাসঘাতকতা। আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল, তার হক যথাযথভাবে আদায় করার ব্যাপারে আমার কাছে সেই শক্তিশালী। আর আপনাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, তার কাছ থেকে প্রকৃত অধিকার আদায় করার ব্যাপারে আমার কাছে সে অত্যন্ত দুর্বল।[৪৪৬]

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামল থেকে অপরাধ ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রতিবার হজের মওসুমে বিভিন্ন শহর ও রাজ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত আমির ও গভর্নরদের জমায়েত করে তাদের ব্যাপারে জনগণের অভিযোগ শুনতেন। শাসক ও গভর্নরদের মধ্যে কেউ অন্যায় কিছু করলে তাদের শাস্তি দিতেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গভর্নরদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি করার ব্যাপারে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে তার গৃহীত পদক্ষেপ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে নিম্নবর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে। মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রা.-এর এক পুত্র একবার এক মিশরীয়কে চপোটাঘাত করে, যে দৌড় প্রতিযোগিতায় তাকে হারিয়ে দিয়েছিল। সেই অন্যায়ের বিচার সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, একবার মিশর থেকে এক লোক এসে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি অন্যায় থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। উমর রা. বললেন, তুমি আশ্রয় পেয়ে গেছ। বলো তোমার অভিযোগ। সে বলল, আমি আমর ইবনুল আসের এক পুত্রের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। একপর্যায়ে

---

৪৪৬. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৬, পৃ. ৮৬।

আমি জয়ী হয়ে গেলে সে আমাকে চাবুক দিয়ে পেটায় আর বলতে থাকে, আমি ইবনুল আকরামাইন (দ্বৈত সম্মানের অধিকারীর সন্তান)। এরপর উমর রা. পত্র লেখেন আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে। পত্রে তিনি তার ওই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে খিলাফতের রাজধানী মদিনায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। খলিফার নির্দেশমতো পুত্রকে নিয়ে তিনি দ্রুত মদিনায় চলে আসেন। উমর রা. বললেন, ওই মিশরীয় কোথায়? মিশরীয়কে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন, চাবুক হাতে নাও এবং আমরের পুত্রকে পেটাও। এরপর লোকটি তাকে পেটাতে লাগল। উমর বলতে লাগলেন, পেটাও পেটাও। ইবনুল আকরামাইনকে পেটাও। আনাস বলেন, এরপর লোকটি তাকে বেদম প্রহার করতে থাকে। আল্লাহর শপথ, সে তাকে চাবুক দিয়ে মারতে থাকে। আর আমরাও চাচ্ছিলাম তাকে মারুক (তার দম্ভ চূর্ণ হোক)। একপর্যায়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমরা চাচ্ছিলাম এবার যেন ক্ষান্ত হয়। এরপর উমর রা. ওই মিশরীয়কে বললেন, চাবুকটি তুমি আমর ইবনুল আসের মাথায় রাখো। সে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমাকে প্রহার করেছে তার পুত্র। আর এখন আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমর ইবনুল আস রা.-এর উদ্দেশে উমর রা. বললেন, কখন থেকে তোমরা মানুষকে দাস বানিয়ে ফেলেছ?! অথচ মায়েরা পৃথিবীর বুকে তাদের স্বাধীন করে জন্ম দিয়েছে! আমর রা. উত্তর দিলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, এ ঘটনাটি আমার জানা ছিল না। বিচারের জন্যও সে আমার কাছে আসেনি।[৪৪৭]

অন্য কোনো সভ্যতায় এরকম ঘটনা কিংবা এর কাছাকাছিও কোনো নজির খুঁজতে গেলে আমাদের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হতে হয়। পিতার সামনে পুত্রের ওপর এরকম প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। তাও আবার যেমন তেমন পুত্র নয়, মিশরের শাসকের পুত্র। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার সামনে সকল মানুষ একসমান। ইসলাম জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদে বিশ্বাসী নয়।

উমাইয়া শাসনামলে বিখ্যাত খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এ বিভাগের প্রধান হিসেবে নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেন। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। সেটি হলো, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন

---

৪৪৭. আল-মুত্তাকি হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*, খ. ১২, পৃ. ৬৬০; ইবনুল জাওযি, *মানাকিবু উমার*, পৃ. ৯৯।

বিভাগের প্রধান হতে গেলে তাকে শরিয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। কুরআন-হাদিসের সরাসরি নস থেকে ইজতেহাদ করে নীতিমালা বের করার যোগ্যতা থাকতে হবে। তার মানে এই বিভাগের প্রধানকে হতে হবে বিজ্ঞ ফকিহ ও অভিজ্ঞ আলেম। ইসলামি সভ্যতায় যে-সকল খলিফা এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা সবাই ফিকহ, তার শাখাগত মূলনীতি ও বিধানাবলি সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলেন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে যারা এ বিভাগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নামটি সেই তালিকায় প্রথম সারিতে থাকবে। এই শাসকগণ যথেচ্ছ ফতোয়া প্রদান করতেন না বা ফিকহের মূলনীতির বাইরে গিয়ে কোনো দণ্ড কার্যকর করতেন না।

এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিযের শাসনামলে দুর্নীতি দমন বিভাগে আরও সম্প্রসারণ ঘটে। তার শাসনামলে একবার বসরার গভর্নর আদি ইবনে আরতাত (মৃ. ১০২ হি.) এক লোকের জমি জবরদখল করে। এরপর ওই লোক আদির ব্যাপারে অভিযোগ করতে সোজা উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী দামেশকে চলে আসে। ইবনে আবদুল হাকাম সেই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, একদিন উমর ইবনে আবদুল আযিয ঘর থেকে বের হলেন। এক লোক বাহনে করে তার বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। এরপর বাহনটি বসিয়ে ওই লোক নেমে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, উমর ইবনে আবদুল আযিয কোথায়? উত্তর এলো, তিনি একটু বাড়ির বাইরে গেছেন। এখনই চলে আসবেন। এরপর উমর চলে এলে লোকটি তার কাছে আদি ইবনে আরতাতের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তা শুনে উমর বললেন, আল্লাহর শপথ! তার ওই কালো পাগড়ি দেখেই আমরা ধোঁকা খেয়েছি। আমি তার কাছে ওসিয়ত লিখেছিলাম, যে ব্যক্তি প্রমাণসহ তোমার কাছে আসবে, তার কাছে তুমি তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু সেই ওসিয়ত থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে এবং তোমাকে আমার কাছে আসতে বাধ্য করেছে। এরপর উমর ওই লোকের জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবার তাকে পত্র লেখেন। পরক্ষণে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ পর্যন্ত আসতে আপনার কত খরচ হয়েছে? সে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমার জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপরও আমার পথখরচ জিজ্ঞেস করছেন! ওই

জমিই তো আমার কাছে এক লাখ দিরহামের চেয়ে বেশি মূল্যবান। তখন উমর বললেন, যা আপনার প্রাপ্য ছিল সেটিই আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন বলুন, এখানে আসতে কত খরচ হয়েছে? সে বলল, আমি তো হিসাব করিনি। উমর বললেন, অনুমান করুন। সে বলল, ষাট দিরহামের মতো হবে। এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিয বাইতুল মাল থেকে তাকে ষাট দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেন।[৪৪৮]

এ ঘটনায় আমিরুল মুমিনিনের পদক্ষেপ দেখে অবাক হতে হয়। সাংস্কৃতিক, সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অন্যান্য সব দিক থেকে সমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্রের প্রধান হয়ে সাধারণ একজন নাগরিকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক গভর্নরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। শুধু তাই নয়, বাদীকে রাজধানী দামেশক পর্যন্ত আসতে যে খরচ হয়েছে তাও তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন। এটিই ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্য, এটিই ইসলামের কৃষ্টি। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের যথাযথ অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য পোষণের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ ঘটনা।

হিজরি পঞ্চম শতকে আব্বাসি শাসনামলে অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। এ বিভাগের স্বতন্ত্র কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক আমাদের বর্তমান সময়ের মন্ত্রণালয়ের মতো। এ বিভাগের যে লোকবল ছিল বিখ্যাত লেখক মাওয়ারদি তার বিবরণ খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। তারা হলেন,

এক. বিশেষ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এদের কাজ ছিল ক্ষমতাশালী আসামিদের গ্রেফতার করে তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা। সাহসী ও অভিজ্ঞ সেনাপতিগণ এ দায়িত্ব পালন করতেন। বিচারবিভাগের বিশেষ পুলিশ বাহিনীও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দুই. বিচারক ও জজ। তারা প্রকৃত মালিকের অধিকার প্রমাণের জন্য তদন্ত কাজে নিয়োজিত থাকতেন। অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়িত্বশীলগণ যেসব বিচারিক বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতেন, সেসব বিধান তাদের জানানোই ছিল এদের কাজ।

---

৪৪৮. ইবনে আবদুল হাকাম, *সিরাতু উমার ইবনে আবদুল আযিয*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

তিন. ফকিহ শ্রেণি। যেসব বিষয় দুর্বোধ্য ও জটিল মনে হয় সেগুলো ফকিহদের কাছে পেশ করা হতো। তারাই এগুলোর সুষ্ঠু সমাধান দিতেন।

চার. লেখক শ্রেণি। বাদী-বিবাদীর মাঝে চলমান মামলার ধারা ও পারস্পরিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ করার কাজ করতেন।

পাঁচ. সাক্ষী। যথাযথ অধিকার প্রমাণে সাক্ষ্য প্রদান করা ও বিধান প্রমাণের দায়িত্ব ছিল এই শ্রেণির।

আব্বাসি শাসক ও খলিফাগণও অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হলো, একবার এক লোক আবু জাফর মনসুরের দরবারে এলো। আবু জাফর তখন আপন ভাই আবুল আব্বাস আস-সাফফাহের শাসনামলে আরমেনিয়ায় অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ওই লোকটি বলল, আমার একটি অভিযোগ আছে। অভিযোগটি বলার আগে আমি একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। আবু জাফর বললেন, বলুন। সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি। তিনি সকল সৃষ্টিকে অনেকগুলো স্তরে সৃষ্টি করেছেন। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সবার আগে সে তার মাকেই চেনে। একমাত্র মায়ের কাছেই সবকিছু প্রার্থনা করে। ভয় পেলে দৌড়ে তার মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। এরপর সে পরবর্তী স্তরে পদার্পণ করে। তখন সে বুঝতে পারে মায়ের চেয়ে পিতার ক্ষমতা বেশি। তখন বিপদে পড়লে সে তার বাবার কাছে আশ্রয় নেয়। এরপর সে বড় হয়। পরিণত বয়সে পৌঁছে। তখন কোনো সমস্যায় জর্জরিত হলে সে বাদশার কাছে অভিযোগ করে। কেউ তার প্রতি অবিচার করলে বাদশার মাধ্যমে তার বিচার প্রার্থনা করে। তবে বাদশা নিজেই যদি তার প্রতি অন্যায় করে, তখন একমাত্র প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাওয়া বা রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। আমার বেলায় ঠিক সেরকমটিই ঘটেছে। ইবনে নাহিক তার এলাকায় অবস্থিত আমার একটি জমির ব্যাপারে আমার প্রতি অবিচার করেছে। এখন আপনিই এর বিচার করুন। হৃত ভূসম্পত্তি আমাকে ফিরিয়ে দিন। তা না হলে মহান আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না। এবার আপনার ইচ্ছা, চাইলে বিষয়টি তদন্ত করতে

পারেন অথবা খারিজ করতে পারেন। তার কথা শুনে আবু জাফর বিচলিত হয়ে বলেন, তোমার অভিযোগটি আবার বলো। এরপর দ্বিতীয়বার অভিযোগটি পেশ করার পর আবু জাফর বললেন, প্রথম পদক্ষেপ হলো, সবার আগে ইবনে নাহিককে আমি রাজপ্রহরী প্রধানের পদ থেকে বিচ্যুত করছি। এরপর ইবনে নাহিককে ওই লোকের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৪৪৯]

সে সময় জনগণের জন্য শাসকের কাছে গিয়ে স্বয়ং শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার অধিকার ছিল। এটি ছিল ইসলামি সভ্যতার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুমহান দৃষ্টান্ত। মিসওয়ার ইবনে মিসাওয়ার নামক এক ব্যক্তি বলেন, একবার খলিফা আল-মাহদির একজন উকিল অন্যায়ভাবে আমার জমি দখল করে নেয়। এরপর সে বিষয়ে প্রতিকার চাইতে আমি তখনকার অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধান সাল্লামের কাছে অভিযোগ দায়ের করি এবং তাকে ছোট্ট একটি চিরকুট প্রদান করি। চিরকুটটি তিনি খলিফা আল-মাহদির কাছে পৌছান। সেই মুহূর্তে তার কাছে আপন চাচা আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ এবং বিচারক আল-আফিয়াত উপস্থিত ছিলেন। চিরকুট পড়ে আল-মাহদি বললেন, তাকে এখানে নিয়ে এসো। এরপর আমি রাজদরবারে উপস্থিত হলে আল-মাহদি আমাকে বললেন, কী হয়েছে বলুন! আমি বললাম, আপনি আমার প্রতি অন্যায় করেছেন। তিনি বললেন, এখানে দুজন বিচারক উপস্থিত আছেন (অর্থাৎ আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ এবং আফিয়াত আল-কাযি)। বিচারক হিসেবে এ দুজনকে আপনার পছন্দ হয়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আসুন। এরপর কাছে গিয়ে আমি রাজগালিচার ওপর বসি। তিনি বললেন, এবার আপনার অভিযোগ বলুন। আমি বললাম, আল্লাহ বিচারককে বিবাদ মেটানোর তাওফিক দিন। আমার অভিযোগ হলো, তিনি আমার ভূসম্পত্তির ব্যাপারে আমার প্রতি অবিচার করেছেন। বিচারক বললেন, আপনার মতামত বলুন হে আমিরুল মুমিনিন। তিনি বললেন, আমার অধিকারে যা আছে তা আমারই সম্পত্তি। আমি বললাম, আল্লাহ বিচারককে বিবাদ মেটানোর তাওফিক দিন! আপনি খলিফাকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি খলিফা হওয়ার আগে থেকেই এই জমির মালিক

---

৪৪৯. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৩২, পৃ. ৩৯২।

ছিলেন, নাকি খলিফা হওয়ার পর? এরপর বিচারক খলিফাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, খলিফা হওয়ার পর মালিক হয়েছি। তখন বিচারক বললেন, এই জমি আপনি তাকে দিয়ে দিন। খলিফা বললেন, ঠিক আছে দিয়ে দিলাম। এরপর বিচারক আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আমিরুল মুমিনিন, এই মুহূর্তটি আমার কাছে বিশ লাখ দিরহামের চেয়েও বেশি মূল্যবান![৪৫০]

ইসলামি সভ্যতা রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। বিচার প্রয়োগের বেলায় ইসলামি শরিয়া ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করেনি যেমনটা করেছিল সমকালীন রোমান ও পারস্যসভ্যতা। অথচ ইসলামপূর্ব আরব সমাজেও সেই বর্ণবৈষম্য প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইসলামি সভ্যতা আসার পর সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এমনকি স্বয়ং খলিফাও বিচারব্যবস্থার একজন সাধারণ নাগরিক বিবেচিত হতেন। আর যারা দণ্ড কার্যকরের দায়িত্ব পালন করতেন, তারাও ছিলেন সাধারণ মুসলিম, যারা হয়তো বড় কোনো গোত্রের বা পদের অধিকারী ছিলেন না। ইসলামি সভ্যতা কত উঁচু, কত মহান, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কত সফল, এর দ্বারা সেটিই প্রমাণ হয়। আরও প্রতীয়মান হয়, ইসলামি সভ্যতা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের যথাযথ মর্যাদা দিতে সমর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আমরা দেখতে পাই, অনেক খলিফা অসুস্থ মায়ের সেবা-শুশ্রূষার চেয়ে অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্ণিত আছে, খলিফা আল-হাদি (মৃ. ১৭০ হি.) একদিন তার অসুস্থ মা খিযরানকে দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহনে চড়লেন। ঠিক সে সময় উমর ইবনে বাযি এসে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনার কাছে এমন একটি বিষয় পেশ করছি যার সেবা করা আপনার জন্য আরও বেশি দরকার। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কোনটি? তিনি বললেন, দুর্নীতি দমন বিভাগের কার্যক্রম। তিন দিন হলো আপনি সেই বিভাগের কোনো মামলা দেখেননি। এরপর তিনি পদাতিক বাহিনীকে বললেন, ওই বিভাগের কার্যালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করো। আর

---

৪৫০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৫৮৬।

মা খিযরানের কাছে একজন সেবককে পাঠিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি বলে দিলেন, মাকে গিয়ে বলবে, আপনার কাছে আসার উদ্দেশ্যে বাহনে চেপেছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে উমর ইবনে বাযি এসে এমন বিষয় উত্থাপন করল, যা সমাধান করা আপনাকে দেখতে আসার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজ আমরা সেই কাজ পূর্ণ করতে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা আপনাকে দেখতে আসছি।[৪৫১]

আব্বাসি খলিফা আল-মামুন সপ্তাহের প্রতি রোববার এ বিভাগের অধীনে দুর্নীতির মামলার তদন্তে বসতেন। একদিন তিনি মামলার অভিযোগ শোনার জন্য বসেছিলেন, এমন সময় জীর্ণ কাপড় পরিহিত এক নারী এসে কবিতার ভাষায় তার অনুযোগ পেশ করল,

يا خير منتصف يهدى له الرشد ☆ ويـا إماما بـه قد أشرق البلد

تشكو إليك عميد الملك أرملة ☆ عدا عليها فما تقوى به أسد

فابتز منهـا ضيـاعا بعد منعتها ☆ لما تفرق عنهـا الأهل والـولد

যার সারমর্ম হলো,

> হে ন্যায়ের ঝাণ্ডাবাহী, শ্রেষ্ঠ সুবিচারক; হে দিগ্বিজয়ী শাসক, হে রাষ্ট্রের কর্ণধার, স্বামীহারা একজন নারী আপনার কাছে অনুযোগ করছে। এক ব্যক্তি তার প্রতি অবিচার করেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা তার নেই। ওই নারীর পরিবার ও সন্তান যখন আলাদা হয়ে গেছে, তখন একাধিকবার নিষেধ করার পরও হুমকি-ধমকি দিয়ে ওই লোকটি তার জমি ছিনিয়ে নিয়েছে।

কবিতা শুনে খলিফা মামুন মাথা নিচু করে ফেললেন। একটু পর মাথা উঁচিয়ে বললেন,

من دون مـا قلت عيل الـصبر والجلد ☆ وأقـرح القلب هـذا الحزن والكمد

هـذا أوان صـلاة الـظهـر فـانصـرفي ☆ وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد

المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا ☆ أنصفك منـه وإلا المـجلس الأحـد

---

৪৫১. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৬১০।

আপনার অভিযোগ শুনে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন যোহরের নামাযের সময়। আপনি ফিরে যান। যেদিন আমি বলি সেদিন বিবাদীকে নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হবেন। শনিবারের মজলিসে যদি সব মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায়, তাহলে আপনার বিষয়টি দেখব। অন্যথায় রোববারের মজলিসে এ বিষয়টি মীমাংসা করব।

এরপর ওই নারী চলে গেল। রোববার দিন সে সবার আগে চলে এলো। তাকে দেখে খলিফা আল-মামুন বললেন, বিবাদী কে? সে বলল, আপনার পাশে দাঁড়ানো আমিরুল মুমিনিনের পুত্র আব্বাস। এরপর খলিফা বিচারক ইয়াহইয়া ইবনে আকসামকে ডেকে বললেন, ওই নারীর সঙ্গে বসে মামলার নিষ্পত্তি করুন। এরপর খলিফার উপস্থিতিতে উভয়ের মাঝে বিচার সম্পাদনের একপর্যায়ে ওই নারী উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে শুরু করলে রাজপ্রহরীগণ তাকে ধমক দেওয়ার চেষ্টা করল। তাদের দেখে খলিফা মামুন বললেন, তাকে হক কথা বলতে দাও। মিথ্যা আজ পরাভূত হবে। এরপর তিনি ওই নারীর হৃত ভূসম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বললেন। এখানে খলিফা নিজে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বিচার নিষ্পত্তির ভার তুলে দিয়েছেন বিচারকের হাতে। এর দুটি কারণ হতে পারে। এক. এখানে বিচার সম্পাদন হচ্ছে নিজ পুত্রের। রায় তার পক্ষেও যেতে পারে আবার বিপক্ষেও। তবে খলিফা নিজে তার পুত্রের বিপক্ষে রায় প্রদান বৈধ হলে পক্ষে রায় প্রদান করলে সেটিতে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার আভাস পাওয়া যায়। আর পুত্রের বিপক্ষে রায় প্রদান বৈধ হলেও পক্ষে রায় প্রদান বৈধ নয়। দুই. এখানে বাদী যেহেতু একজন নারী, তাই খলিফা তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এড়িয়ে যেতে চাইলেন এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে বেশি মনোযোগ দিলেন।[৪৫২]

অবিচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গভর্নরদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার লক্ষ্যে খলিফা মনসুর যখনই কোনো কমকর্তাকে পদচ্যুত করতেন, তার সমুদয় অর্থ ও পাওনা বাইতুল মালে হস্তান্তর করতেন। এটির নাম দিতেন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের অর্থ তহবিল। এরপর

---

৪৫২. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

ওই অর্থের ওপর তার নামও লিখে দিতেন।[৪৫৩] তবে এই প্রক্রিয়া খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল কেবল গভর্নরদের ভয়ে রাখা এবং তাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। এ কারণেই খলিফা মনসুর শেষদিকে পুত্র আল-মাহদিকে ওসিয়ত করে যান, আমি তোমার জন্য একটি তালিক প্রস্তুত করেছি। যাদের অর্থ আমি বাইতুল মালে জমা করেছি, আমার মৃত্যুর পর তাদের সে অর্থ তুমি ফিরিয়ে দিয়ো। তাহলে তাদের কাছে এবং জনসাধারণের সামনে তোমার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। পিতার ওসিয়ত অনুযায়ী আল-মাহদি তাই করেন।[৪৫৪]

অপরদিকে আন্দালুসে এ বিভাগের পরিচিতি ঘটে خطة المظالم (দুর্নীতি দমন কমিশন) নামে। যা আন্দালুসে উমাইয়া শাসনামলের একেবারে গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সে বিভাগের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও পরিধি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় খিলাফত আমলের চতুর্থ শতাব্দীতে।

মরক্কো এবং আন্দালুসে এ বিভাগের ব্যতিক্রমধর্মী উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। যা প্রাচ্যের উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে অনেকটা ভিন্নরকম ছিল। কারণ সে বিভাগের পদটি ছিল প্রধান বিচারপতির পদের অব্যবহিত পরেই। প্রাচ্যে যাকে কাযিউল কুযাত বলা হতো। আর মরক্কো এবং আন্দালুসে কোনো আমির বা খলিফা এই পদের জন্য নির্বাচিত হননি। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এ কারণেই সেখানে এ পদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্তদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম ও ফকিহ শ্রেণির। আফ্রিকায় এ পদে নিয়োজিত সবচেয়ে বিখ্যাত বিচারক ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (মৃ. ৩৯৮ হি.)। যার ব্যাপারে ইবনে ইযারির মূল্যায়ন, দুর্বৃত্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জন্য তিনি ছিলেন ত্রাস। যত ক্ষমতাবান ও প্রতাপীই হোক, ধরে ধরে তাদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতেন। প্রহার করতেন। হত্যা করতেন। হাত বা পা কেটে দিতেন। এ ব্যাপারে কারও হুমকি-ধমকির তোয়াক্কা করতেন না তিনি।[৪৫৫]

আন্দালুসে যারা এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের অনেকের সুনাম ও সুখ্যাতি সরকারি-বেসরকারি সব মহলে বিপুলভাবে ছড়িয়ে

---

[৪৫৩]. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ২২৪।

[৪৫৪]. প্রাগুক্ত।

[৪৫৫]. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, পৃ. ১১২।

পড়ে। তাদের অনেকে আবার রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন প্রশাসনিক পদে উন্নীত হন। আবু মুতাররিফ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসা ইবনে ফাতিস অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়িত্ব পান আল-মনসুর মুহাম্মাদ ইবনে আবু আমিরের শাসনামলে। তার নীতি ছিল খুবই কঠোর। সংকল্প ছিল অদম্য। দুর্বৃত্তি ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত লোকেরা তাকে মারাত্মকভাবে ভয় করত। উযিরদের সঙ্গেও তিনি মতামত শেয়ার করতেন। শেষ পর্যন্ত উন্নতি করতে করতে কর্ডোভার বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হন। সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভাগের দায়িত্বও ছিল তার কাঁধে। আন্দালুসে এর আগে খুব কম ব্যক্তিই এরকম বহু প্রতিভা ও একাধিক পদের অধিকারী হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৪৫৬]

খলিফাদের অনুকরণে অনেক প্রাদেশিক গভর্নরও দুর্নীতি দমন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মিশরের বিখ্যাত ইখশিদি শাসক আবুল মিসক আল-কাফুর সপ্তাহের প্রতি শনিবার এ বিভাগের বিচার-মীমাংসার জন্য বসতেন। আমৃত্যু তিনি এ রীতির ওপর অটল ছিলেন।[৪৫৭] তেমনই সেলজুক শাসকগণও একই রীতি অবলম্বন করেন। আমির তুঘরিল বেগ সপ্তাহের দুই দিন এ বিভাগের বিচার কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য নির্দিষ্ট করেন। সকল সেলজুক আমির নিজ নিজ রাজ্যে একই রীতির প্রচলন করেন।[৪৫৮] আইয়ুবি সাম্রাজ্যের সুলতান আল-আযিয প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এ বিভাগের কার্যক্রম দেখাশোনা করতেন।[৪৫৯] মরক্কোর সাদি সাম্রাজ্যেও (৯৬১-১০৬৯ হি.) একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। সুলতান আহমাদ আল-মনসুর (মৃ. ১০১১ হি.) এ বিভাগের কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দেন 'আদ-দিওয়ান'। প্রতি বুধবার সেই দিওয়ান-সভা বসত এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সেখানে পরামর্শ হতো। যারা অন্য সময় সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে পারত না, এ দিন তারাও সুলতানের কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করার সুযোগ পেত।[৪৬০]

---

[৪৫৬]. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৮৬।

[৪৫৭]. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৩১৫।

[৪৫৮]. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮২।

[৪৫৯]. মাকরিযি, *আস-সুলুক*, খ. ১, পৃ. ২৪৭।

[৪৬০]. নাসিরি, *আল-ইসতিকসা লি-আখবারিল মাগরিবিল আকসা*, খ. ৫, পৃ. ১৮৮।

মামলুকি শাসকগণও দুর্নীতি দমন বিভাগকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে সেই বিভাগ পরিচালনার জন্য বিশিষ্ট বিচারক ও বিখ্যাত ফকিহদের দায়িত্ব প্রদান করেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও তাতে হস্তক্ষেপ করতেন। ৬৬১ হিজরির ঘটনাসমগ্র বর্ণনা করতে গিয়ে মাকরিযি লেখেন, আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী দুই ব্যক্তি মিশরের সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স আল-বুন্দুকদারির (মৃ. ৬৭৬ হি.) দরবারে এলো। তাদের একজনের নাম ছিল ইবনুল বাওরি আর দ্বিতীয়জনের নাম মুকাররম ইবনে যাইয়াত। তাদের সঙ্গে কিছু কাগজ ও নথি ছিল। তাতে আত্মসাৎকৃত অর্থ উদ্ধারের বিবরণ উল্লেখ ছিল। সুলতান মঙ্গলবার তার ষষ্ঠ যুবরাজ, সহযোগী, বিচারকবৃন্দ ও ফকিহদের ডাকলেন এবং তাদের সামনে সেই নথি পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। এরপর নথি পড়া শুরু হলো। দুর্নীতির বিবরণ পড়ার সময় তা এড়িয়ে যেতে লাগলেন এবং জড়িতদের নির্দোষ আখ্যায়িত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত নথি পাঠ সমাপ্ত হলে সুলতান বললেন, মনে রাখবেন, নিশ্চয় আমি একমাত্র আল্লাহর জন্য ছয় লাখ দিনার অনুমোদন করেছি যা বিভিন্ন ব্যবহৃত বস্তু সংরক্ষণ ও সংশোধনের কাজে ব্যয় হয়েছে। পথিক, দাস, দাসিনী ও খেজুরবৃক্ষ প্রতিপালনের কাজে খরচ হয়েছে। ফলে মহান আল্লাহ এর চেয়ে বেশি অর্থ হালাল উপায়ে আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি সকল বিভাগ থেকে অর্থের সুষ্ঠু ব্যয়ের হিসাব চেয়েছিলাম আর তা দুর্নীতির সকল অর্থ বাদ দিয়েও অনেক বেশি হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কিছু বর্জন করবে, মহান আল্লাহ এর চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে তার বিনিময় দেবেন। সুলতান এরপর ইবনুল বাওরিকে সেই নথি প্রচার করার নির্দেশ দিলেন।[৪৬১]

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতান রাজ্যের সকল বিভাগ ও মন্ত্রণালয় থেকে হিসাব গ্রহণ করতেন। মন্ত্রী, আমলা, বিচারবিভাগ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তেমনই জনগণের অর্থসম্পদ নষ্ট করার ব্যাপারে ফকিহগণও তাদের কাছে কৈফিয়ত চাইতেন। বারবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। সুলতান বিষয়টি নিজের অধিকারে নয় প্রমাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছেড়ে দেন। এর পেছনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনগণের অর্থের সুরক্ষা ও

---

৪৬১. মাকরিযি, *আস-সুলুক*, খ. ১, পৃ. ৫৬০।

সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। বরং যে দুই ব্যক্তি এ নথিপত্র নিয়ে আসেন তাদের একজনকে সুলতান পদচ্যুত করেন। তার ব্যাপারটি প্রচার করার জন্য এবং পুরো কায়রো শহরে তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য সুলতান নির্দেশ প্রদান করেন। কারণ সুলতান তখন পর্যন্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত জানতেন না।

জনগণের অর্থের ব্যাপারে অভিযোগ ও বিচার কার্যক্রম দেখাশোনা করতে মামলুকি সুলতানদের অনেকে সরকারি ক্ষেত্রগুলোতে চলে যেতেন। এমনই একজন ছিলেন সুলতান সাইফুদ্দিন বারকুক (মৃ. ৮০১ হি.)। ৭৯২ হিজরির ঘটনাসমগ্র বর্ণনা করতে গিয়ে মাকরিযি লেখেন, সুলতান বারকুক যথারীতি দুর্গের বাইরে এসে দুর্নীতির মামলা ও অভিযোগ শোনার জন্য জনগণের সামনে বসতেন। মানুষও তার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। প্রচুর পরিমাণ অভিযোগ নিয়ে আসত। যার ফলে বড় বড় সরকারি মন্ত্রী-আমলাগণ সবসময় তটস্থ থাকতেন। কার বিরুদ্ধে কখন অভিযোগ চলে আসে সেজন্য সবাই সাবধান থাকতেন।[৪৬২]

ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে খলিফা ও শাসকদের এ মহান উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার দ্বারা এটিই প্রমাণ হয় যে, রাজ্যের কোনো মানুষই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। ভুল করলে এর শাস্তি তাকে পেতেই হবে, তা সে যত ক্ষমতার অধিকারীই হোক। এ ব্যাপারে কে আমির, কে সাধারণ নাগরিক, কে ধনি, কে গরিব এর কোনো তারতম্য ছিল না। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো মানুষই বিচারের আওতার বাইরে নয়, এমনকি আমির, গভর্নর, সেনাপতি, উযির, মন্ত্রী এবং রাজ্যের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গও বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন। ইসলামি সভ্যতা কত মহান, কত ন্যায়পরায়ণ এ ঘটনাগুলোর দ্বারা তারই প্রমাণ মিলে। পারসিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, এমনকি বর্তমান সময়ের আন্তর্জাতিক আদালতও ইসলামি সভ্যতার সমপর্যায়ের হওয়া তো দূরের কথা, ধারেকাছেও আসতে পারেনি। কারণ, জালিম যত বড় ও প্রতাপশালীই হোক, ইসলাম তার ওপর যথাযথ দণ্ড প্রয়োগ করে সবার জন্য তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। আজকের সভ্য (!) পৃথিবীতে এরকম নজির দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

[৪৬২]. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮৬।

এরপরও আমরা বলব, ইসলামি সভ্যতায় বিচারব্যবস্থা যেরকম স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করত, তার বিশদ বিবরণ সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এটি নিতান্তই দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু যেসব ঘটনা ও পদক্ষেপের বিবরণ আমরা এ কয়েক পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি, তার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি সভ্যতাই বিচার সংক্রান্ত আধুনিক বিধিবিধান ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার এমন সব সংবিধান ও নিয়মকানুন আবিষ্কার করেছে, যেগুলো বর্তমান সময়ের সংবিধান প্রণয়নকারী সংগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সংস্থার জন্য উত্তম আদর্শ ও প্রধান ভিত্তি ছিল এবং দেশ পরিচালনার পথে সরল ও সুন্দর পদ্ধতি ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ[৪৬৩]

স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা বিভাগ

ইসলামি সভ্যতা মানুষের শারীরিক ও আত্মিক প্রয়োজনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছে, শরীরের যত্ন ও সুস্থতায় গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং একে একটি আবশ্যিক উদ্দেশ্য বলে স্থির করেছে। এটি ইসলামি সভ্যতার একটি মৌলিক ও অনুপম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুখময় ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে চেয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্য হবে সবল ও সুঠাম এবং আত্মা হবে আলোকিত ও জ্যোতির্ময়। ইসলামি সভ্যতার রূপকার মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

«إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»

নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার শরীরের হক রয়েছে।[৪৬৪]

রোগ-ব্যাধির জন্ম ও প্রাদুর্ভাব যাতে না ঘটে তার জন্য ইসলাম সুরক্ষাব্যবস্থা দিয়েছে। রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ হলে পর্যাপ্ত চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ করেছে। এসব বিষয়ে আমরা জেনেছি। আমরা আরও জানব যে, স্বাস্থ্যসেবার ময়দানে ইসলামি সভ্যতার ভিত কতটা শক্তিশালী। এই সভ্যতা থেকে শিক্ষা নিয়েই গোটা বিশ্ব হাসপাতাল, চিকিৎসা-সংস্থা ও স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ইসলামি সভ্যতায় যে-সকল চিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটেছে, বিজ্ঞানে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে

---

৪৬৩. এই পরিচ্ছেদ থেকে বইটির শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন আবদুস সাত্তার আইনী সাহেব।

৪৬৪. *বুখারি*, কিতাব : আস-সাওম, বাব : হাক্কুল জিসমি ফিস-সাওমি, হাদিস নং ১৮৭৪; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সিয়াম, বাব : আন-নাহ্য়ু আন সাওমিদ দাহ্রি লিমান তাদাররা বিহি, হাদিস নং ১১৫৯।

তাদের অবদানের জন্য গোটা মানবসমাজ এখনো গর্ব করে চলেছে।[৪৬৫]

ইসলামি সভ্যতায় স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলো স্বাস্থ্যসেবায়, রোগীদের সেবা-শুশ্রূষায়, বিশেষ করে দরিদ্র ও নিঃসহায় রোগীদের যত্ন ও সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ-সংস্থাগুলো স্বাস্থ্য-সেবাকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। বিশেষায়িত স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ প্রচুর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান রোগীদের চিকিৎসায়, তাদের আপ্যায়নে ও যত্ন-আত্তিতে সার্বক্ষণিক সেবা দিয়েছে। যারা হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিয়েছে বা যাদের অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। এভাবে হাসপাতালগুলো গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। ইসলামি বিশ্বের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এসব হাসপাতাল। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা ছিল হাসপাতালগুলো। রোগীরা এগুলোতে চিকিৎসা ও পরিপূর্ণ সেবাযত্নের পাশাপাশি পেত উন্নতমানের খাবার ও পোশাক। অনেক হাসপাতাল চিকিৎসা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবার পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা পালন করেছে। এগুলোতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য-সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামি সভ্যতার আরেকটি মানবিক দিক পরিস্ফুট করেছে।

পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদ থেকে আমরা এ-ব্যাপারে জানব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতাল

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অসুস্থের সেবা ও মানবিক বন্ধন

---

৪৬৫. ড. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০৭।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতাল

বিশ্বসভ্যতায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান হলো বিশ্বের প্রথমবারের মতো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। তারা বরং অন্যান্য জাতি থেকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নয়শ বছরেরও বেশি সময় এগিয়ে রয়েছে!

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে প্রথম ইসলামি হাসপাতাল নির্মিত হয়।[৪৬৬] তার শাসনকাল ছিল ৮৬ হি./৭০৫ খ্রি. থেকে ৯৬ হি./৭১৫ খ্রি. পর্যন্ত। এই হাসপাতাল ছিল কুষ্ঠরোগের জন্য বিশেষায়িত। এটির পরপরই ইসলামি বিশ্বে বেশ কয়েকটি হাসপাতাল নির্মিত হয়। এগুলোর কোনো-কোনোটি অত্যন্ত অগ্রগতি লাভ করে। এ হাসপাতালগুলো চিকিৎসা ও জ্ঞানের দুর্গ বলে বিবেচিত হতো। এগুলোই বিশ্বের প্রথম মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইসলামি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নয়শ বছরেরও বেশি সময় পরে প্যারিসে প্রথম ইউরোপীয় হাসপাতাল তৈরি করা হয়!

ইসলামি বিশ্বে হাসপাতালগুলো বিমারিস্তান অর্থাৎ রোগী সেবাকেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। স্থায়ী হাসপাতাল যেমন ছিল, তেমনই ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালও ছিল। স্থায়ী হাসপাতাল বলতে বোঝাচ্ছে যেগুলো শহরে ও নগরে নির্মিত হয়েছিল। মুসলিম নগরী খুব কমই ছিল যেখানে হাসপাতাল নির্মিত হয়নি। এমনকি ছোট ছোট শহরেও হাসপাতাল ছিল। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল হলো যেগুলো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, মরুভূমিতে ও পাহাড়ি এলাকায় ঘুরে বেড়াত।

ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল একদল উটের ওপর বহন করে নিয়ে যাওয়া হতো। উটের সংখ্যা কখনো কখনো পৌঁছত চল্লিশে। এগুলো সুলতান মাহমুদ আস-সালজুকির শাসনামলের ঘটনা। তার শাসনকাল ছিল ৫১১

---

৪৬৬. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ২৯।

হি./১১১৭ খ্রি. থেকে ৫২৫ হি./১১৩১ খ্রি. পর্যন্ত। ভ্রাম্যমাণ কাফেলাগুলোর সঙ্গে থাকত পর্যাপ্ত চিকিৎসা-সরঞ্জাম ও ওষুধপত্র। কয়েকজন চিকিৎসক থাকতেন তাদের সঙ্গে। মুসলিম উম্মাহর সকলের নাগালে পৌঁছে যেত এসব চিকিৎসা-কাফেলা।[৪৬৭]

বড় শহরগুলোতে স্থায়ী হাসপাতাল সংখ্যায় ও গুণেমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল বাগদাদের আল-আদুদি হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠাকাল ৩৭১ হি./৯৮১ খ্রি.; দামেশকের আন-নুরি হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠাকাল ৫৪৯ হি./১১৫৪ খ্রি.; কায়রোর আল-মানসুরি বড় হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠাকাল ৬৮৩ হি./১২৮৪ খ্রি.। কেবল কর্ডোভাতেই পঞ্চাশটির বেশি হাসপাতাল ছিল।[৪৬৮]

বিশেষায়ণের বিবেচনায় এসব বিশাল বিশাল হাসপাতালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। কিছু বিভাগ ছিল দেহের অভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসার জন্য, শল্যচিকিৎসার জন্য ছিল কিছু বিভাগ। চর্মরোগের জন্য যেমন আলাদা বিভাগ ছিল, তেমনই চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্যও ছিল ভিন্ন বিভাগ। ছিল মনোরোগ বিদ্যাবিভাগ, অর্থোপেডিক বা হাড়ভাঙার চিকিৎসার জন্যও আলাদা বিভাগ ছিল। আরও বিভিন্ন ধরনের বিভাগ ছিল।

এসব হাসপাতাল কেবল আরোগ্যকেন্দ্র ছিল না, প্রকৃতপক্ষে বরং উন্নতমানের চিকিৎসা-মহাবিদ্যালয় ছিল। যতটা চিকিৎসাসেবা হতো তার চেয়ে বেশি মাত্রায় হতো চিকিৎসাবিদ্যার পড়াশোনা। বিশেষজ্ঞ প্রধান চিকিৎসক, যিনি আল-উস্তাদ বা অধ্যাপক নামে পরিচিত হতেন, প্রতিদিন সকালে ঘুরে ঘুরে রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসকগণ থাকতেন তার সঙ্গে। তিনি তাদের শেখাতেন এবং কী পর্যবেক্ষণ করছেন তার নোট নিতে বলতেন। সাথে সাথে চিকিৎসার পদ্ধতি বলে দিতেন, তারা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং শিখতেন। তারপর অধ্যাপক একটি বড় হলঘরে গিয়ে উপস্থিত হতেন, তাকে ঘিরে বসত শিক্ষার্থীরা। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থ থেকে তাদের পাঠ করে শোনাতেন, যতটুকু পাঠ করতেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও

৪৬৭. ইবনুল আল-কিফতি, *তারিখুল হুকামা*, পৃ. ৪০৫।

৪৬৮. মাহমুদ আল-হাজ কাসিম, *আত-তিব্বু ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, পৃ. ৩২৮-৩২৯।

করতেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। প্রতিটি শিক্ষা-কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে তিনি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। যারা শিক্ষা-কার্যক্রম শেষ করেছে তারা পরীক্ষায় অংশ নিত। বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতো তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সনদ দিতেন।

ইসলামি হাসপাতালগুলোর অভ্যন্তরে থাকত বড় বড় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারগুলোতে থাকত অসংখ্য গ্রন্থ। যেসব বিষয়ের গ্রন্থ এখানে স্থান পেত তা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, ওষুধপ্রস্তুতপ্রণালি, শারীরস্থান বা অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলি, চিকিৎসা-সংক্রান্ত ফিকহি বিষয়াবলি। চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জ্ঞানশাখার গ্রন্থাবলিও স্থান পেত হাসপাতালের গ্রন্থাগারে।

হাসপাতালগুলোতে কত বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল তা বোঝার জন্য এখানে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। কায়রোতে অবস্থিত ইবনে তুলুন হাসপাতালের গ্রন্থাগারে এক লাখেরও বেশি গ্রন্থ ছিল।

হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী জমিগুলোতে ওষুধি বড় বড় বাগান ছিল। এসব বাগানে ওষুধি বৃক্ষ ও তৃণলতার চাষ হতো। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের জন্য এসব বাগান তৈরি করা হতো।

রোগের সংক্রমণ যাতে না ঘটে বা না ছড়ায় তার জন্য হাসপাতালে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তা ছিল এক কথায় অনন্য ও বিস্ময়কর। কোনো রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করামাত্রই তার পরনের পোশাক পালটে নতুন পোশাক দেওয়া হতো। নতুন পোশাক দেওয়া হতো সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়। এটা করা হতো যাতে তার পরনের পোশাক থেকে সে যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা না ছড়ায়। তারপর প্রত্যেক রোগী সংশ্লিষ্ট রোগের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে প্রবেশ করত। কোনো রোগীর নির্ধারিত ওয়ার্ড ব্যতীত অন্য ওয়ার্ডে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। রোগের সংক্রমণ যাতে না ঘটে সে জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা ছিল। প্রত্যেক রোগীই ঘুমাত তার জন্য নির্ধারিত খাটে। খাটে দেওয়া হতো নতুন বিছানা-বালিশ ও নির্ধারিত সরঞ্জামাদি।

এসব ইসলামি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নয় শতাব্দীরও বেশি সময় পরে প্যারিসে যে হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল তার সঙ্গে এগুলোর তুলনা

চিত্র নং-৭
মানসুরি বড় হাসপাতাল

ইসলামের ইতিহাসে আরও একটি বিশাল হাসপাতালের উদাহরণ হলো আল-মানসুরি বড় হাসপাতাল। হাসপাতালটি কায়রোতে ৬৮৩ হিজরিতে/১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন বাদশাহ মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন। যথার্থতায়, শৃঙ্খলায় ও পরিচ্ছন্নতায় আল-মানসুরি হাসপাতাল ছিল পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুগুলোর অন্যতম। এই হাসপাতাল এত বিশাল ছিল যে এখানে দৈনিক চার হাজারেরও বেশি রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মারাকেশ হাসপাতালের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আল-মানসুর আবু ইউসুফ ইয়াকুব। তিনি মরক্কোয় আল-মুওয়াহহিদ (আল-মোহাদ)

খিলাফতের (রাজ্যের) শাসক ছিলেন। তার শাসনকাল ছিল ৫৮০ হি./১১৮৪ খ্রি. থেকে ৫৯৫ হি./১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। মারাকেশ হাসপাতালের নির্মাণশৈলী ছিল নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। নৈসর্গিক পরিবেশও এখানে তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে ছিল। হাসপাতালের এরিয়ায় সব ধরনের গাছ ও লতাগুল্ম রোপণ করা হয়েছিল। তৈরি করা হয়েছিল চারটি ছোট কৃত্রিম জলাশয় বা লেক। হাসপাতালটির চিকিৎসাব্যবস্থাও ছিল অতি উন্নত। ছিল আধুনিক ওষুধপত্র ও দক্ষ চিকিৎসকবৃন্দ।[৪৭০] ইসলামি সভ্যতার ললাটে মারাকেশ হাসপাতাল ছিল সত্যিকার অর্থেই একটি মূল্যবান রত্ন।

এখানে বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর একেকটিতে নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা দেওয়া হতো। যেমন চক্ষু হাসপাতাল, কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল, মানসিক হাসপাতাল ইত্যাদি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ও অভিনব ব্যাপার এই যে, কোনো কোনো বড় মুসলিম নগরীতে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-পল্লিই ছিল। আন্দালুসীয় ভূগোলবিদ ও পর্যটক ইবনে জুবায়ের তার ৫৮০ হিজরি/১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ভ্রমণবৃত্তান্তে এ ব্যাপারে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা অতি চমকপ্রদ। তিনি আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-পল্লি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটি একটি ছোট শহরের সমান। এই পল্লির মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে একটি বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা। অট্টালিকাটির চারপাশে রয়েছে বাগান এবং বেশ কিছু ঘর। এ-সবকিছুই রোগীদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই চিকিৎসা-পল্লি পরিচালনা করতেন। আরও ছিল ওষুধ প্রস্তুতকারী (ফর্মুলেশন) বিজ্ঞানীদের দল, ছিল চিকিৎসাবিদ্যার বহু শিক্ষার্থী। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সকলের খরচ বহন করা হতো। উম্মাহর ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্র ও নিঃসহায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য যেসব সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন তা থেকেও আসত খরচের একটি বড় অংশ।[৪৭১]

---

৪৭০. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১১০-১১৮।

৪৭১. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অসুস্থের সেবা ও মানবিক বন্ধন

ইতিপূর্বে আমরা যা আলোচনা করেছি, তা তো গেলই। এখন আমরা ইসলামি সভ্যতার যুগে মুসলমানদের চিকিৎসাসেবার আরেকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করব। সেটা হলো মানবিক বন্ধন। সাধারণভাবে মানুষের প্রতি সম্মান এবং তাদের দুঃখকষ্ট ও রোগ-ব্যাধি-যখম দূর করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয়ের মধ্য দিয়ে এই বন্ধন দৃশ্যমান হয়। মানুষটা কে এবং তার সমস্যা কী সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হয় না।

মুসলিম চিকিৎসকেরা অসুস্থদের সেবাদানের ক্ষেত্রে মানবিক বন্ধনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের জন্য এটা কোনো অভিনব ব্যাপার ছিল না। কারণ ইসলামি শরিয়ার আইনকানুনই এই অসাধারণ নৈতিক দায়িত্ববোধের কথা বার বার উচ্চারণ করেছে। ইসলাম অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেছে বিপদগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন মানুষ হিসেবে, এ কারণেই কে তার পাশে দাঁড়াবে, তার হাত ধরবে, তার ভয় ও শঙ্কা দূর করবে এবং তার শারীরিক ও মানসিক দুঃখকষ্ট লাঘব করবে তার জন্য এমন মানুষের প্রয়োজন।

ইসলামি শরিয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা হলো যেকোনো উপায়ে অসুস্থের সংকট দূর করা এবং যতটুকু সম্ভব তার দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করা। তাই তো ইসলামি শরিয়া অসুস্থকে রমযানে রোযা ভাঙার অনুমতি দিয়েছে। কারও হজ পালনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত বাধা থাকলে তার হজ পালনের দরকার নেই। এ কারণে তার কোনো গুনাহ হবে না। যে অসুস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে নামায পড়তে পারে না তাকে তার জন্য উপযোগী অবস্থায় নামায পড়ার অনুমোদন দিয়েছে। সে বসে অথবা শুয়ে বা এমনকি চোখের ইশারায়(৪৭২) নামায পড়তে পারে! যে অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহারে

---

৪৭২. এ মতটি শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত ও সারাবিশ্বের সর্ববহুল চর্চিত হানাফি মাযহাবমতে চোখের ইশারায় নামাযের অনুমতি নেই। তাই মাথার

অক্ষম তার জন্য অজুর বদলে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। কেউ যদি কোনো কারণে অজু বা তায়াম্মুম কোনোটাই করতে না পারে তাহলে সে এই অবস্থাতেই নামায পড়বে।[৪৭৩] শরিয়তের পরিভাষায় তাকে 'ফাকিদুত তাহুরাইন' (দুটি পদ্ধতিতেই পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম) বলে!

এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদের মুহূর্তে রুগ্ন ব্যক্তি থেকে ইসলামি শরিয়া বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছে। ফলে সে জিহাদ না করলেও তার কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾

অন্ধের জন্য গুনাহ নেই, ল্যাংড়ার জন্য গুনাহ নেই, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য কোনো গুনাহ নেই।[৪৭৪]

ইশারায় নামায পড়তে সক্ষম হলে মাথার ইশারাতেই নামায পড়বে! অন্যথায় অক্ষম হলে চোখের ইশারায় নামায পড়বে না। বরং সক্ষমতা ফিরে পেলে ছুটে যাওয়া নামাযগুলো আদায় করে নেবে।

রাসুলের হাদিস থেকেও এমনটিই বুঝে আসে। ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْجُدَ فَلْيَسْجُدْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَلْيَكُنْ رُكُوْعُهُ وَسُجُوْدُهُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ»

তোমাদের মধ্যে যে সেজদা করতে সক্ষম, সে যেন সেজদা করে। যে অক্ষম সে যেন সেজদা করার জন্য কপাল বরাবর কোনো বস্তু না ওঠায়, তবে সে রুকু-সেজদা আদায়ার্থে মাথা দিয়ে ইশারা করবে।

দেখুন, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৩৩৫৮; *নাসবুর রায়া*, খ. ২, পৃ. ১৭৬ (দারুল কিবলা, জেদ্দা); *হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ১৪১; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যা*, খ. ২৭, পৃ. ২৬৪।-সম্পাদক

৪৭৩. ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে তাকে এ অবস্থায় নামাযও পড়তে হবে, পরবর্তী সময়ে অজু বা তায়াম্মুমে সক্ষম হলে কাযাও করতে হবে। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে তাকে নামাযও পড়তে হবে না, কাযাও করতে হবে না। হাম্বলি মাযহাবে এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী সে নামাযের নিয়ত ব্যতীত নামাযের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে ও পরে অজু বা তায়াম্মুমে সক্ষম হলে কাযা পড়ে নেবে। কারণ পবিত্রতাবিহীন নামায গ্রহণযোগ্য নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকেও এমনটি বুঝে আসে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ» পবিত্রতাবিহীন নামায গ্রহণযোগ্য নয়। দেখুন, *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১; *মাআরেফুস সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩১-৩২; *রদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ২৫২-২৫৩।-সম্পাদক

৪৭৪. সুরা নুর : আয়াত ৬১।

ইসলামি শরিয়া কেবল কিছু বিধান উঠিয়ে নিয়ে ও কতিপয় ফরয ইবাদতে রুখসত (ছাড়) দিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, বরং অসুস্থের পাশে থেকে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে এবং তার মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তির ব্যবস্থা করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থকে তার বাড়িতে বা হাসপাতালে দেখতে যাওয়া মুসলমানদের একটি অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ.... وَذَكَرَ مِنْهَا: وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ»

মুসলমানের ওপর মুসলমানের হক ছয়টি, ...(ছয়টির মধ্যে একটি এই যে,) যখন সে অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাবে।[৪৭৫]

যে ব্যক্তি অসুস্থকে দেখতে যাবে তার জন্য জান্নাত লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন,

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً»

যে ব্যক্তি অসুস্থকে দেখতে যায় তার জন্য আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, তোমার কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক তোমার আগমনের, তুমি তো জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ।[৪৭৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির কাছে ভালো ভালো ও কল্যাণের কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করতে বলেছেন। সে দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবে এবং দীর্ঘজীবী হবে,

---

৪৭৫. *বুখারি*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : আল-আমরু বিত্তিবায়িল জানায়িয, হাদিস নং ১১৮৩; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার হলো সালামের জবাব দেওয়া, হাদিস নং ২১৬২।

৪৭৬. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : যিয়ারাতুল ইখওয়ান, হাদিস নং ২০০৮, ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান গরিব বলেছেন। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৪৪৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮৫১৭; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ২৯৬১।

এমন আশাদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِي الْأَجَلِ؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يَطِيْبُ نَفْسَ الْمَرِيْضِ»

তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে আয়ু ও রোগমুক্তির ব্যাপারে আশান্বিত করো[৪৭৭]। এটা (তাকদিরে নির্ধারিত) কোনোকিছু প্রতিহত করবে না বটে, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির চিত্তকে প্রশান্ত করবে।[৪৭৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরং অসুস্থের আত্মবিশ্বাস ও মনোবলকে আসমানি বিষয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, যখন তিনি জানিয়েছেন যে, ধৈর্যধারণ-সাপেক্ষে রোগ-ব্যাধি ও অসুস্থতা হলো তার পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত ও আখেরাতে মুক্তির কারণ। ইমাম বুখারি আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

মুসলিমের ওপর যেসব ক্লান্তি ও রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুঃখ, কষ্ট ও উদ্বেগ আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিঁধে, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৪৭৯]

ইমাম বুখারি আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

---

৪৭৭. ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খ. ১০, পৃ. ১২১-১২২; *তুহফাতুল আহওয়াযি বি-শারহ জামি আত-তিরমিযি*, খ. ৬, পৃ. ২৬৩।

৪৭৮. *তিরমিযি*, কিতাব : আত-তিব্ব, তিনি বলেছেন, এটি গরিব হাদিস, হাদিস নং ২০৮৭। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৪৩৮; *ইবনে আবি শাইবা*, হাদিস নং ১০৮৫১; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৯২১৩; আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ. ২, পৃ. ২০৮।

৪৭৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-মারদা, বাব : মা জাআ ফি সাওয়ারিল মারাদ, হাদিস নং ৫৩১৮; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : সাওয়াবুল মুমিন ফি-মা ইয়ুসিবুহু মিন মারাদ আও হুযন, হাদিস নং ২৫৭৩।

«إِنَّ اللهَ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ»

নিশ্চয় আল্লাহ বলেন, আমি যদি আমার বান্দাকে তার দুটি অতিপ্রিয় জিনিসের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দুটি জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দান করি।[৪৮০]

অসুস্থ মুমিন বান্দার আত্মবিশ্বাস এভাবেই আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়। ফলে সমাজে সে নিজেকে অক্ষম-অপদার্থ ও ফেলনা মনে করে না। বরং বিশ্বাস করে যে, সবাই তাকে গুরুত্ব দেয় এবং যত্ন নেয়।

ইসলামের এই উন্নত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল মুসলিম রোগীদের জন্য নয়, বরং যেকোনো অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তা প্রযোজ্য, তার ধর্মাদর্শ যা-ই হোক না কেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে এটাই বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ...﴾

আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি...।[৪৮১]

সাধারণভাবে সব মানুষই সম্মানিত। এ কারণেই কেউ অসুস্থ হলে তার সেবাযত্ন করতে হবে এবং রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা করতে হবে, সে মুসলিম না হলেও। একটি ইহুদি বালক অসুস্থ হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।[৪৮২] এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইমাম বুখারি রহ. তার *সহিহে* একটি বাব (অনুচ্ছেদ) রচনা করেছেন, বাবটির নাম : ইয়াদাতুল মুশরিক (মুশরিক অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া)।

এই গভীর মানবিক বন্ধনের শেকড় আমাদের মধ্যে প্রোথিত করে দিয়েছে ইসলামি শরিয়া। এর ফলেই ইসলামি সভ্যতার যুগে যুগে মুসলিম

---

৪৮০. বুখারি, কিতাব : আল-মারদা, বাব : ফাদলু মান যাহাবা বাসারুহু, হাদিস নং ৫৩২৯; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২৪৯০; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৩৭১১; তাবারানি, *আল-আওসাত*, হাদিস নং ২৫০; বায়হাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৯৯৫৮।

৪৮১. সুরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৭০।

৪৮২. *বুখারি*, আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মারদা, বাব : ইয়াদাতুল মুশরিক, হাদিস নং ৫৩৩৩।

চিকিৎসকরা রোগীদের সঙ্গে তাদের 'মানুষ' ভেবেই আচরণ করতেন, তাদের 'অনুভূতিহীন বস্তু' মনে করতেন না। অথবা এটাও মনে করতেন না যে, রোগীরা হলো টাকাপয়সা রোজগারের হাতিয়ার, তাদের থেকে টাকাপয়সা খসানোর ফন্দি বের করতে পারলেই হয়! বরং রোগীদের মনে করা হতো বিপদ্গ্রস্ত ও সংকটাপন্ন মানুষ বলে, যাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ও পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। শুধু চিকিৎসা ও সেবামূলক সাহায্য নয়, বরং মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এমন মহৎ অনুভূতি ও প্রেরণা নিয়েই মুসলিম চিকিৎসকেরা তাদের রোগীদের সেবা দিতেন। ইসলামি রাষ্ট্রে ধনী-নির্ধন, আরব-অনারব, সাদা-কালো, শাসক-শাসিত, রাজাপ্রজা, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে অতি উন্নত চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। অধিকাংশ সময়ই সকলের জন্য চিকিৎসা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রোগীদের সামাজিক অবস্থান ও স্তরভেদ যা-ই হোক না কেন, তারা সবাই একই মানের চিকিৎসাসেবা পেত।

আসুন আমরা ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার দিকটি দেখি, তাহলেই আমরা মানবিক বন্ধন সম্পর্কে একটি ধারণা পাব।

কোনো রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করামাত্রই একটি বহিঃকক্ষে তার প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হতো। তার রোগ বা অসুস্থতা হালকা পর্যায়ের হলে তাকে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়া হতো। সে চিকিৎসাপত্র দেখিয়ে হাসপাতালের ওষুধালয় থেকে ওষুধ নিয়ে যেত। রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ ও হাসপাতালে ভর্তির উপযোগী হলে তার নাম রেজিস্ট্রি করা হতো। তারপর তাকে গোসলের জন্য গোসলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো এবং তার পরনের পোশাক খুলে নিয়ে একটি বিশেষ বস্ত্রভান্ডারে রাখা হতো। তারপর তাকে দেওয়া হতো হাসপাতালের বিশেষ এক প্রস্থ নতুন পোশাক। এরপর তাকে তার মতো রোগীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। নতুন বিছানা-বালিশে সজ্জিত একটি খাট পেত সে। তার মানসিক দিকটি বিবেচনা করেই এই খাটে অন্যকোনো রোগীর অবস্থানের অনুমতি ছিল না।

রোগী ইসলামি হাসপাতালে প্রবেশের পর চিকিৎসক তাকে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন সে অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হতো। তার স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্য ও পথ্যও দেওয়া হতো নির্ধারিত পরিমাণে। রোগীরা সাধারণত যে প্রকারের খাবার খায় তাদের সেসব খাবার খেতে বাধ্য করা হতো না। বরং উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হতো তাদের। রোগীদের খাদ্য-তালিকার মধ্যে ছিল খাসি ও গরুর গোশত এবং পাখি ও মুরগির গোশত। খাবারের পরিমাণের ক্ষেত্রেও কোনো কৃপণতা ছিল না এবং রোগীদের কষ্ট দেওয়া হতো না। বরং একজন রোগীর সুস্থতার আলামত ছিল এই যে, সে একই বৈঠকে পুরো একটি রুটি ও একটি আস্ত মুরগি খেয়ে শেষ করবে!

রোগী যখন আরোগ্যলাভের পর্যায়ে পৌঁছে যেত, তাকে আরোগ্য লাভকারীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এখানে তার পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভের পর তাকে আরেক প্রস্থ নতুন পোশাক দেওয়া হতো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শুধু তা-ই নয়, তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও দেওয়া হতো, যাতে সে কর্মক্ষম হওয়া পর্যন্ত খরচ চালিয়ে নিতে পারে! অর্থাৎ, সে যেন পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার আগে কাজ করতে বাধ্য না হয়, কারণ এতে তার স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়তে পারে।[৪৮৩]

এখন আপনার প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই যে ইসলামি সমাজে দরিদ্র মানুষেরা কী পরিমাণ স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। যেহেতু তারা জানতই যে অসুস্থ হলে এই পর্যায়ের চিকিৎসাসেবা, যত্ন-আত্তি ও সাহায্য-সহযোগিতা পাবে। এমন চিকিৎসা ও সাহায্য পাওয়ার জন্য তাদের কপালের ঘাম ঝরানোর প্রয়োজন হতো না, প্রয়োজন হতো না কারও সুপারিশের বা কারও মধ্যস্থতার। আর চিকিৎসা পরিপূর্ণ করার আবেদন জানিয়ে কাকুতিমিনতি করা তো দূরেরই কথা!

মহান চিকিৎসক আবু বকর রাযি তার ছাত্রদের উদ্দেশে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা কত চমৎকার। তিনি তাদের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে রোগীদের সুস্থ করে তোলা, তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ নয় এবং তারা আমির-উমারা ও ধনী ব্যক্তিদের চিকিৎসা যতটা গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে করবে, ততটাই আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সঙ্গে করবে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের চিকিৎসা; তারা নিজেরা

---

৪৮৩. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১১০।

বিশ্বাস না করলেও রোগীদের বোঝাবে যে তারা আরোগ্যলাভ করবে, সুস্থ হয়ে উঠবে।[৪৮৪] কারণ শারীরিক অবস্থার ওপর মানসিক অবস্থারই প্রতিফলন ঘটে।

স্বাস্থ্যসেবার এমন উন্নত ব্যবস্থা কেবল বড় বড় শহর ও নগরে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইসলামি রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পেত। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালগুলো তাদের চিকিৎসাসেবার আঞ্জাম দিত। আগের অনুচ্ছেদে আমরা এসব হাসপাতাল সম্পর্কে বলেছি। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালগুলো সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চল, ছোট পল্লি, পাহাড়ি জনপদ ও দূরবর্তী এলাকাগুলোয় ঘুরে বেড়াত।

ইসলামি রাষ্ট্র স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দিয়েছে; পরিবেশ, সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক ভিন্নতা ইত্যাদিকে আমলে নেয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে যে-কেউ এরূপ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবেন।

অসুস্থের প্রতি ইসলামের মমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বরং সমাজের সকল স্তরের প্রতিই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল; এর অন্তর্ভুক্ত ছিল জেলখানার কয়েদিরা, যারা মুসলিম সমাজের অনিষ্ট করেছে! এসব কয়েদিও পরিপূর্ণ চিকিৎসাসেবা পেত। কারণ তারাও মানুষ। যেকোনোভাবেই হোক, তারাও সমাজের সন্তান। তাদের যে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তা তাদের সংশোধনের জন্যই, ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য নয়। অথচ আজকের বিশ্বে অসংখ্য কারাগারের বন্দিদের সঙ্গে এমনই আচরণ করা হচ্ছে, তাদেরকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

উজির আলি ইবনে ঈসা ইবনে জাররাহ বাগদাদের প্রধান চিকিৎসক (সিভিল সার্জন) সিনান ইবনে সাবিতকে চিঠি লিখে জানান, আমি জেলখানার কয়েদিদের ব্যাপারে ভেবেছি। তাদের সংখ্যাধিক্য এবং পরিবেশের রুক্ষতার কারণে তাদের রোগাক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই আপনার উচিত কয়েদিদের জন্য কয়েকজন চিকিৎসক নির্ধারণ করা, যারা প্রতিদিন গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন, ওষুধপত্র ও পথ্য

---

[৪৮৪]. আবদুল মুনয়িম সাক্ব, *তা'লিমুত তিব্ব ইনদাল আরাব, আবহাসুন নাদওয়াতি ইলমিয়্যাহ লিল-জামইয়্যাতিস সুরিয়্যাহ লি-তারিখিল উলুম*, পৃ. ২৭৯।

দেবেন, গোটা জেলখানা ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং অসুস্থ কয়েদিদের চিকিৎসা করবেন।[৪৮৫]

মানবিকতার এই তরঙ্গ ইসলামি সভ্যতায় যুগ যুগ ধরে প্রবহমান ছিল। কারণ এর পেছনে সক্রিয় ছিল মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের উদারচিত্তে ও মুক্তহস্তে দান, এই দান ছিল অবিরাম প্রস্রবণের মতো এবং তা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যও সহায়ক। আমি এখানে জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ-ব্যবস্থার কথা বোঝাতে চাচ্ছি। অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা, যত্ন ও আপ্যায়ন এবং তাদের সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ-ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উন্নত হাসপাতালগুলো সম্পূর্ণরূপে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল, মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন দায়িত্বশীল এসব সম্পত্তির দেখভাল করতেন। কখনো কখনো স্বয়ং বিচারকও এই দায়িত্ব পালন করতেন। ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় থেকেই হাসপাতালগুলোর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হতো। রোগীদের প্রয়োজনীয় খরচ, চিকিৎসকদের বেতন-ভাতা, বিছানাপত্র ও খাদ্য ক্রয়, ওষুধি বাগান তৈরি, ওষুধ প্রস্তুতকরণ—সবকিছুর খরচ আসত ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি থেকে। এমনকি হাসপাতালে অনুশীলনরত মেডিকেল শিক্ষার্থীদের খরচাদিও মেটাত এ থেকে!

এই ক্ষেত্রে একটি প্রসিদ্ধ নমুনা হলো কায়রোতে অবস্থিত আল-মানসুরি বড় হাসপাতাল। বাদশাহ মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন ৬৮৩ হিজরি ১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। হাসপাতালটির বার্ষিক খরচ মেটানোর মতো সম্পত্তিও ওয়াক্ফ করেন। যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ এবং তা মুসলমানদের মানবিক ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা উল্লেখ করা হলো। এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা জরুরি। তা এই যে, রোগীর মন-মানসিকতা সজীব ও সতেজ রাখার কিছু অভিনব ও অভূতপূর্ব কৌশল অবলম্বন করা হতো। ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির একটি অংশের আয় নির্দিষ্ট ছিল এমন দুজন লোককে বেতন দেওয়ার জন্য, যারা প্রতিদিন হাসপাতালে ঘুরে বেড়াবে এবং রোগীদের অন্তরালে

---

৪৮৫. ইবনুল কিফতি, *তারিখুল হুকামা*, পৃ. ১৪৮।

দাঁড়িয়ে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের সুস্থতার ব্যাপারে কথা বলবে। অর্থাৎ তারা রোগীর পাশে থেকে নিচুস্বরে কথা বলবে এমনভাবে যে, রোগী তাদের কথা শুনতে পেলেও তাদের দেখতে পাবে না। তারা নিজেদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রোগীকে তার আরোগ্যলাভ ও সুস্থতার কথা জানান দেবে! ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির এই অংশটির নাম ছিল ওয়াক্‌ফু খিদায়িল মারিদ (রোগীর মন ভোলানোর জন্য ওয়াক্‌ফিয়া সম্পত্তি)। রোগীর মন সতেজ ও মনোবল চাঙা করে তোলার জন্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। ফলে দেখা যেত রোগী খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠছে![৪৮৬]

রোগীদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দৃঢ় মানবিক বন্ধন ব্যক্তিগত আচরণে সীমাবদ্ধ ছিল না যে, কতিপয় চিকিৎসকই তা চর্চা করেছেন এবং তা কেবল জনগণের হৃদয় থেকে উৎসারিত জাতীয়তাভিত্তিক মমতা ও কল্যাণার্থে, বরং এমন আচরণ ছিল সর্বজনীন ও সামগ্রিক, রাষ্ট্রীয় নীতিই এমন আচরণের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। উম্মাহর সকল সদস্য—রাজা ও প্রজা এবং শাসক ও শাসিত সবাই—এই নীতি অবলম্বন করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খলিফা বা আমির নিজে এসে রোগীদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানসুর মুওয়াহহিদি (মরক্কোর মুওয়াহহিদি রাজ্যের সুলতান) সাপ্তাহিক রুটিনমাফিক মারাকেশে মানসুরি হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেন। প্রতি সপ্তাহে জুমআর নামাযের পর হাসপাতালটি পরিদর্শন করতেন এবং রোগীদের অবস্থা দেখে-শুনে নিশ্চিন্ত হতেন।[৪৮৭]

ইসলামি চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আরেকটি মানবিক দিক বিবেচনায় রাখা হতো। ইসলামি শরিয়া এ ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছে। তা হলো রোগীর সম্মান রক্ষা করা ও তার লজ্জা হেফাজত করা। ফলে রোগীর ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মসম্মান যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হতো।

---

[৪৮৬]. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১১২।

[৪৮৭]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ইসলামি শরিয়ার বিধান অনুযায়ী প্রয়োজন ছাড়া রোগীর ছতর উন্মোচন করা জায়েয নয়। পরীক্ষা বা অস্ত্রোপচার করতে যতটুকু অংশ উন্মোচিত করা প্রয়োজন ততটুকু উন্মোচিত করা যাবে, এর বেশি নয়। বাইরের কারও জন্যে রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপারগুলো দেখা জায়েয নয়, আর যদি তারা হয় ভিন্ন লিঙ্গের তাহলে তো কথাই নেই। একইভাবে মাহরাম পুরুষের[৪৮৮] অথবা অন্য নারীর (যেমন নার্স) উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোনো পুরুষ চিকিৎসক কোনো মহিলা রোগীর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না, এটা তার জন্য কোনোভাবেই জায়েয নয়। এ কারণেই ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতালগুলোর অভ্যন্তরে নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল।

ইসলামি চিকিৎসা-ব্যবস্থায় রোগীদের সাথে আরও একটি মানবিক দিককে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছে। শরিয়া আইন চিকিৎসাগ্রহণের ক্ষেত্রে রোগীদের অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ, পুরুষ চিকিৎসকের জন্য মহিলা রোগীর চিকিৎসা করার অনুমোদন রয়েছে এবং একইভাবে নারী চিকিৎসকের জন্যও পুরুষ রোগীর চিকিৎসা করার অনুমোদন রয়েছে। এই অনুমোদন তখনই কার্যকর হবে যখন সমলিঙ্গের অভিজ্ঞ চিকিৎসক না পাওয়া যাবে যিনি পূর্ণরূপে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। যাতে রোগীদের—পুরুষ হোক বা নারী—সঠিক চিকিৎসার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে না যায়। এমনকি শরিয়া এই অনুমতিও দিয়েছে যে, মুসলিম রোগী অমুসলিম চিকিৎসকের কাছেও চিকিৎসা নিতে পারবে, যখন তার যথার্থ চিকিৎসা করতে পারে এমন মুসলিম ডাক্তার পাওয়া দুষ্কর হবে। রোগীদের স্বাস্থ্য ও জীবন সুরক্ষার জন্যই শরিয়ার এই অনুমতি।

যে কথাটি বলে আমরা এই অধ্যায় শেষ করতে চাই তা এই যে, ইসলামি সভ্যতায় স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলোর ভিত্তি ছিল নিখাদ ইসলামি সম্পর্ক ও মানবিক বন্ধন; ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই। এই ব্যাপারটার সঙ্গে পাশ্চাত্যের এখনো পরিচয় ঘটেনি। ইসলামি স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলো রোগীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, পথ্য ও খাদ্য দিত তো বটে, দরিদ্র রোগীদেরকে উট বা অন্যান্য পশু এবং নিজের খরচের অর্থও দিত।

---

৪৮৮. স্বামী অথবা বাবা, ভাই, ছেলে, ভাগনে, ভাতিজা... অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম।

যাতে তারা পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে এবং কর্মক্ষম হয়ে কাজ করে খেতে পারে এবং এভাবে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতে পারে। ইসলামি সভ্যতায় এই মানবিক প্রবণতা সর্বজনীনতা ও সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পান্থনিবাস ও সরাইখানা

ইসলামি সভ্যতা ইসলামের শুরুর যুগ থেকেই সরাইখানা-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত। আল-কুরআন সাধারণ গৃহস্থলে প্রবেশের বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। যা ইসলামের বাস্তববাদিতা ও সামাজিকতাকেই প্রমাণ করে। সাধারণ গৃহস্থলের মধ্যে সরাইখানাও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ﴾

> যে ঘরে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো গুনাহ নেই (প্রয়োজন হলে প্রবেশ করতে পারো)।[৪৮৯]

ইমাম তাবারি এই আয়াতে টীকা সংযুক্ত করে বলেছেন, হে লোকসকল, যেসব ঘরে কেউ বসবাস করে না অর্থাৎ বাসিন্দা নেই সেখানে তোমরা অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করতে পারো, তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই, অসুবিধাও নেই। তবে মুফাসসিরদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে এখানে ঘর বলতে কোন ধরনের ঘর বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল বলেছেন, এখানে ঘর বলতে সরাইখানা ও পান্থনিবাস বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে স্থায়ী বা পরিচিত বাসিন্দা থাকে না। এসব ঘর পথিক ও মুসাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে তারা এগুলোতে আশ্রয় নিতে পারে এবং তাদের মালপত্র সুরক্ষিত রাখতে পারে।[৪৯০]

মুসলিম সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই পান্থনিবাস ও সরাইখানা নির্মাণের যে ইতিহাস তা সত্যিকার অর্থেই ইসলামি নগরায়ণ ও সভ্যতার উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। পথিক, মুসাফির ও আগন্তুকদের অবস্থা কতটা গুরুত্বের সঙ্গে

---

[৪৮৯]. সুরা নুর : আয়াত ২৯।

[৪৯০]. ইমাম তাবারি, *জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন*, খ. ১৯, পৃ. ১৫১।

বিবেচিত হতো তাও বোঝা যায়। মুসাফির ও আগন্তুক যদি যাকাতের সম্পদের হকদার হতো তাহলে ইসলামি প্রশাসন তাদের খাদ্য-পানীয়-বাসস্থান–প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করত। ফলে পান্থনিবাস ও সরাইখানা ছিল জনকল্যাণেরই একটি অংশ, আর জনকল্যাণের ধারণাটি দিয়েছে ইসলামি শরিয়া। ইসলামি সভ্যতা তার সুদীর্ঘ ইতিহাসকালে চমৎকার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে।

ইসলামি শহরগুলোর মধ্যে যেসব ব্যবসায়িক পথ ছিল সেগুলোজুড়ে সরাইখানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এগুলোতে আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিল ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থী। সরাইখানা-কর্তৃপক্ষ দরিদ্র, মিসকিন ও মুসাফিরদের বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করত। বিনামূল্যে আপ্যায়ন করত বলে সরাইখানাগুলোর নাম হয়ে গিয়েছিল 'দারুয যিয়াফাত' বা আপ্যায়নগৃহ।[৪৯১]

সরাইখানা ও পান্থনিবাসগুলো ছিল পথিক ও মুসাফিরদের প্রকৃত আশ্রয়স্থল; রাষ্ট্র যেমন এগুলো প্রস্তুত করে দিয়েছিল, তেমনই কল্যাণকর কাজে ব্রতী মুসলমানগণও এগুলো তৈরি করে দিয়েছিলেন। সরাইখানায় এসে মুসাফির ও পথিকেরা গ্রীষ্মের তাপদাহ ও শীতকালের শৈত্য থেকে রক্ষা পেত।

সা'দান ইবনে ইয়াযিদ হিজরি তৃতীয় শতকের একজন আলেম ছিলেন। তিনি তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি ২৬২ হিজরির ঘটনা। এক ঝঞ্ঝাপূর্ণ বর্ষণমুখর রাতে তিনি একটি সরাইখানায় এসে আশ্রয় নেন। দেখতে পান যে সরাইখানার সব কামরা ও বিছানা লোকে পরিপূর্ণ। কারণ প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ ছিল।[৪৯২]

এসব পান্থনিবাসে তালিবুল ইলম ও শিক্ষার্থীদের জন্য চমৎকার ব্যবস্থাপনা ছিল। তারা গোলমাল ও হইচই থেকে নিরাপদ থেকে পড়াশোনা ও আলোচনা করতে পারত। ইবনে আসাকির এ ব্যাপারে একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, আবু উমর আস-সাগির বলেন, আমরা দামেশকে প্রাসাদের কাছাকাছি একটি সরাইখানায় উঠলাম। আসরের নামায আদায় করলাম। পরের দিন সকালে আমরা আহমাদ ইবনে

---

৪৯১. ফুয়াদ ইয়াহইয়া, *জারদুন আসারিয়্যিন লি-খানাতি দিমাশক*, পৃ. ৬৯।
৪৯২. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম*, খ. ৫, পৃ. ৩৯।

উমায়েরের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এ সময় আল-খানি বা সরাইখানার দায়িত্বশীল এলেন। বললেন, আবু আলি হাফিজ কোথায়? আমি বললাম, এখানেই আছেন। তিনি বললেন, শাইখ (আহমাদ ইবনে উমাইর) তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। গিয়ে দেখি শাইখ সরাইখানার সামনে তার খচ্চরের ওপর বসে আছেন। আমাদের দেখে খচ্চর থেকে নামলেন। আমরা যে কামরায় উঠেছি সেখানে এলেন। শাইখ আবু আলিকে সালাম দিলেন, তাকে অভিনন্দন জানালেন। তার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। শাইখ আবু আলির সঙ্গে ইলমি আলোচনায় মশগুল হয়ে গেলেন। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আলোচনা চলল। তারপর শাইখ বললেন, আবু আলি, আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে দিনারের হাদিস সংকলন করেছেন? আবু আলি বললেন, হ্যাঁ, করেছি। শাইখ বললেন, সেগুলো আমাকে দিন। আবু আলি হাদিসগুলোর সংকলন বের করে সামনে রাখলেন। শাইখ সেগুলো নিয়ে আস্তিনে রাখলেন। তারপর উঠে গিয়ে সওয়ারিতে আরোহণ করলেন।[৪৯৩]

এসব সরাইখানা শিক্ষার্থীদের ইসলামি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়ার জন্য প্রকৃত অর্থেই বেশ বড় সহায়ক ছিল। ইমাম যাহাবি এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের বিখ্যাত আলেম বাকি ইবনে মাখলাদ রহ. বাগদাদে এলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে হাদিস শেখার জন্য। ইমাম আহমাদ তখন জাবরিয়্যাদের চাপের মুখে ছিলেন। সদ্যই খালকুল কুরআনের ঘটনায় কারাগার থেকে বেরিয়েছেন। বাকি ইবনে মাখলাদ নিশ্চিত হলেন যে তাকে দীর্ঘদিন বাগদাদে কাটাতে হবে। তাই তিনি সরাইখানার একটি কামরা ভাড়া নিয়ে নিলেন। এখান থেকে তিনি প্রতিদিন একজন মিসকিন লোকের বেশে আহমাদ ইবনে হাম্বলের কাছে যেতেন এবং তার থেকে একটি বা দুটি হাদিস শুনতেন। তারপর সরাইখানার কামরায় ফিরে আসতেন। এভাবে চলতে থাকল। অবশেষে আহমাদ ইবনে হাম্বলকে প্রকাশ্যে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হলো![৪৯৪]

---

৪৯৩. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৫, পৃ. ১১৫।
৪৯৪. ইমাম যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৩, পৃ. ২৯৩।

ইসলামি সভ্যতায় সরাইখানার কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে, এগুলো কেবল ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীদের আশ্রয়স্থলে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও বড় কিছু হয়ে ওঠে। আমরা দেখি যে, কতিপয় খলিফা তাদের সফরকালে সরাইখানাতেই ওঠেন এবং যাত্রাবিরতি করেন। আব্বাসি খলিফা আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ ইস্কানদারুন (Iskenderun) শহরের কাছে হুসাইন সরাইখানায় ওঠেন। এটা ২৮৭ হিজরির ঘটনা। এ সময় তিনি উপকূলীয় এলাকা ও শামীয় (সিরিয়ান) শহরগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছিলেন। ইস্কানদারুন শহরটি বর্তমানে তুরস্কের হাতাই প্রদেশের অন্তর্গত।[৪৯৫]

অনেক খলিফা পান্থনিবাস ও সরাইখানাকে কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন, ফলে এগুলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অধীনে চলে যায়। সরাইখানার ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মুসাফির, দরিদ্র মানুষজন ও শিক্ষার্থীদের ব্যয়ভার ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হতো। আব্বাসি খলিফা আল-মুস্তানসির বিল্লাহ (মৃ. ৬৪০ হিজরি) সরাইখানা ও পান্থনিবাস নির্মাণে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এগুলোতে দরিদ্র মানুষ ও মুসাফিরদের আশ্রয় দেওয়া হতো।[৪৯৬]

প্রসিদ্ধ সরাইখানা ও পান্থনিবাস

ফ্রি সরাইখানা নির্মাণ করে যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের অন্যতম হলেন আমির নুরুদ্দিন মাহমুদ। আবু শামাহ *'আর-রাওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন'* গ্রন্থে ইবনুল আসির থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, নুরুদ্দিন মাহমুদ পথে পথে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। এতে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়, তাদের মালপত্রও সুরক্ষিত থাকে; শীতকালে শৈত্য ও বর্ষা থেকে বাঁচার জন্য তারা এগুলোতে আশ্রয় নেয়।[৪৯৭]

এ ব্যাপারটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, কতিপয় নারীও পান্থনিবাস ও সরাইখানা নির্মাণে অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পুণ্য ও প্রতিদান লাভের আশাতেই তারা এসব কাজ করেছেন। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির স্ত্রী ইসমাতুদ্দিন বিনতে

---

[৪৯৫]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৫, পৃ. ৬৩৫।

[৪৯৬]. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৮৬।

[৪৯৭]. আবু শামাহ, *আর-রাওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, পৃ. ১২।

মুইনুদ্দিন উনুর (মৃ. ৫৮১ হিজরি) দামেশকে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। এটি ইসমাতুদ্দিন সরাইখানা নামে পরিচিত ছিল।[৪৯৮]

আরেকজন নারী–ইবনে আসাকির তার নাম উল্লেখ করেননি–দামেশকে একটি পান্থনিবাস নির্মাণ করেছিলেন। এটির নাম ছিল ইবনুল আন্নাযাহ পান্থনিবাস।[৪৯৯]

বড় বড় অঞ্চলগুলোর রাজধানীতেই যে কেবল পান্থনিবাস ও সরাইখানা ছিল তা নয়, বরং প্রত্যন্ত এলাকা ও গ্রামাঞ্চলেও সরাইখানা ছিল। সাইমন নামের একজন ফরাসি চিত্রকর ১০৮৪ হিজরিতে ইস্পাহান ভ্রমণ করেন। তিনি ইস্পাহানে কী পরিমাণ সরাইখানা আছে তা গণনা করেছেন। তার গণনা অনুযায়ী সরাইখানা ছিল ১৬০০টি।[৫০০]

কোনো কোনো সরাইখানায় একটি বিশেষ বিভাগ ছিল যেখানে মানুষের আমানত, টাকাপয়সা ও সম্পদ গচ্ছিত রাখা হতো। এটিকে আমাদের যুগের ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নারী-পুরুষ সমানভাবে এগুলোর দায়িত্ব পালন করত, মালিক ব্যতীত অন্যদের হাতে গচ্ছিত অর্থ ও মালামাল ফেরত দেওয়ার অনুমতি ছিল না। ইবনুল জাওযি রহ. ৫৭১ হিজরির ঘটনাবলিতে এ বিষয়ে একটি কাহিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, একজন ব্যবসায়ী তার একটি পণ্য এক হাজার দিনারে বিক্রি করল। সে তার টাকা ও মালপত্র আনবারের (বাগদাদে) একটি সরাইখানায় গচ্ছিত রেখে খালি হাতে বাড়িতে এলো। একটি কৃষ্ণাঙ্গ দাস ছাড়া বাড়িতে তার আর কেউ ছিল না। এই দাসকে সে কয়েকদিন আগেই কিনে এনেছিল। রাতেরবেলা দাসটি মনিবের (ব্যবসায়ীর) কাছে উঠে এলো এবং একটি ছুরি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড বরাবর আঘাত করল। তারপর চাবি হাতিয়ে নিয়ে আনবারের সরাইখানার দিকে ছুটল। দাসটি সেখানে গিয়ে সরাইখানার দরজায় টোকা দিলো। দায়িত্বশীল মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, কে তুমি? দাসটি বলল, আমি অমুকের দাস। তিনি আমাকে সরাইখানা থেকে তার কিছু জিনিস নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। মহিলাটি বলল, আল্লাহর কসম, তোমার মনিব না আসা

---

৪৯৮. ইবনুল ইমাদ হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৪, পৃ. ৩১৯।
৪৯৯. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ২, পৃ. ৩২০।
৫০০. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৪, পৃ. ৪৯৮।

পর্যন্ত আমি তোমার জন্য দরজা খুলব না। দাসটি এখানে ব্যর্থ হয়ে বাড়িতে যা-কিছু আছে তা চুরি করার জন্য গেল। ঘটনাক্রমে সে যখন তার মনিবের বুকে ছুরি মেরেছিল তখন রাস্তার পাহারাদার লোকটির চিৎকার শুনেছিল। তাই তারা দাসটিকে আটক করল। মনিব আরও দুই দিন বেঁচে ছিল। তার মৃত্যুর পর দাসটিকে হত্যা করার জন্য সে নির্দেশ দিয়ে যায়। ফলে মনিবের মৃত্যুর পর দাসটিকে খোলা জায়গায় শূলে চড়ানো হয়।[৫০১]

কোনো কোনো সরাইখানায় ছিল পাকশালা। এসব সরাইখানার মালিকেরা বা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠ পাচকদের নিয়োগ দিত। পাকশালা থেকে সরাইখানায় আগত প্রত্যেক মুসাফিরকে তিন উকিয়া[৫০২] পরিমাণ রুটি দেওয়া হতো। মুসলিম বা অমুসলিম, স্বাধীন বা দাস– কোনো বাছবিচার ছিল না। অর্থাৎ সবাই প্রায় এক কেজি পরিমাণ রুটি পেত। ভুনা গোশত দেওয়া হতো ২৫০ গ্রাম। সঙ্গে এক বাটি অন্য খাবার ইত্যাদি দেওয়া হতো। সেলজুক শাসনামলে কারা-তাই নামের একটি সরাইখানা ছিল। এই সরাইখানা সম্পর্কে কিছু দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কারা-তাই সরাইখানায় আগত প্রত্যেক মুসাফির ও আগন্তুককে প্রতিদিন তিন উকিয়া পরিমাণ ভালো মানের রুটি দেওয়া হতো, বড় একবাটি তরকারি এবং এক উকিয়া রান্না-করা গোশত দেওয়া হতো। মুসলিম ও অমুসলিম, নারী ও পুরুষ, স্বাধীন ও দাস– সবাই সমানভাবে তা পেত।[৫০৩]

আমরা একটু আগে কারা-তাই সরাইখানা সম্পর্কে যে দস্তাবেজের কথা বলেছি তার কিছু বিষয় এখানে পর্যালোচনা করতে পারি। এ দস্তাবেজ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামি সভ্যতায় অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমতাবিধান বাস্তবায়নের ওপর খুব জোর দেওয়া হতো। অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম, স্বাধীন ও দাস এবং নারী ও

---

[৫০১]. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম*, খ. ১০, পৃ. ২৬৫।

[৫০২]. উকিয়া : নববি যুগে মক্কার হিসাবমতে উকিয়ার পরিমাণ ছিল ৪০ দিরহাম। এর ভিত্তিতে হানাফিদের কাছে এক উকিয়া সমান ২০০.৮ গ্রাম এবং অন্যদের কাছে প্রায় ২০১ গ্রাম। আধুনিক হিসেবে উকিয়ার বিভিন্ন পরিমাপে তফাত রয়েছে।

[৫০৩]. ফাহিম ফাতহি ইবরাহিম, *ইলখান ফিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx?id/56

পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। সরাইখানার পাকশালা থেকে প্রতি শুক্রবার রাতে মধু দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন দেওয়া হতো। এই মিষ্টান্ন সকল মুসাফির ও আগন্তুকের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হতো। কারা-তাই সরাইখানার দস্তাবেজে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রত্যেক জুমআর রাতে মধুময় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হতো এবং সরাইখানায় আগত প্রত্যেক মুসাফির ও আশ্রয়প্রার্থীকে সমানভাবে দেওয়া হতো। কেউ কম বা বেশি পেত না।[৫০৪]

আন্দালুসের কিছু শহর পান্থনিবাসের উন্নতি ও আধিক্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। আল-হিময়ারি তার *'সিফাতু জাযিরাতিল আন্দালুস'* গ্রন্থে বলেছেন, আন্দালুসের আলমেরিয়া শহরে ত্রিশটি কম এক হাজার সরাইখানা ছিল।[৫০৫] এত বেশি সরাইখানা থাকায় প্রমাণিত হয় যে, এই সুপ্রাচীন শহরটিতে বিপুল সংখ্যক পর্যটক ও ভ্রমণকারী আসত।

উমাইয়া শাসনামল থেকেই আন্দালুসে ব্যাপকভাবে সরাইখানা নির্মাণ করা হয়, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সরাইখানায় সামাজিক শিষ্টাচারের বালাই ছিল না। ফলে আমিররা সেগুলো ধসিয়ে দিয়েছেন। কারণ এগুলো সমাজে নৈতিক স্খলন সৃষ্টি করছিল। ২০৬ হিজরিতে হাকাম ইবনে হিশাম রাবাদে যে সরাইখানাটি ছিল তা ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেন। কারণ এ সরাইখানায় যারা আসত তারা ছিল পাপাচারে লিপ্ত ও নৈতিভাবে অধঃপতিত। ফলে তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।[৫০৬]

কোনো সন্দেহ নেই যে, অতীতকালে কোনো কোনো সরাইখানায় ও পান্থনিবাসে এ ধরনের গর্হিত কার্যকলাপ হতো, ঠিক এমনই গর্হিত ও অসামাজিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে আমাদের আধুনিক হোটেলগুলোতে, যা আমরা দেখি ও শুনি। কিন্তু দুটি বিষয়ের মধ্যে যোজন যোজন পার্থক্য রয়েছে। আমির ও খলিফারা সর্বোচ্চ ইচ্ছা ও শক্তি দিয়ে এসব অন্যায়, অশ্লীল ও গর্হিত কার্যাবলি প্রতিহত করতেন এবং সরাইখানাগুলোর ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতেন, ফলে সেগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে

---

৫০৪. Turan (Osman), Celâleddin Karatay, Vkiflari ve Vakfiyeleri, Belleten, Cilt: XII, Sayi: 45, 46, 47, 48, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 1948, p. 95- 96.

৫০৫. আল-হিময়ারি, *সিফাতু জাযিরাতিল আন্দালুস*, পৃ. ৬৪।

৫০৬. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, খ. ১, পৃ. ১৭৩।

দিতেন। কিন্তু এই আধুনিক যুগের হোটেলগুলোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি অনেকটাই বিপরীত!

কতিপয় সুলতানও অধিক হারে সরাইখানা নির্মাণে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সরাইখানাগুলোকে দরিদ্র মানুষ, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। মরক্কোর মারিনীয় সুলতান আবু ইয়াকুব ইউসুফ মারিনি (মৃ. ৭০৬ হিজরি) ফেজ শহরে শাম্মায়িন সরাইখানা পুনর্নির্মাণ করেন। সরাইখানাটি বিরান ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল পুনর্নির্মাণের পর এটিকে তিনি ফেজ জামে মসজিদে যারা আসতেন তাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন।[৫০৭]

মামলুকি শাসনামলে সরাইখানা ও পান্থনিবাসের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। অত্যন্ত ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে এগুলো, কিন্তু মামলুকি রাজ্য ইসলামি সভ্যতার অভিযাত্রায় এই ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয় যোগ করে। তারা মিশরে ও সিরিয়ায় যেসব পাশ্চাত্যের বণিক ও পর্যটকদের ছোট ছোট কলোনি গড়ে উঠেছিল তাদের জন্য বিশেষ সরাইখানা নির্মাণ করেন। মাকরিযি উল্লেখ করেছেন যে, সাইপ্রিয়টরা (সাইপ্রাসের অধিবাসী) ৭৮৩ হিজরিতে আলেকজান্দ্রিয়ায় আক্রমণ চালায়। তারা বিপুল সংখ্যক বাড়িঘর, দোকানপাট ও সরাইখানা জ্বালিয়ে দেয়। তিনি বলেন, মালাউনরা (সাইপ্রিয়টরা) কাইতালানি সরাইখানা, জানুয়ি সরাইখানা, মুযাহ সরাইখানা ও মুসিলি সরাইখানা জ্বালিয়ে দেয়। ভেতরের সব মালপত্র ও আসবাবসহ সরাইখানাগুলো পুড়ে যায়।[৫০৮]

মাকরিযি যেসব সরাইখানার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো ইউরোপীয় ও ইতালীয় বণিকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইতালির জেনোয়া (Genoa) শহরের অসংখ্য বণিক এখানে আসত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগে ইউরোপীয় বণিকেরা ইসলামি সভ্যতায় (মুসলিম দেশগুলোতে) বেশ গুরুত্ব পেয়েছে।

ইসলামি রাজ্যের আগ্রহ ছিল প্রত্যেক পেশার লোকদের আলাদা আলাদা সরাইখানা নির্মাণ করা এবং বিভিন্ন শহরে এ ব্যাপারটিই দেখা গেছে।

---

৫০৭. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ৫, পৃ. ৬৬৭।

৫০৮. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ১১৪।

শামীয় (সিরিয়ান) তেল ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সরাইখানা নির্মাণ করা হয়েছিল, এটি হলো কায়রোতে অবস্থিত ফুন্দুক তারান্তাই।[৫০৯]

ইসলামি সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই পান্থনিবাস ও সরাইখানার অস্তিত্ব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ফলে বোঝা যায় যে, এই সভ্যতায় কতটা ছিল সামাজিক বন্ধনের গুরুত্ব। বৈষয়িক ও মানসিক সব দিক থেকেই সামাজিক বন্ধনের উদার পরিচর্যা মিলেছে ইসলামি সভ্যতায়। বরং এই সভ্যতা যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বন্ধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা পূর্ববর্তী কোনো সভ্যতায় দেখা যায়নি। অসংখ্য সরাইখানা ও পান্থনিবাস নির্মাণ করেছে যেগুলোতে সব সুবিধাই বিনামূল্যে পাওয়া যেত। সমাজের সকল স্তরের ও সকল ধর্মের মানুষের জন্য এগুলো উন্মুক্ত ছিল। মানুষ যতদিন চেয়েছে—মাশাআল্লাহ—এগুলোতে অবস্থান করেছে। এতে তাদের জীবনের শুভ্রতা কলঙ্কিত হয়নি এবং তাদের পেশা ও কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়নি। সে যেই হোক—বণিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, মুসাফির। এতে কোনো সন্দেহ নেই, ইসলামি সভ্যতার এই উজ্জ্বল ইতিহাস দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বার বার মনে করিয়ে দেয় এই অবিনশ্বর সভ্যতার যে মানবিক দান তা কত মহান!

আমরা কিছু মহৎ ও অনুপম ইসলামি ব্যবস্থার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলাম। আমরা অনুধাবন করছি যে, এই পর্বের অনুচ্ছেদগুলোতে একটি মূল্যবোধ আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তা হলো এই সভ্যতার মানবিকতা ও মানবতাবোধ। এই সভ্যতা যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা থেকে কখনো বিচ্যুত হবে না। সেটা হলো আখলাক ও শিষ্টাচার এবং নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তি, এসব বৈশিষ্ট্য ঐশী প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত, তাই এগুলোর কোনো শেষ নেই। এ কারণেই ইসলামি সভ্যতা যে আখলাক ও নৈতিকতায় ভূষিত তা আমরা এই সভ্যতার প্রত্যেক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাই। ইসলামি সভ্যতার এসব মূল্যবোধ গোটা বিশ্বের জন্য আলোকবর্তিকারূপে বিদ্যমান।

।। তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।।

---

[৫০৯]. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪।

আল-আয়ুদি হাসপাতাল

বাগদাদে ওয়াকফসূত্রে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলোর অন্যতম ছিল আল-আয়ুদি হাসপাতাল। বুওয়াইহি রাজবংশের অন্যতম শাসক আয়ুদুদ্দৌলা ৩৬৬ হিজরি/৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ শহরের পশ্চিমাংশে তা নির্মাণ করেন। এই হাসপাতালে বিভিন্ন রোগচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চব্বিশজন ডাক্তার সবসময় কর্মরত থাকতেন। হাসপাতালটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আয়ুদুদ্দৌলা বহুবিধ প্রবৃদ্ধিমূলক প্রকল্প ওয়াকফ করেন। এখানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক বিনামূল্যে চিকিৎসা পেত। রোগীরা এখানে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও বিভিন্ন সেবা লাভ করত। যেমন নতুন পোশাক, স্বাস্থ্যসম্মত বাহারি খাবার, জরুরি ওষুধ ইত্যাদি। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি পৌঁছার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পাথেয় ও পথখরচও দিয়ে দেওয়া হতো তাদের।

এসব হাসপাতালগুলোতে এত উন্নত, আরামদায়ক ও বিলাসবহুল স্বাস্থ্যসেবা ও দামি খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হতো যে, অনেকে এগুলো ভোগ করার জন্য অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হতো। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ খলিল ইবনে শাহিন যাহেরি বর্ণনা করেন, ৮৩১ হিজরি/১৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে একবার তিনি দামেশকের একটি হাসপাতাল দেখতে যান। তার বর্ণনামতে, এরকম বিলাসবহুল চিকিৎসাকেন্দ্র তিনি পৃথিবীর আর কোথাও দেখেননি। সেখানে তিনি লক্ষ করেন, এক লোক অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তিন দিন পার হওয়ার পর ডাক্তার তার চিকিৎসাপত্রে লিখে দেন, মেহমান কখনো তিন দিনের বেশি অবস্থান করেন না।

ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ হলো তা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের থেকে বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে পেরেছে যে, তাদের ও শাসক শ্রেণির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং শাসকবর্গ তাদের সেবক ও হিতৈষী। একজন শাসক সচ্ছলতা ও বিপদের মুহূর্তে জনগণের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক অটুট রাখবেন সেই মহান শিক্ষা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন।

মাকতাবাতুল হাসান